কফিন রঙের রুমাল

ডক্টর ওয়াকিল আহমদ

বাংলা একাডেমী : ঢাকা-২

প্রকাশকাল : আশ্বিন ১৩৭২, অক্টোবর ১৯৬৫

প্রকাশনায়
ফজলে বাব্বি
পবিচালক
প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় ডিভিশন
বাংলা একাডেমী
ঢাকা

মুদ্রণে
বাংলা একাডেমীর
প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় ডিভিশনেব
মদ্রণ বিভাগ

প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী

লেখালিখির দুই বান্ধবী
পদ্যে ও গদ্যে
কৃষ্ণা বসু ও সুচিত্রা ভট্টাচার্যকে

কফিন রঙের রুমাল

১

জীবনের অন্যতম স্মরণীয় দিনে এমন বিপর্যয় ঘটবে তা মাত্র কয়েক ঘন্টা আগেও ভাবতে পারেনি তিতিক্ষা। বুঝতেই পারছে তাকে এখন প্রতিটি মানুষের কাছে হাজার প্রশ্নের জবাবদিহি করতে হবে, মুখোমুখি হতে হবে অজস্র অস্বস্তিকর মুহূর্তের।

কিন্তু কী আর করতে পারে তিতিক্ষা যদি তার প্রথম একক প্রদর্শনীর দিনে উপস্থিত না থাকতে পারে তার স্বামী বিবেক! অথচ এই প্রদর্শনীর জন্য তার একটু একটু করে কতখানি প্রস্তুতি গত কয়েক মাস ধরে। এতগুলি ছবি আঁকা, তাদের ফ্রেমবন্দি করা, প্রদর্শনীকক্ষ সংরক্ষিত করা, আমন্ত্রণপত্র ছাপানো, বিলি করা, তারপর অজস্র টেলিফোন তো আছেই। আর এই কাজে বিবেকও তো কম পরিশ্রম করেনি! অথচ ঠিক উদ্বোধনের দিন বিবেক উপস্থিত হতে পারছে না তা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না তিতিক্ষা।

আসলে বিবেক গত পরশু রাতে তাকে কয়েকটি কথা বলেছিল তাতেই বুকের ভিতরটা কেমন শূন্য লাগছিল ধবধবে সাদা ক্যানভাসের মতো। কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে, অনেকগুলো মুহূর্ত চুপ করে থেকে হঠাৎ বলেছিল, কী বলছ তুমি? আমি তো ভাবতেই পারছি না!

বিবেক কাতর গলায় বলেছিল, কিছু করার নেই, তিতি। দিস ইজ রিয়েলিটি। তোমার ছবির মতো বিমূর্ত নয়। তবে আমি চেষ্টা করছি তোমার একজিবিশন শেষ হওয়ার আগেই যাতে ফিরে আসতে পারি।

বিবেক না-থাকায় গতকাল ও আজ দু-দিনের যাবতীয় ঝড় একা সামলাতে হচ্ছে তিতিক্ষাকে। কিন্তু সে এখনও কাউকে বুঝতে দেয়নি বিবেকের অনুপস্থিতি। তবে প্রদর্শনীর দিনে তো আর চেপে রাখা যাবে না ব্যাপারটা। আজ উদ্বোধনের মুহূর্তে তাই তার দম বন্ধ হয়ে আসছে বিবেক না-থাকায়।

কিন্তু কী করবে এখন তিতিক্ষা, কী বা করতে পারে!

বিকেল ধূসর হয়ে সন্ধে নেমে আসতেই মারকাটারি ভিড় প্রদর্শনীকক্ষে। চারদিকে জমজম করে উঠেছে সাদা আলোর বিচ্ছুরণ। দেওয়ালে সার সার

তিতিক্ষার আঁকা ছবিগুলো। তাতে কত না বাহারি দৃশ্য, কত না রঙের সমাহার, অথচ আজ প্রদর্শনী শুরু হওয়ার মুহূর্তে তিতিক্ষার যেমনটা প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠার কথা তেমনটি হতে পারছে না। হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও তার বুকের ভিতরে বিষপিঁপড়ের অজস্র কামড়। তার মধ্যেই এসে গেলেন বিখ্যাত পেইন্টার বিকাশ পাইন, ধবধবে ধুতি ও কাশ্মীরি কাজ করা মেরুনরঙের পাঞ্জাবিতে ঝকঝকে হয়ে এসে বললেন, কী হে রূপসী, অভিব্যক্তিতে এত মেঘ মেখেছ কেন? সমালোচকদের উদ্যত মসির ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে নাকি?

তিতিক্ষা হাসার চেষ্টা করে বলল, না, বিকাশদা, তা নয়, সমালোচকদের ভয় করিনে। সমালোচকদের সঙ্গে চেনাজানা থাকলে সমালোচনা হবে উৎকৃষ্ট। না-থাকলে তিনি বসিয়ে দিতে পারেন নবীন শিল্পীর আশায় জল ঢেলে দিয়ে।

বিকাশ পাইন তাকে উৎসাহ দিতে বললেন, কিন্তু ছবিগুলো তুমি ভালোই এঁকেছ, তিতি। আমার মনে হয় না তোমাকে বসিয়ে দেবে কেউ।

অতঃপর মোমবাতির মুখে আগুন দিয়ে, হাততালির পশলা ছিটিয়ে হইহই করে প্রদর্শনী উদ্বোধন করে গিয়েছেন বিখ্যাত শিল্পী, তার পর থেকেই সমানে উপচে পড়ছে দর্শকদের ভিড় ও প্রশংসা, কিন্তু তিতিক্ষার মুখের হাসিটি যেন এনামেল করা। তার এক বন্ধু তোর্ষা একফাঁকে জিজ্ঞাসাও করল ইয়ার্কি সহযোগে, কী রে, তিতিক্ষা, বর আসেনি বলে এমন ফিউজ হয়ে রয়েছিস! কী আগ্নেয় প্রেম রে তোদের! দু-বছরে তো হনিমুন পর্ব শেষ হয়ে যাওয়ার কথা!

হ্যাঁ, এই তো সেদিন তিতিক্ষা আর বিবেক তাদের দ্বিতীয় বিবাহবার্ষিকী পালন করেছে সাড়ম্বরে, তোর্ষা সেদিনও বলেছিল, 'তোদের প্রেম দেখলে হিংসে হয় রে!' তিতিক্ষা সেদিন সত্যিই ঝলমল করছিল তার কথায়, হাসিতে, ব্যবহারে, উচ্ছ্বাসে। প্রাণচঞ্চল, স্বতোচ্ছল ইত্যাদি বিশেষণগুলো তিতিক্ষার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে সারাক্ষণ, কিন্তু আজ তার একদম মুড অফ।

তবে যা ভিড় হয়েছে, তার এত-এত প্রিয় মানুষেরা দেখতে এসেছে তার প্রথম সোলো একজিবিশন যে, বেশিক্ষণ দেঁতো হাসিতে নিজেকে সাজিয়ে রাখা সম্ভব হল না তার পক্ষে। প্রদর্শনী কক্ষে একটু পরেই প্রবেশ করলেন একজন লম্বা চওড়া চেহারার অবাঙালি মাঝবয়সী ভদ্রলোক। তিনি ঘুরে ঘুরে দেখছেন প্রদর্শনী। তিতিক্ষা তাঁকে দেখতে পেয়েই ছুটে এসেছে ও তাঁর সঙ্গে ঘুরে বোঝাতে শুরু করে তার ছবিগুলোর বিষয় ও অঙ্কনপদ্ধতি।

ছবির জগতের কেউ কেউ সম্প্রতি জেনেছে তিনি একজন বিশিষ্ট ক্রেতা, নিজেকে এ দেশের একজন বিখ্যাত আর্ট-ডিলার বলেই পরিচিত করেছেন ভিজিটিং কার্ড বিলিয়ে। নাম শ্রাবণকুমার। ছবি পছন্দ হলে মোটা টাকায় ছবি কিনে পাঠিয়ে

দেবেন বিদেশে। তিতিক্ষার সমস্ত মনোযোগ এখন তাঁরই দিকে। অল্পক্ষণের মধ্যেই তিতিক্ষা তাঁর মন জয় করতে সক্ষম হয়, তিনিও তিতিক্ষার ছবি বিষয়ে নানবিধ প্রশ্ন করতে থাকেন গভীর কৌতূহল নিয়ে। তিতিক্ষার মুখ ততক্ষণে হাসি-হাসি।

একটু পরেই ভিতরের তিতিক্ষাটা বেরিয়ে এসে চনমনে হয়ে উঠতে শুরু করল তার স্বাভাবিক ভঙ্গিতে। প্রদর্শনীকক্ষের এক দেওয়াল থেকে আর এক দেওয়ালে ঘুরে ঘুরে তার আঁকা ছবিগুলো দেখাচ্ছিল, বোঝাচ্ছিল দর্শকদের। এবারের প্রদর্শনীর বেশির ভাগ ছবিই জলরঙে আঁকা। তবে কিছু প্যাস্টেল, কিছু অ্যাক্রিলিকের কাজও রেখেছে যাতে দর্শক বুঝতে পারেন সে সব মাধ্যমেই সমান দক্ষ। কিন্তু তার বিশেষত্ব বোঝাতে রঙের ব্যবহারে কিছু বিশেষ কারিকুরি করেছে ছবিতে। জলরঙের ছবিতেও তার রঙের ব্যবহার এতটাই গাঢ় আর গভীর যে, অনেক সময় ভ্রম হতে পারে অয়েল বলে। কিন্তু না, কোনওটাই অয়েল নয়, সবগুলোই ওয়াটার কালার—

বলে তিতিক্ষা হাসল একঝলক। তার সঙ্গে বা পাশেপাশে ঘুরছে অনেক দর্শক, কিন্তু তিতিক্ষার মনোযোগ এখন প্রধানত শ্রাবণকুমার নামের এই আর্ট-ডিলারটির প্রতি। কোটিপতি ব্যবসায়ী, তাঁকে ঠিকমতো বোঝাতে পারলে আজকের প্রদর্শনীর বেশ কয়েকটি ছবি বিক্রি হয়ে যেতে পারে বলেই তিতিক্ষা খুব নিবিষ্ট হয়ে বোঝাচ্ছিল তার ছবির গুণপনা।

যে-ছবির সামনে সে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে সেটি একটি ল্যান্ডস্কেপ, দূরে ধূসর পাহাড়, তার ঠিক নীচে সবুজ বনানী, তার ঠিক কোল ঘেঁসে একটি ছোট্ট লোকালয়। পটভূমি যাই হোক, ছবির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে মাথায় লাল ফেট্টিবাঁধা অদ্ভুত রহস্যময় একটি তরুণীর মুখ যা ভীষণভাবে টানে দর্শককে। তরুণীর অভিব্যক্তি এতটাই বাঙ্ময় যে, প্রতি মুহূর্তে মনে হয় এখনই কথা বলে উঠবে তরুণীটি।

শ্রাবণকুমার ছবিটির সামনে বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে উপভোগ করছিলেন দৃশ্যপট আর তরুণীটির হাসি। ঠিক স্বাভাবিক তরুণী তা নয়, কেমন যেন অপ্রাকৃত ব্যাপারস্যাপার ছবিটির মধ্যে।

ঠিক তার পরের ছবিটির পটভূমি সমুদ্র। গাঢ় নীল পটভূমির মধ্যে গলা বাড়িয়ে তাকিয়ে আছে এক টকটকে লালমুখের তরুণী। তরুণীর ঠোঁট থেকে ঝুলছে একটি বাহারি ঝুমকো দুল। তার মৃদু ও লাস্যময় হাসির বহরে এক আশ্চর্য রহস্য।

তার পরের ছবিটির পটভূমি লালচে বালির মধ্যে একটি বিশাল পিরামিড। পিরামিডের চূড়াটি আসলে একটি তরুণীর মুখের আদলে। তার মুখাবয়ব অনেকটা

রূপকথার রাজকন্যার মতো। তার পরের ছবিটি বেশ বড়ো আকারের, পুরোটাই জঙ্গলের পটভূমিতে। তাতে শুধু সবুজ আর সবুজ। ঘন সবুজের প্রেক্ষাপটে আর এক রহস্যময়ী।

তিতিক্ষার এই সিরিজটির নামও সেরকম ধাঁচের : 'প্রকৃতির মধ্যে অপ্রাকৃত', আর তাতেই প্রদর্শনীর আকর্ষণ বেড়ে গেছে অনেক বেশি। সব ছবিতেই ওতপ্রোত শুধু রহস্য আর রহস্য। প্রতিটি ছবিতেই চমৎকার সব প্রাকৃতিক দৃশ্য, প্রত্যেকটিই আলাদা পটভূমির, আর সব ছবির কেন্দ্রবিন্দুতে এক-একটি অদ্ভুত দর্শনের মায়াবিনী তরুণী।

শ্রাবণকুমার ছবিগুলি দেখছিলেন আর কী সব নোট করছিলেন তাঁর পকেটে থাকা একটি ফিরোজা রঙের ডায়েরিতে। তিতিক্ষা আড়চোখে তাকিয়ে চেষ্টা করছিল কী লিখছেন শ্রাবণকুমার, তার ছবি পরীক্ষায় পাশ করল কি করল না!

কিন্তু প্রদর্শনীর মধ্যেও আর এক প্রদর্শনী। তিতিক্ষার ছবির প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে সবাই তিতিক্ষাকেই দেখছিল একযোগে। তিতিক্ষা ছবি আঁকে। তার ছবি দেখতে এসে তিতিক্ষাকেই দেখে সবাই। তিতিক্ষা এতই সুন্দরী যে, সে কোথাও উপস্থিত থাকলে অন্যরা ম্লান হয়ে যায়। তিতিক্ষা যে রঙের শাড়ি-ব্লাউজই পরে, যেরকমই খোঁপা বাঁধে বা যখনই চুল কেটে ববছাঁট দেয় তাকে কেমন অদ্ভুত মানিয়ে যায়। তার চেহারায় এমনই একটা চোরাটান, তার মুখেও সারাক্ষণ স্মিতহাসি, চোখেও তেমনি উপছোনো কৌতুক।

কিন্তু তার পরনে আজ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের পোশাক। অনেকটা জাপানি কিমোনোর ধাঁচে তৈরি চাপা পোশাক। একেই তো লো-নেক কিমোনো, তার উপর কিমোনোটির হাঁটু থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত চেরা থাকায় তার ফর্সা পায়ের কিয়দংশ দৃশ্যমান। তাতে খুবই আকর্ষণীয় লাগছে তার দোহারা, ঈষৎ লম্বা চেহারা।

শুধু তার রূপের কারণেই নয়, তার ব্যবহারের স্নিগ্ধতার জন্যও সে সবার ভারি প্রিয়। প্রদর্শনীকক্ষে সে পৌঁছোতেই সবাই তাকে ঘিরে ধরে, সবাই তার সঙ্গে কথা বলতে চায়, তাকে নিয়ে চলে টানাটানি।

একটু পরেই শ্রাবণকুমার তিতিক্ষার একজিবিশন দারুণ হয়েছে বলে মস্ত একটা সার্টিফিকেট দিয়ে চলে গেলেন বাইরে। তিতিক্ষা অতঃপর মনেনিবেশ করে অন্যদের প্রতি। কিন্তু মুশকিল হল সবাই জিজ্ঞাসা করছিল তার স্বামী বিবেক কখন আসবে।

তিতিক্ষা বিব্রত হচ্ছিল, বলছিল, বিবেক এখন তার বিজনেস নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। সারাক্ষণ তার নতুন কম্পানি কী করে দাঁড় করাবে তাই নিয়ে ছোটাছুটি করছে খুব।

তিতিক্ষার বাবা খুব বড়োলোক, নিজে একটি কোম্পানির মালিক, আরও কয়েকটি কোম্পানির ডিরেক্টর। তিনি ভেবেছিলেন তাঁদেরই সমকক্ষ কোনও বাড়িতে বিয়ে দেবেন তিতিক্ষার, কিন্তু তিতিক্ষা তাঁর আশায় ছাই ছুড়ে দিয়ে বিয়ে করেছে তার পছন্দের পাত্র বিবেককে। বিবেক সাধারণ একটা চাকরি করত যা তিতিক্ষার বাবার পছন্দ নয়। তিনি প্রথমে বিয়েটা অস্বীকার করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু মেয়ের অসম্ভব জেদাজেদিতে একসময় রাজি হয়ে যেতে হয়েছিল তাঁকে। অতঃপর তিনি টাকা দিয়ে উপদেশ দিয়ে বিবেককে করে দিয়েছেন একটি নতুন কারখানা।

সেই কারখানা চলছিল ভালোই, কিন্তু বিবেক তাতে সন্তুষ্ট নয়, সে আরও আরও বড়ো করতে চায় তার কারখানা। তার শ্বশুরকে দেখিয়ে দিতে চায় তার এলেম কোনও অংশে কম নয়। একটি ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে সে আরও একটি বড়ো শেড করেছে, তারপর আরও টাকার দরকার হয়ে পড়ে, তখন তার সাহায্যে এগিয়ে এসেছে দু-চারজন বন্ধু । বিবেক আর তিতিক্ষা চাইলে কেউ না করে না।

তিতিক্ষার হঠাৎ নজরে পড়ল গার্গী চৌধুরির দিকে, আ রে, গার্গীদি, তুমি কখন এলে?

বলে গার্গীদিকে প্রায় জড়িয়ে ধরে সামনের দিকে নিয়ে এল, বলল, কী আশ্চর্য, আমি খেয়ালই করিনি তুমি কখন একজিবিশন দেখতে এসেছ!

গার্গী হেসে বলল, আমি বুঝে উঠতে পারছি না এখন তোমার আঁকা ছবি দেখব, না তোমাকেই দেখব। যা দেখাচ্ছে না তোমাকে!

তিতিক্ষা হেসে বলল, ও মাসকয়েক অগে জাপানে গিয়েছিল এক্সপোর্টের কাজে। তখন নিয়ে এসেছে কিমোনোটা। একদম লেটেস্ট ডিজাইন বলল।

গার্গী আরও প্রশংসা করে বলল, তা তুমি লেটেস্ট ডিজাইন পরবে না কে পরবে? ইয়াং ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট বিবেক দ্বিবেদীর মিসেস তো লেটেস্ট অ্যান্ড হটেস্ট ডিজাইনের পোশাকই পরবে।

তিতিক্ষা তৎক্ষণাৎ গার্গীর হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল তার ছবিগুলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাতে।

তিতিক্ষার এই প্রদর্শনীতে গার্গীও আমন্ত্রিত। সঙ্গে নিয়ে এসেছে সোনালিচাঁপাকেও । সোনালি এখন তার সর্বক্ষণের সঙ্গী। দুজনে ঘুরে ঘুরে দেখছে ছবিগুলো আর এটা-ওটা জিজ্ঞাসা করছে তিতিক্ষাকে। তিতিক্ষার সঙ্গে তার পরিচয় বছরখানেক আগে কোনও একটি বিজনেস সেন্টারের পার্টিতে। দারুণ সেজে এসেছিল সুন্দরী তিতিক্ষা তাতেই সে নজর কেড়েছিল পার্টিতে উপস্থিত সবাইকার।

গার্গী আর সায়নের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর বলেছিল, 'সবাই জানে আপনারা দুজন এ শহরের অন্যতম বিখ্যাত দম্পতি। বিবেক পার্টিতে এলে আপনাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব'। কিন্তু সেদিন বিবেক আসতে দেরি করেছিল বলে গার্গীদের সঙ্গে আলাপ হয়নি। গার্গীরা বেরিয়ে এসেছিল লুনাকে সোনালিচাঁপার জিম্মায় রেখে। বিবেকের সঙ্গে আলাপও হয়নি আজও। তিতিক্ষা পরে কথায়-কথায় জেনেছিল গার্গী কোনও একসময় লেখালিখি করত পত্রপত্রিকায়, তাকে একটি লেখার কথাও বলেছিল তিতিক্ষার পত্রিকা 'চিত্রশিল্প'র জন্য। গার্গীকে উসকে দিয়ে বলেছিল, 'আপনি তো নানা সময়ে বিভিন্ন গ্যালারিতে শিল্প প্রদর্শনী দেখে থাকেন। বিশেষজ্ঞ হিসেবে না হোক, দর্শক হিসেবেও আপনার প্রতিক্রিয়া জানিয়ে দিলে তা একটা প্রবন্ধগোছের নিশ্চয় হবে।' গার্গী বিষয়টা নিয়ে ভেবেওছিল, কিন্তু সময়াভাবে লিখতে পারেনি। তিতিক্ষাকে বলেছিল, সত্যিই আমি দুঃখিত। পরে কোনও সময় তোমাদের পত্রিকা বেরোলে বোলো।

এবার তিতিক্ষার পাঠানো কার্ড পেতে গার্গী তাই চলে এসেছে এ শহরের অন্যতম নবীন শিল্পী তিতিক্ষা দ্বিবেদীর প্রথম একক প্রদর্শনী দেখতে। একসময় গার্গী সেই একই প্রশ্ন তিতিক্ষাকে জিজ্ঞাসা করল, কী গো, তোমার বর আসেনি প্রদর্শনীতে?

তিতিক্ষা পুনর্বার বিব্রত, কাঁচুমাচু মুখে জানাল, না,গার্গীদি, ও একটা জরুরি কাজে ফেঁসে গেছে।

—ইস, তাই নাকি?

—ও একটু বাইরে গেছে। কাল বা পরশু ফিরবে কলকাতায়।

গার্গী তবুও একটু রসিকতা করতে ছাড়ল না, বলল, তোমাদের যা বিজনেস, একটু বাইরে মানে হয়তো কানাডা কিংবা অস্ট্রেলিয়া, তাই না?

—না, গার্গীদি, খুব কাছেই, দিল্লিতে।

—ও তা হলে তো কাছেই। দু-ঘন্টার জার্নি।

—হ্যাঁ। আমি যখন কাল বললাম তুমি না এলে আমাকে লক্ষ প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে, তখন বলল, তিতি, তুমি তো জানো, আমার একটু ফুরসত থাকলেও আমি দুপুরের ফ্লাইটে কলকাতা গিয়ে তোমার একজিবিশনের ইনঅগুরাল দেখে রাতের ফ্লাইটেই ফিরে আসতাম দিল্লিতে। কিন্তু নো উপায়।

গার্গী বিজনেসের ব্যাপারটা এখন কারও চেয়ে কম বোঝে না। বরং একটু বেশিই বোঝে। বিশেষ করে সায়নের সঙ্গে দীর্ঘকাল ঘর করতে গিয়ে জেনেছে সিরিয়াস বিজনেসম্যানদের কাছে বিজনেস ইজ টপ প্রায়োরিটি। তাতে যদি বউয়ের সঙ্গে ডিভোর্স হয়ে যায় সেও ভি আচ্ছা।

তিতিক্ষা পরক্ষণে গার্গীর হাতে প্রদর্শনীর একটি রঙিন ব্রোসিওর ধরিয়ে দিয়ে বলল, গার্গীদি, শুনেছি তুমি এককালে পত্রপত্রিকায় নানারকম ফিচার লিখতে। পারো যদি আমার একজিবিশনের একটা সমালোচনা লিখে দিও কোথাও। ভালো সমালোচনা না বেরোলে শিল্পীর কদর হয় না কারও কাছে।

বলে গার্গীকে কিছুটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় পোজে রেখে হঠাৎ 'ওই যে, সুধেন্দু সোম এসেছেন' বলে দৌড়োল এক মধ্যবয়স্ক ব্যক্তির উদ্দেশে।

সুধেন্দু সোম একজন প্রতিষ্ঠিত কলাসমালোচক, বিখ্যাত 'দেশকাল' পত্রিকায় প্রায় প্রতিটি শিল্পপ্রদর্শনীর সমালোচনা লেখেন, তাঁর সমালোচনার মূল্য অপরিসীম, অতএব তাঁকে খুশিতে রাখার চেষ্টা করেন প্রায় সব শিল্পীরাই। তিতিক্ষাও জানে সুধেন্দু সোম যদি ভালো করে কয়েকটা লাইন লিখে দেন তা হলে তার প্রদর্শনীর বেশ কয়েকটা ছবি বিক্রি হয়ে যাবে নিশ্চিত।

সুধেন্দু সোম তিতিক্ষাকে ভালো চেনেন, কাছে এসে 'হাই সুধেন্দুদা ' বলতেই সুধেন্দু সোম বললেন, তোমার একজিবিশনে খুব ভিড় হয়েছে দেখছি।

তিতিক্ষা এক গাল হেসে বলল, সুধেন্দুদা, আপনারা সবাই আমাকে ভালোবাসেন বলেই এত ভিড়।

—আমি তো অনেকক্ষণ ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছি তোমাকে আর বিবেককে। কারও পাত্তা নেই।

তিতিক্ষা বিব্রত হয়ে বলল, সুধেন্দুদা, আমি পাশের কিউবিকলটিতে ছিলাম বলে দেখতে পাননি আমাকে। আর বিবেক আজ শহরে নেই।

সুধেন্দু সোম অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, সে কি, তিতিক্ষা দ্বিবেদীর প্রথম প্রদর্শনী, আর বিবেক কিনা শহরেই নেই! ঠিক আছে, এরপর আমার সঙ্গে দেখা হলে খুব বকে দেব বিবেককে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বকে দেবেন তো!

যারাই প্রদর্শনীতে এসেছে সবাই চাইছিলেন বিবেকের উপস্থিতি। বিবেক যদি কলকাতায় থাকে তা হলে তিতিক্ষা যেন মোবাইলে ফোন করে পনেরো মিনিটের জন্যও আসতে বলে এখানে।

তিতিক্ষা তার স্মিত হাসি দিয়ে সবাইকে জানায় বিবেক জরুরি কাজে দিল্লি গেছে, কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও সংস্থা তাকে একটা বড়ো অর্ডার দেবে তারই খোঁজে।

সুধেন্দু সোমকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ছবিগুলো দেখাচ্ছে, বোঝাচ্ছে, সেসময় হঠাৎ দেবোপম সেন নামের এক সুদর্শন ভদ্রলোক তিতিক্ষাকে বলেন, তিতিক্ষা, বিবেক গত সপ্তাহে আমাকে একটি চেক দিয়েছিল, সেই চেকটি কিন্তু বাউন্স করেছে।

দেবোপম সেন একজন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, স্টিলের খুব বড়ো ব্যবসা, বিবেক গত সপ্তাহে তিতিক্ষাকে বলেছিল দেবোপমদার ধার শোধ করতে পেরে খুব স্বস্তিবোধ করছে, তাঁর কথায় তিতিক্ষা বেশ অবাক, ভুরুতে চোখ ছুঁইয়ে বলল, সে কী? কত টাকার চেক?

দেবোপমকে খুবই অখুশি দেখায়, বললেন, আশি হাজার টাকার চেক। টাকাটা বিবেক নিয়েছিল পাঁচ মাস আগে। সেদিন ফেরত দিয়ে বলল, 'দেবোপমদা, দরকারের সময় যা উপকার করেছিলেন তা কখনও ভুলব না।' কিন্তু এখন ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, বিবেকের ওই অ্যাকাউন্টে মাত্র তিন হাজার টাকা আছে।

তিতিক্ষা তখনই মোবাইলে বিবেককে ধরার চেষ্টা করল, না-পেয়ে বলল, ওর মোবাইল অফ আছে, দেবোপমদা, বিবেক হয়তো ভুল করে ওই ব্যাঙ্কের চেক দিয়েছে। আমি দেখছি, ও দিল্লি থেকে ফিরুক। অন্য অ্যাকাউন্ট থেকে টাকাটা দিয়ে দেবার ব্যবস্থা করব।

পরক্ষণে তিতিক্ষার নজরে পড়ল তার বাবার দিকে। ভেবেছিল তার বাবা অলীকশেখর হয়তো আসবেনই না তার প্রদর্শনী দেখতে, তক্ষুনি ছুটে গিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরে, ইস, বাবা, তুমি তা হলে এলে! আমি ভাবলাম তোমার কোম্পানির বোর্ড মিটিংয়ে এমন আটকে যাবে আসার সময়ই পাবে না।

তিতিক্ষা তার বাবাকে যতটা উৎফুল্ল দেখাবে ভেবেছিল, তার কণামাত্রও দেখল না। বরং তিতিক্ষাকে একান্তে ডেকে বললেন, মোবাইলে ধর তো বিবেককে। দ্যাখ বিবেককে পাওয়া যায় কি না?

তিতিক্ষা বলল, মোবাইলে ওকে পাচ্ছি না, বাবা। কেন কিছু হয়েছে?

—হ্যাঁ। কাল ওর এক ব্যাঙ্কারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তিনি বললেন, বিবেক গত তিন মাসে কোনও চেক জমা দেয়নি। উপরন্তু ওভারড্রাফটের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। ওর ক্রেডিট লিমিট ছিল পঞ্চাশ লাখ। সেখান নাকি পঁচাত্তর লাখ পেরিয়ে গেছে ওভারড্রাফটের পরিমাণ। শুধু আমার মুখ চেয়ে ওরা ওভারড্রাফট দিয়ে যাচ্ছে।

তিতিক্ষা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে বাবার দিকে, বলে, পঁচাত্তর লাখ?

২

মাখননরম সোফার আরামে শরীরের প্রায় অর্ধেক ডুবিয়ে একরাশ বিষণ্ণতা আর মন খারাপের মধ্যে লীন হয়ে আছে তিতিক্ষা। তার মনের তুলিতে কিছু ধূসর রং মাখিয়ে ক্রমাগত এলোমেলো আঁচড় কেটে চলেছে অবসন্ন ভঙ্গিতে। তাতে যে-ছবিটার জন্ম নিচ্ছে তা আরও অস্থির যন্ত্রণার।

যন্ত্রণার উৎস তার স্বামী বিবেক। তার প্রথম একক প্রদর্শনী চলাকালীন দিনগুলিতে বিবেক এক মুহূর্তের জন্যও হাজির থাকতে পারবে না তা তিতিক্ষা ভাবতে পারেনি দুঃস্বপ্নেও।

তাতে যা হওয়ার তাই হল। গ্যালারিতে পর পর তিনদিনই তিতিক্ষার প্রদর্শনীতে প্রচুর ভিড় হল ঠিকই, কিন্তু বিবেকের অনুপস্থিতিতে তিতিক্ষাকে এত-এত প্রশ্নের ও সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে যে, তার সোলো একজিবিশিনের একটি মুহূর্তও স্বস্তিতে কাটল না। যে-তিতিক্ষা সারাক্ষণ মুখে মোনালিসার মতো মিস্টিক হাসি মাখিয়ে রাখে, তার প্রতিটি সেকেন্ড কেটেছে দুশ্চিন্তার প্রতীক হয়ে!

কাল রাত দশটা নাগাদ যখন প্রদর্শনী গোটানো হচ্ছে, তার এমন মন খারাপের মুহূর্তে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন আর এক বর্ষীয়ান শিল্পী পরিতোষ রায়, তার কাঁধে হাত রেখে বলেছিলেন, 'তিতি, হোয়াই আর ইউ লুকিং সো মেলাংকোলি?' তিতিক্ষা ইতস্তত করে কারণ জানালে তিনি বলেছিলেন, তোমার হাজব্যান্ড ইজ এ বিগ গাই। রেপুটেড বিজনেসম্যান। তিনি ব্যবসায়ের কাজে বাইরে যেতেই পারেন। তার জন্য মন খারাপ করে এমন সুন্দর মুহূর্তগুলো কেউ নষ্ট করে!

বলে তিনি তিতিক্ষাকে কয়েকটি অদ্ভুত কথা বলেছিলেন। বললেন, দ্যাখো, প্রত্যেক মানুষের এক-একটি দিন কাটে ভালোয়-মন্দয় মিশিয়ে। কিছু ভালো অভিজ্ঞতা হয়, কিছু খারাপ। কতটা ভালো কতটা খারাপ তা মনে রাখি না কেউ। শুধু খারাপ মুহূর্তগুলোই মনে বেশি দাগ কেটে যায়। তাই প্রতিদিন শোওয়ার আগে ব্যাঙ্কের মতো একটি লেজার বুক খুলে বসতে হয়। তার বাঁদিকের পৃষ্ঠাটি ডেবিটের কলাম, ডানদিকের পৃষ্ঠাটি ক্রেডিটের কলাম। সারাদিনে যা কিছু ক্ষতি, যা কিছু মন খারাপ, বিষণ্নতা, যন্ত্রণা, ক্লেশ সবই লেখো বাঁদিকের কলামে। আর সারাদিনের যা কিছু প্রাপ্তি, যা কিছু সঞ্চয়, আনন্দ, উল্লাস—সব লেখো ডানদিকের কলামে। এবার যোগ বিয়োগ করে দেখতে পারো লস হল, না প্রফিট। লাভ-লোকসান যাই হোক তা হিসেব করে লিখে রাখো ব্যালান্সের ঘরে। পরের দিনে সেই আউটস্ট্যান্ডিং ব্যালান্স আবার ব্রট ফরোয়ার্ড করে লিখবে পরের পৃষ্ঠার উপরে। পরের দিনেও সেই একইভাবে ডেবিট ও ক্রেডিটের কলামে লিখবে। এভাবে লিখতে শিখলে দেখবে কিছু ক্ষতি যেমন প্রতিদিন হচ্ছে, লাভের পরিমাণও কম নয়।

একটু থেমে পরিতোষ রায় আবার বললেন, প্রদর্শনীর তিনদিনে তুমি যা পেয়েছ, হারিয়েছ তার অনেক কম। ভেবে দেখো—

পরিতোষ রায় চলে যাওয়ার পর তিতিক্ষা অনেকক্ষণ বুঁদ হয়ে ছিল নিজের ভিতর। বাড়ি গিয়েও অনেক ভেবেছে বিষয়টি নিয়ে। আজ সকালে বাড়ির

ড্রয়িংরুমে সোফায় গা ডুবিয়ে বসে চা খাচ্ছে, আর ভাবছে সেই বিবেকেরই কথা। বিবেক তার মনে একরাশ ধূসর রং ছিটিয়ে না-দিলে—

তিতিক্ষার পরনে একটি সমুদ্র রঙের স্লিভলেস টাইট ম্যাক্সি, ম্যাক্সির শরীরে লতানে ফুলের কেয়ারি, তাতে তার চেহারায় আজ অন্য আকর্ষণ। বসেও আছে সেন্টার টেবিলের উপর পা তুলে। একটি পা লম্বা করে ছড়ানো, অন্য পা হাঁটুর কাছে ঢেউয়ের মতো ভাঁজ করা, তাতে তিতিক্ষা নিজেই একটি ছবির ভঙ্গিমায়।

তার সামনে সোফার উপরে ছড়নো তার প্রদর্শনীর কয়েকটি ব্রোসিওর, তিনদিন সমানে বিলোনোর পরও প্রায় আড়াইশো বেশি রয়ে গেছে ব্রোসিওরটি। একটু বেশি করেই ছাপিয়েছে কেন না প্রদর্শনী শেষ হয়ে যাওয়ার পর প্রচুর কোয়ারি আসবে, তাদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে এগুলি। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে দু-একবার ব্রোসিওরটিতে ছাপা তার একগুচ্ছ ফটোর দিকেও নজর পড়ছিল। তিতিক্ষাকে দেখতে অসাধারণ সুন্দরী, তার উপর তার ফটোগুলোও তোলা হয়েছে একটু উত্তেজক পোজে যাতে শিল্পীর ছবির সঙ্গে শিল্পীও নজর কাড়ে দর্শকদের। প্রতিটি ছবিতে তার স্তনবিভাজ কমবেশি দৃশ্যমান। শিল্পীকে একটু সেক্সি পোজে দেখলে তার ছবি সম্পর্কেও কৌতূহল বাড়বে সবাইকার।

এই বুদ্ধিটা সে ধার করেছে ইংরেজি ভাষায় লেখেন এমন এক ভারতীয় লেখিকার কাছ থেকে। সেই লেখিকার উপন্যাসগুলিতে যেমন সেক্স ঠাসা থাকে, তেমনি বইয়ের ব্লার্বেও থাকে তাঁর সেক্সি পোজের ফটো। তাতেই তার বইয়ের কাটতি বেশি হয় তা জানে সবাই। তিতিক্ষাও তার প্রদর্শনীর ছবিগুলোয় খুব কায়দা করে সেক্স পাঞ্চ করেছে যাতে সেক্স খুব প্রকটভাবে দৃশ্যমান নয়, অথচ ছবিগুলো উত্তেজনার খোরাক জোগাবে দর্শকদের মনে। সেই সঙ্গে প্রদর্শনীতে প্রতিদিনই তার পরনের পোশাক ছিল অসম্ভব সেক্সি।

ব্রোসিওরে দু-এক পলক নজর রেখে তিতিক্ষা ঝুঁকে পড়ল তার সামনে ছড়িয়ে থাকা সংবাদপত্র ও সাময়িকীর পৃষ্ঠায়। কাগজগুলোয় চোখ বোলাচ্ছে, দেখছে কোথাও তার প্রদর্শনীর কোনও উল্লেখ আছে কি না, থাকলে কী লিখেছে!

'সপ্তাহ' নামের পত্রিকাটিতে তিতিক্ষার ছবির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, তিতিক্ষার একটি সেক্সি পোজের হাফবাস্ট ফটো ও তার আঁকা একটি ছবি ছাপিয়ে লিখেছে, *অনেকদিন পরে মন ভরে গেল অ্যাবস্ট্রাক্ট এক্সপ্রেশনিজমের একটি চমৎকার প্রদর্শনী দেখে। শিল্পীর রঙের ব্যবহার যেমন যথাযথ, তেমনই প্রতিটি ছবিতেই নতুনতর আইডিয়া।*

'রাজপথ' নামের আর একটি সাময়িকীতে লিখেছে, *সুররিয়ালিজমের প্রভাবে ছবিগুলি এক অন্য মাত্রা বহন করছে যা দেখা যায় না ইদানীংকালের প্রদর্শনীতে।*

'প্রাতরাশ' নামের বিখ্যাত দৈনিকটিতে তিতিক্ষার পিরামিড ছবিটি ছাপিয়ে পুরো এক কলাম লেখা।

চারপাশে কাগজের রাশি ছড়িয়ে ছিটিয়ে তিতিক্ষা যখন তার মন খারাপের ক্ষতে মলম লাগাতে চেষ্টা করছে, ঠিক তখনই বেজে উঠল তার গলায় হারের লকেটের মতো ঝোলানো মোবাইলটি।

মোবাইলের সুইচ অন করে কানে দিতেই ভারি উৎফুল্ল দেখায় তাকে, হ্যালো—

ফোন এসেছে 'পেইন্টিং ট্রেজার' নামের একটি কোম্পানি থেকে। শ্রাবণকুমার নামে যে-অবাঙালি আর্ট-ডিলার প্রথম দিনেই এসেছিলেন তিতিক্ষার ছবি দেখতে, একটার পর একটা ছবি দেখে তাঁর ডায়েরিতে নোট করছিলেন খুঁটিনাটি বিষয়, প্রদর্শনী দেখে বেরোবাব সময় বেশ সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন, 'পেইন্টিং ট্রেজার' তাঁরই গ্যালারির নাম। ফোন করেছে তাঁরই অফিসের কোনও মহিলা কর্মী, হারমোনিয়ামের মতো গলা, ম্যাডাম, বস আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চান। ধরুন—

একটু পরেই টিং নানা টিং নানা শব্দ কিছুক্ষণ, ওপাশ থেকে ভারী গলার আওয়াজ, গলার স্বর চিনতে অসুবিধে হয় না তিতিক্ষার, শ্রাবণকুমারের কণ্ঠস্বরটি নামী অ্যাঙ্করদের মতোই ভরাট ও সুরেলা, চোস্ত হিন্দিতে বললেন, মিসেস দ্বিবেদী, আমি আপনার কয়েকটা ছবি সিলেক্ট করেছি। দাম নিয়ে আপনার সঙ্গে একটু আলোচনা করতে চাই। কবে ও কোথায় আপনার সময় হবে বললে আমরা বসতে পারি আলোচনায়।

তিতিক্ষার বুকের ভিতর কেউ একজন তুলিতে মাখিয়ে নেয় লাল-নীল রং, লম্বা লম্বা আঁচড়ে আঁকতে থাকে এক অদৃশ্য ক্যানভাসে, ইতস্তত করে বলল, ক-টা ছবি সিলেক্ট করেছেন তা জানতে পারি?

—ও শিওর। এখনও পর্যন্ত দশটা ছবির কথা ভেবেছি, যদি দামে রাজি হয়ে যান তা হলে হয়তো আরও কয়েকটা ছবিও নিতে পারি।

—ঠিক কোন দশটা? তাও জেনে নিতে আগ্রহী হয় তিতিক্ষা।

তিতিক্ষা জানতে চাইতেই পারে কেন না আরও জনা দুই ক্রেতা তাদের কোয়ারি পাঠিয়েছে কাল সন্ধেয়। শ্রাবণকুমার যদি কেনেন তা হলে তাঁর কেনাটাই অগ্রাধিকার পাবে তাও জানিয়ে দিল তিতিক্ষা।

শ্রাবণকুমারের গলা শোনা গেল পরক্ষণে, বোঝা যাচ্ছে তাঁর সামনে খোলা রয়েছে সেই ডায়েরিটা যাতে তিনি নোট করেছিলেন তিতিক্ষার ছবিগুলির খুঁটিনাটি। একে একে বললেন তাঁর কোন ছবি সবচেয়ে ভালো লেগেছে ও কেন। পর পর ছবির বর্ণনা ও তারিফ শুনে চইচই করে ওঠে তিতিক্ষার সমস্ত শরীর।

তিতিক্ষা যদি নাচ জানত তা হলে কয়েক পাক কত্থক নেচে নিত এই মুহূর্তে, পরিবর্তে তার তুলি সটাং সটাং করে আঁচড় বোলাচ্ছে হৃদয়ের কোনও নিভৃত কোণে। লাল-নীল-সবুজ-- কত্ত রং।

মোবাইলে কথা বলতে-বলতেই তিতিক্ষা এঁকে ফেলে একটি হাস্যময়ী মুখ। শ্রাবণকুমার যে-ছবিগুলি বেছেছেন তা ঠিকমতো দাম পেলে কয়েক লক্ষ টাকা এখন তার হাতের তেলোয়। চার হতে পারে, নিদেন তিন। তার দীর্ঘ কথার মধ্যে তাদের গাড়ির ড্রাইভার রোহন এসে জানতে চায় তিতিক্ষা কোথাও বেরোবে কি না। মোবাইল থেকে মুখ তুলে ইশাবায় জানায় সে এখনই বেরোবে, গাড়ি বার করতে। শ্রাবণকুমারের কথার মধ্যেই হঠাৎ পাশে রাখা ফোনটা বেজে উঠল সুরেলা রিংটোনে, বাধ্য হয়ে মোবাইলকে 'বা--ই--ই' করে কর্ডলেসটা কানে দিতেই তার বাবার কর্কশ কণ্ঠস্বর, বিবেক দিল্লি থেকে ফিরেছে?

বাবার গলার স্বরই বলে দেয় বাবার মেজাজ কোন পর্দায় বাঁধা, তিতিক্ষা অনুমান করার চেষ্টা করল বাবার প্রশ্নবাণের লক্ষ্য কে বা কী, একটু চুপ করে থেকে বলল, না। এখনও ফেরেনি। হয়তো আজই বা কালকের ফ্লাইটে ফিরবে।

—তিতি, বিবেক কি রাজর্ষির বাবার কাছ থেকেও টাকা নিয়েছিল?

বাবার গলার স্বরের তীব্রতা এবার একটু বেশিই, তিতিক্ষা একটু চুপ করে থেকে বলল, হ্যাঁ।

—কত টাকা?

—বেশি নয়, তিরিশ হাজারের মতো।

টেলিফোনের ওপাশে কী এক বিরক্তির ধ্বনি, পরক্ষণে বাবার কণ্ঠস্বর, মোটে তিরিশ! তার জন্য এত কথা শুনতে হবে? সে যাই হোক, রাজর্ষির বাবা বলল টাকাটা অনেকদিন হল নিয়েছে, দেবে-দেবে বলে খুব ঘোরাচ্ছিল, তারপর গত সপ্তাহে ফেরত দেবে বলেও দেয়নি।

তিতিক্ষার কিছুক্ষণ নীরবতা পালন।

—তোর সঙ্গে কি বিবেকের কোনও কথা হয়েছে এর মধ্যে?

—বাবা, আমি খুব চেষ্টা করছি বিবেককে মোবাইলে ধরতে, কিন্তু কিছুতেই পাচ্ছি না।

—কী মুশকিল! কেন, মোবাইল কি অফ করে রেখেছে?

—হতে পারে। বোধহয় সুইচ অফ করে রেখে আর খুলতে ভুলে গেছে। ও ওরকমই ভুলো।

—বোগাস। একজন বিজনেসম্যান তার মোবাইল অফ করে খুলতে ভুলে যায়! ননসেন্স!

তিতিক্ষা তার বাবার ভোকাবুলারির সঙ্গে আশৈশব পরিচিত। বিবেকের উপর বর্ষিত গালাগালটা হজম করে বলল, বোধহয় কাল বিকেলের ফ্লাইটে আসবে। তুমি রাজর্ষির বাবাকে বলে দাও ও ঘরে ফিরলেই আমি টাকাটা দিয়ে দেব।

তিতিক্ষার বাবা তাতে মোটেই প্রীত হলেন না, তাঁর জামাই বিবেকের উপর কোনও দিনই সন্তুষ্ট নন, আজও কর্কশ কণ্ঠে জানতে চাইলেন, কী ব্যাপার, ব্যাঙ্ক থেকে এত লোন নিয়েছে, তার উপর এত পার্সোনাল লোন কেন?

তিতিক্ষা ইতস্তত করে জানায়, ব্যাঙ্কের সব লোনের খবর আমি জানি না। তবে একদিন বলল, বিদেশে অনেক পেমেন্ট আটকে গেছে—

—বিদেশের পেমেন্ট আটকে গেছে তা বিদেশে চলে যাক চট করে। স্বদেশের লোকের কাছে টাকা লোন করে বিজনেস চালাবে! হরিব্‌ল্। কোন দেশে এক্সপোর্ট করেছিল?

তিতিক্ষা ঘেমে ওঠে এতক্ষণে। বিবেক মাঝেমধ্যে বলে তার বাবার জেরার ভঙ্গি সুপ্রিম কোর্টের বাঘা লইয়ারদের মতো, কিন্তু সেই জেরার সামনে পড়ে সেও জেরবার হয় প্রায়ই, আজও সেরকমই ঘেমেনেয়ে অস্থির হয়। সে জানেও না বিবেকের এক্সপোর্ট-ইমপোর্টের ব্যবসা কোন কোন দেশের সঙ্গে! প্রশ্নটা কায়দা করে ডাক করে বলল, ওর বিজনেসে খুব লস যাচ্ছে, তাই কিছু টাকাব দরকার ছিল। কিন্তু ও তো লজ্জায় কাউকে বলতে পারে না, তাই আমি কয়েকজনকে বলে কিছু লোন পাইয়ে দিয়েছি। বেশি নয়, দু-তিন লাখ হবে সব মিলিয়ে। বন্ধুবান্ধবকে বলে কিছু লোন পাওয়া গিয়েছিল বলে সামাল দেওয়া গেছে তখন। বিদেশের পেমেন্টটা পেয়ে গেলে সব শোধ করে দেবে।

—তা আমাকে এতদিন কিছু বলিসনি কেন? লোকের কাছে টাকা ধার করা? ছি ছি!

তিতিক্ষা লজ্জা পেয়ে বলল, আসলে এক্‌সপোর্ট করতে গিয়েই ফেঁসে গেছে। এক্সপোর্টের প্যাঁচপোঁচ তো জানে না। তবে বিদেশের পেমেন্টটা পেয়ে যাবে শিগগির। সেই কারণেই দিল্লি গেছে। ও হিসেব করে বলেছে সব পেমেন্ট পেয়ে গেলে যেখানে যা ধার আছে সব শোধ করে দেবে । তখন আর কোনও অসুবিধে হবে না। টাকাটা আটকে গিয়েই এই বিপত্তি।

—কাদের সাপ্লাই করেছে? জেনুইন লোক তো?

-হ্যাঁ। কয়েকটা তো গভর্নমেন্ট সাপ্লাই।

—ও, বলে সঙ্গে সঙ্গে ওদিকের লাইন কাটা।

তিতিক্ষা কিছুক্ষণ মন খারাপ করে বসে থাকে দামি সোফার গভীরে ডুবে গিয়ে।

তিতিক্ষা যে বিশাল ও বর্ণাঢ্য বাড়িটিতে বসবাস করে, সেটি তার বাবা অলীকশেখরের বাড়ির লাগোয়া। বাড়িটি দোতলা, তৈরি করা হয়েছিল তিতিক্ষার বিয়ের আগে তারই ডিজাইন অনুসরণ করে। এ-বাড়িটিরও মালিক অবশ্য কাগজে-কলমে অলীকশেখরই। মেয়েকে যৌতুক দেবেন বলে বাড়িটি আগেই তৈরি করে রেখেছিলেন অলীকশেখর। ফলে বাবার কর্তৃত্ব কিছুটা হলেও মেনে নিতে হয় বিবেক ও তিতিক্ষাকে।

কয়েকদিন আগে বিবেক বলেছিল, কোম্পানিটাকে কিছুতেই বাগে আনতে পারছিনে। তা হলে প্রথমেই একটা পেল্লাই ফ্ল্যাট কিনব।

তিতিক্ষা বলেছিল, বাবা কিন্তু আমাদের ভালোই চান। তাঁর খুব আশা তুমি একটা বড়ো কম্পানির মালিক হয়ে বসবে। কম্পানির এমন গুডউইল হবে যে একডাকে সবাই চিনবে তোমাকে।

এ পর্যন্ত ঠিক ছিল, কিন্তু হঠাৎ বিবেক সেদিন ভোরের প্লেন ধরে দিল্লি পাড়ি জমিয়েছে, তারপর আর পাত্তা নেই। তিতিক্ষার কাছে বিষয়টা খুবই ভাবনার। বাবার ফোন পাওয়ার পর সারাদিনে অনেকবার চেষ্টা করল বিবেককে ধরতে। বিকেলে তার বাবা আবার জানতে চাইলেন বিবেক কলকাতায় ফিরছে কি না!

বাবার ফোন পেলে আরও বিব্রত হয়ে পড়ে তিতিক্ষা। বিবেককে ধরতে না-পেরে তার বাবাকে সন্ধেয় জানায় বিবেকের সঙ্গে মোবাইলে কিছুতেই যোগাযোগ করতে পারছে না। তার খুব ভয় করছে।

অলীকশেখর বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন, ভয় করছে কেন?

—বলে গেল দুদিন পরেই ফিরবে, চারদিন হয়ে গেল ফিরছে না! তার উপর মোবাইল অফ!

অলীকশেখরের কর্কশ গলায় ঝঙ্কার, কিন্তু তারও তো একটা আক্কেলজ্ঞান থাকা উচিত ছিল! চারদিনের মধ্যে একটাও ফোন করেনি কেন?

—সেইটেই তো বুঝতে পারছি না। কোনও বিপদে পড়ল কি না কে জানে।

—কেন, বিপদে পড়বে কেন? ওখানে কাদের সঙ্গে দেখা করার কথা?

—আমাকে তেমন করে কিছু বলেনি! কে একজন ভরদ্বাজ আছে, তার সঙ্গেই কথা বলছিল দুদিন ধরে।

—দিল্লিতে? তার ফোন নম্বর দিয়ে যায়নি?

তিতিক্ষার গলা কেঁপে যায়, না ।

—বাহ্, তোরও তো উচিত ছিল কোথায় যাচ্ছে, কার কাছে যাচ্ছে তা ভালো করে জেনে নেওয়া। ম্যানেজার কিছু জানে?

—না। ম্যানেজার বললেন ওঁকেও কিছু বলে যায়নি।

—বোগাস! বিবেকটা বরাবরই ক্যালাস।

তিতিক্ষা আবারও বাবার গালাগাল হজম করে বলল, কী করব বলো তো, বাবা?

—কী আর করবি? ওয়েট করতে হবে।

তিতিক্ষা চুপ করে থাকে বাবার নিস্পৃহতায়।

অলীকশেখর একটু পরে বললেন, দিল্লিতে আমার এক ক্লায়েন্ট আছে এস সমুদ্রসুন্দর নামে। রেডিমেড গারমেন্টের বিজনেস করে। তাকে ফোন করে দেখব?

তিতিক্ষা ইতস্তত করে, বলল, বরং আজ রাতটা দেখে নি।

রাত ন-টা নাগাদ তিতিক্ষা অস্থির হয়ে বেরিয়ে পড়ল তার বাবার উদ্দেশে। অলীকশেখর তখন পানীয়ের বোতল খুলে বসে শেয়ার মার্কেটের খবর দেখছেন টিভির চ্যানেলে। তিতিক্ষাকে দেখে বললেন, কিছু খবর পাওয়া গেল?

তিতিক্ষা সবে 'না' বলেছে, হঠাৎই বেজে ওঠে তার মোবাইল, নম্বর দেখেই লাফিয়ে ওঠে, 'এই তো, ওর ফোন।' বলেই মোবাইল অন করে, হ্যালো, তিতি বলছি। তোমার কী খবর?

ওপাশ থেকে বিবেকের গলা শোনা যায়, তিতি, একই সঙ্গে গুড নিউজ আর ব্যাড নিউজ।

—আগে ব্যাড নিউজটা শুনি।

—না, না, আগে গুড নিউজটাই বলি! আমি অনেকগুলো পেমেন্ট আদায় করেছি। প্রায় পঁয়ষট্টি লাখের মতো। কাল সকালেই প্লেন ধরব।

—ক-টার ফ্লাইটে আসছ?

—আমি এখনই ফ্লাইটের নম্বর বলছি না। আমি এয়ারপোর্টে গিয়ে প্লেনে বসে মোবাইলে ড্রাইভারকে ডেকে নেব। ডোন্ট ওরি। এখানে কেউ যেন আমাকে ফলো করছে রোজ। আমি আমার ফেরার সময়টা গোপন রাখতে চাই। পেমেন্টটা যদিও চেকে পেয়েছি, কিন্তু এখানে রাতে থাকতেও খুব ভয় পাচ্ছি।

তিতিক্ষা শঙ্কিত হয়ে বলল, কেন, ভয় পাচ্ছ কেন? তুমি তা হলে অন্য হোটেলে চলে যাও। পুলিশকে জানাও ঘটনাটা। আজ রাতটা কোনও রকমে কাটিয়ে কাল সকালের প্লেন ধরো।

বিবেকের গলা শোনা যায়, না। একটু আগেই মোবাইলে থ্রেট করেছে আমাকে, পুলিশে খবর দিলে আমার লাশ ফেলে দেবে।

—আমি বাবার পাশেই বসে আছি। আমরা কি পুলিশে খবর দেব?

—না না, ওরা জানতে পারলে আমাকে এখানে জ্যান্ত কবর দেবে।

৩

সন্ধেয় বিবেকের কাছ থেকে অমন একটি সাংঘাতিক ফোন পাওয়ার পর থেকে টেনশনের চরমে তিতিক্ষা। রাত যত বাড়ছে কী এক আতঙ্ক ঘিরে ধরেছে তার মন ও শরীর। তার বাবা অলীকশেখর বারবার বলছিলেন, 'ও নিশ্চয় কোনও অপরাধী চক্রের পাল্লায় পড়েছে, এখনই থানায় খবর না দিলে পরে আরও বিপদে পড়বে।' কিন্তু তিতিক্ষা নিরস্ত করেছে অলীকশেখরকে, না বাবা, ও বলছিল পুলিশে খবর না দিতে। তা হলে ওর নিশ্চিত জীবন সংশয়।

তিতিক্ষার মা কয়েকদিন কলকাতায় ছিলেন না, হঠাৎই মায়ের মা, মানে তিতিক্ষার দিদিমা অসুস্থ হয়ে পড়ায় গিয়েছিলেন ভুবনেশ্বরে ছোটোভাইয়ের ফ্ল্যাটে। তিতিক্ষার একজিবিশন দেখতে পাননি বলে সেখান থেকে ফোন করে একশোবার বলছিলেন, কী আমার ভাগ্য বল? তোর প্রথম সোলো তাও দেখা বরাতে নেই!

কিন্তু ভুবনেশ্বর থেকে ফেরার পর বিবেককে নিয়েই পড়েছেন, আবার একশোবার করে বলছেন, কী হল বল দেখি ওর! কেন দিল্লি যেতে গেল এ সময়!

তারপর ঘন ঘন ফোন করছেন, তিতি, দ্যাখ না ওর মোবাইলে লাইন পাস কি না!

এখন এত রাতেও ল্যান্ড ফোন বেজে উঠতে দেখে তিতিক্ষা নিশ্চিত হয় মা-ই ফোন করছেন আবার, রিসিভার তুলে হ্যালো বলতেই, 'তিতি, কী হল লাইন পেলি?' 'না' শুনে আবার বললেন, তা হলে আর একবার দ্যাখ না ফোন করে, পাস কি না!

তিতিক্ষা রাগমাগ করে বলল, মা, একেই তো টেনশনে ভুগছি, তার উপর তুমি আবার এমন ছটফট করতে থাকো যে টেনশন বেড়ে যায় হাজার গুণ।

মায়ের উপর রাগ না দেখালে মায়ের এই দু-মিনিট অন্তর টেলিফোন করা থামানো অসম্ভব।

মাকে থামাল বটে, কিন্তু তিতিক্ষার টেনশন তাতে কমছে না! বিবেককে নিয়ে তার কী যে জ্বালা তা সে কাউকে বলতে পারবে না। এদিকে তার বাবা বলছেন পুলিশকে খবর দেবেন। পুলিশ এর মধ্যে ঢুকলে বিবেকের পরিণতি কী হবে তা সে ভাবতে পর্যন্ত পারছে না।

অতএব বাবাকে নিষেধ করতেই হল, খবরদার, তুমি কিন্তু কিছুতেই পুলিশে খবর দেবে না।

বাবাকে নিষেধ করে ঘরে ফেরার পর থেকে সারাক্ষণ শুধু উসখুস, রাতে ভালো করে খেতেও পারল না, তবু যা হোক কিছু মুখে দেওয়ার পর যে-দামি শালোয়ার-কামিজটা পরে ছিল তা ছেড়ে একটা নাইটি পরার মতো মনও ছিল না,

ওই অবস্থায় বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছিল গভীর রাত পর্যন্ত। তাতে নষ্ট হচ্ছিল তার প্রিয় তুঁতে রঙের পোশাকটি।

যত রাত বাড়ছিল গাঢ় অন্ধকার চেপে বসতে চাইছিল তার চেতনায়। তার চারপাশ জুড়ে এক অসম্ভব ভীতি আর আশঙ্কা। বিবেক থাকলে একটা আবছা নীল আলো জ্বালিয়ে রাখে ঘরে। তাতে একটা স্বপ্ন -স্বপ্ন আবহ থাকে, কিন্তু আজ সেই স্বপ্নটা যেন দুঃস্বপ্নের আকার নিচ্ছিল চোখ মেললেই। ভয় পেয়ে নাইটল্যাম্পটা অফ করে দেয় হঠাৎ। সমস্ত আলো নিবিয়ে অন্ধকার করে রেখেছিল শয়নঘরটি। যেন চোখ খুললেই এক অদৃশ্য আততায়ী তাড়া করে আসবে তাকে। তার হাতে থাকবে একটা চকচকে ধারালো ছুরি।

কিন্তু চোখ বন্ধ করেও কি রেহাই আছে! চোখ বুজলে তো অন্ধকার আরও তীব্র ও গাঢ়। সেই অন্ধকারেও আততায়ীরা আরও হিংস্র হয়ে তাড়া করছে তিতিক্ষাকে।

এক সময় আর শুয়ে থাকতে পারল না বিছানায়। টিউবটা জ্বালিয়ে যেন স্বস্তি পেল একটু। উঠে পড়ল বিছানা থেকে। মোবাইলটা নিয়ে দ্রুত হাতে বোতাম টিপে ছুঁতে চাইল বিবেকের কণ্ঠস্বর। কিছুক্ষণ দুরু দুরু অপেক্ষা। অপেক্ষার পারদ বাড়তে থাকে একটু-একটু করে। কিন্তু বাড়াটাই সার হয়, ওদিকে মোবাইল অফ করা। তিতিক্ষা দ্বিতীয়বার, তারপর তৃতীয়বারও রি-ডায়াল করার পরও ওদিক থেকে একগুচ্ছ নৈঃশব্দ্য উপহার পেতে কিছুটা বিরক্তি, কিছুটা আতঙ্ক নিয়ে ধপাস করে বসে পড়ে বিছানায়। কী আশ্চর্য, বিবেক এরকম টেনশনবহুল মুহূর্তে কিনা মোবাইলের সুইচ বন্ধ করে রেখেছে!

রাগে, দুঃখে তার হাতের দামি মোবাইলটা বিছানার উপর ছুড়ে ফেলে দিয়ে সশব্দে শুয়ে পড়ে বিছানায়। তার বাঁ-হাতের বাহুতে একটা কামড় বসায় সজোরে। খুব রাগ-বিরক্তি হলে যেমনটি তার অভ্যাস। ব্যথা লাগতে ককিয়ে ওঠে, দাঁতে কিড়মিড় শব্দ করে বলে ওঠে, ইনকরিজিব্‌ল্! লোকটাকে নিয়ে পারা যায় না!

বাহু থেকে দাঁত তুলে নিতে দেখে বাহুর নরম চামড়ায় সারসার দাঁতের দাগ। কয়েকটা দাঁত তো তার হাতের ফর্সা চামড়া ভেদ করে রক্ত জমিয়ে দিয়েছে অনেকটা। কিছুক্ষণ চামড়ার উপর জমে থাকা রক্তের দাগ ও যন্ত্রণার কথা ভেবে ভুলে থাকতে চাইল ভিতরে ঘুলিয়ে ওঠা আতঙ্ক। পরক্ষণে তুলে নিল অবহেলায় পড়ে থাকা প্রিয় মোবাইলটা। হৃৎপিণ্ডের চেয়ে আকারে সামান্য বড়ো মেরুন রঙের মোবাইল সেটটা তার খুবই পছন্দের। দারুণ ফটো ওঠে তাই শুধু নয়, অদ্ভুত সব রিংটোন ভরা আছে যা সে ইচ্ছেমতো শোনে অবসরের মুহূর্তে। অনেক দাম দিয়ে সেদিন কিনেছে এই সেটটা।

কিন্তু মোবাইলের উপর রাগ করে কি নিস্তার পাবে তার ভিতরে জমে ওঠা আতঙ্কের পাহাড় থেকে! পাহাড়টা ক্রমশ বড়ো আকার ধারণ করে পর্বত হয়ে উঠতে চাইছে এই মুহূর্তে। হয়তো এভারেস্ট হয়ে চেপে বসবে তার বুকের উপর। শুরু হবে তার শ্বাসকষ্ট। যেমন প্রবল ভয় পেলে তার হয়ে থাকে প্রতিবার।

এমন ঘোর আঁধারে তিতিক্ষা কী করবে ভেবে পায় না বহুক্ষণ। আবার মোবাইল নিয়ে টিপতে শুরু করে তার বাহারি বোতামগুলো। কিছুটা সময় কানে মোবাইল রেখে প্রতীক্ষা। বুকের ভিতর বেহালার ছড় টানার আওয়াজ। একটু পরেই ওপাশে নৈঃশব্দ্যের তর্জনী জানিয়ে দেয় বিবেকের অনুপস্থিতি।

তিতিক্ষার শরীর জুড়ে আবারও একরাশ ছটফটানি। পরক্ষণে মোবাইল অ্যালাইভ করে রিংটোনের চ্যানেলটি খুলে দেয়। নানা ধরনের রিংটোন বাজতে থাকে একের পর এক। রিংটোন শোনা তার এক প্রিয় বিলাস। রিংটোনের মায়াবী সুরের জালে কিছুটা সময় নিয়োজিত রাখতে চেষ্টা করে নিজেকে। কোথায় যেন পড়েছিল মিউজিক থেরাপির কথা। সুরের জাদু নিরাময় করে দিতে পারে কোনও জটিল অসুখ। যারা রিংটোনগুলি মোবাইলের শরীরে সঞ্চিত করে উপহার দেয়, তাদের মিউজিক সেন্সের তারিফ করছিল রাতের এই নিভৃত প্রহরে একা একা। রিংটোনের মাঝখানে হঠাৎ নিবিয়ে দিল ঘরের আলো। অন্ধকার ঝাঁপিয়ে পড়তে শুয়ে পড়ল বালিশটা টেনে নিয়ে। সুরের মায়াজালে বন্দি হয়ে থাকতে চাইল আতঙ্কের হাত থেকে রেহাই পেতে।

কিছুক্ষণ সুরের তারে নিজেকে পেঁচিয়ে বাঁধতে থাকে। মনে হচ্ছিল কোনও একটা জলপ্রপাতের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, আর বহু উপর থেকে প্রপাতের জল একটানা ঝরে পড়ছে নীচের কোনও বোল্ডারের উপর। বড়ো বোল্ডারের গায়ে পড়ে সেই জলধারা ছিটকে পড়ছে নীচে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য ছোটো ছোটো বোল্ডারের উপর। সেই অদ্ভুত শব্দের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে কানও সুরেলা তারের টুংটাং ধ্বনি। কী চমৎকার সেই মিষ্টি শব্দের মূর্ছনা। সম্মিলিত জলস্রোত আর টুংটাং ধ্বনির সমন্বয়ে যে সুরের উদ্ভব হচ্ছে তা চোখে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

কিন্তু তিতিক্ষার চোখে আজ ঘুম আসবে কী করে! একটানা সুরের সঙ্গে মিলমিশ হয়ে আছে এক গাঢ় আতঙ্ক। আতঙ্কেরও বোধহয় এক অন্য সুর আছে যা শরীরের ভিতরে প্রবাহিত করে অ্যাড্রোনালিন। রিংটোনের শব্দের সঙ্গে অ্যাড্রোনালিন মিশে কী এক অসহনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে তা এক তিতিক্ষাই অনুভব করছে এই মুহূর্তে। যা শুনতে পাচ্ছে এখন তা জলের প্রপাত নয়, ফোঁটা ফোঁটা আড্রোনালিন ঝরে পড়ারই শব্দ। সেই শব্দ ভেসে আসছে শরীরের কোন গহন নিভৃত থেকে। সেই শব্দে সচকিত হচ্ছে তিতিক্ষার ভিতরের তাবৎ নৈঃশব্দ্য।

তা সত্ত্বেও বোধহয় তার চোখ জুড়ে এসেছিল, হঠাৎই এক অন্য রিংটোনের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল তার। চমকে উঠে বসে সুইচ অন করতেই ওপাশ থেকে হিজবিজ শব্দ। মোবাইলের ওপাশ থেকে প্রায় কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। তার মধ্যে অনেক 'কী-কী-কে বলছেন-'এর মধ্যে বুঝে উঠতে পারে বিবেকই ফোন করেছে তাকে, কিন্তু সারা রাত মোবাইলের রিংটোন চালু রাখার ফলে মোবাইলের চার্জ প্রায় নিঃশেষ।

তিতিক্ষার ইচ্ছে করছিল তার বাহুর চামড়া কামড়ে ছিঁড়ে ফেলতে। কেন সে মোবাইলের রিংটোন চালু রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল তখন!

তবু একরাশ হিজিবিজির মধ্যে উদ্ধার করতে পারল, তিতি, আমি একটু পরেই প্লেনে উঠছি।

তিতিক্ষার বুকের ভিতর আবার রিংটোন। এবার আর তাতে অ্যাড্রেনালিন মিশে নেই। বড়ো করে একটা শ্বাস ফেলে জানতে চাইল, কখন পৌঁছোচ্ছ?

ওপাশে আবার হিজিবিজি শব্দ। তার একটু পরেই লাইন কেটে গেল 'ব্যাটারি শেষ' এই লাল আলোটি জ্বালিয়ে। তিতিক্ষার ইচ্ছে হচ্ছিল মোবাইলটা আছড়ে ছুড়ে ফেলে মেঝেয়। পরক্ষণে নিজেকে জোর সামলাল নইলে তার মোবাইলের দফারফা হয়ে যেত এতক্ষণে।

এর আগে বেশ কয়েকটা মোবাইল সেট তার এই আচমকা রাগের কারণে মৃত্যুবরণ করেছে সে ঘটনা তার চেনাজানা অনেকেই জানে। তার মধ্যে লাল টুকটুকে রঙের একটি মোবাইল সেট তার খুব পছন্দের ছিল, সেই সেটটা চুরমার হয়ে যেতে, বা বলা ভালো, চুরমার করে ফেলতে তার খুব মন খারাপ ছিল অনেকদিন। সেই মোবাইল সেটের শোক তার মনে উথলে ওঠে প্রায়ই। তার পর শোরুমে গিয়ে ঠিক সেরকমই একটা লাল টুকটুকে সেটের খোঁজ করেছে কতদিন।

পরক্ষণে মোবাইলটাকে নিয়ে বসিয়ে দিল চার্জে। সুইচ অফ করল না এই ভেবে যে বিবেক যে কোনও মুহূর্তে আবার ফোন করতে পারে হয়তো।

একটু সকাল হতেই হঠাৎ ল্যান্ডলাইন বেজে উঠতে সে প্রথমে লাফিয়ে ওঠে বিবেকের ফোন ভেবে, পরক্ষণেই ফোনের রিং শুনে বুঝতে পারে এটি দূরপাল্লার ফোন নয়, লোকাল। দিল্লির ফোন হলে একটু থেমে থেমে বাজত ফোনের রিং। কর্ডলেসটা কানে দিতেই মায়ের গলা, কী হল তিতি, পেলি বিবেককে?

তিতিক্ষার বিরক্ত লাগছিল, তবু ঠাণ্ডা গলায় বলল, পেয়েছি।

—কী বলল বিবেক? সব ঠিক আছে?

—আছে। বলল একটু পরেই ফ্লাইট ধরবে।

ওপাশ থেকে মায়ের গলায় স্বস্তি। আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কোন ফ্লাইটে আসছে তা জিজ্ঞাসা করেছিস?

তিতিক্ষা সত্যি কথাটাই বলল, না হলে মায়ের আরও অজস্র প্রশ্নবাণের মুখোমুখি হতে হবে এখনই। বলল, আমার মোবাইলে চার্জ ছিল না, ভালো করে সব জিজ্ঞাসা করতে পারিনি। বলেছে সকালের ফ্লাইটেই আসবে। নিশ্চয় একটু পরেই এসে যাবে। দেখে নিচ্ছি দিল্লির প্রথম ফ্লাইট ক-টায় পৌঁছোয় কলকাতায়।

—মোবাইলে চার্জ ছিল না? সে কী রে? একটু খেয়াল রাখতে পারিস না? বিবেক বাইরে আছে আর তুই কিনা—

—মা এখন রাখি, আমার মন ভালো নেই, আমি একটু পরে যাচ্ছি তোমাদের ওখানে, বলে ফোনটা নামিয়ে রাখতে যাচ্ছিল, মায়ের সংলাপ তখনও শেষ হয়নি, তিতি, গাড়ি পাঠিয়েছিস এয়ারপোর্টে?

-ও বোধহয় মোবাইলে ডেকে নিয়েছে গাড়ি। একটু আগেই রোহন বেরিয়ে গেছে গাড়ি নিয়ে।

বলে ফোনটা নামিয়ে রেখে দেয় যথাস্থানে। মায়ের কথা তার অস্থিরতা বাড়িয়ে দেয় আরও। প্রতিটি মুহূর্ত ছোটো ছোটো বোল্ডারের মতো গড়িয়ে যাচ্ছে তার বুকের উপর দিয়ে। বুকের ভিতরে একটানা ধক ধক শব্দ। সে আর স্থির থাকতে পারে না, দ্রুত প্রস্তুত হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে, সোজা বাবার কাছে যায়। অলীকশেখর ড্রয়িংরুমে বসে ন্যস্ত হয়েছিলেন সংবাদপত্রের মুখোমুখি। তাঁর চশমা পরা কাঁচাপাকা চুলের মুখটা ঢাকা পড়েছিল ইংরেজি কাগজটার আড়ালে। অলীকশেখর এ সময়ে ব্যবসাবাণিজ্যের পৃষ্ঠা কিছুক্ষণ চিবোন ভারি মনোযোগ দিয়ে। তাঁর মনের প্রতিটি বিন্দু ঘুরপাক খায় তাঁর ব্যবসা-সংক্রান্ত বিষয়গুলিতে। তিতিক্ষা তাঁর সামনের সোফায় বসতেও অলীকশেখরের সাড় ভাঙেনি। তিতিক্ষা অপেক্ষা করতে থাকে, অপেক্ষার মধ্যে তার সামনে চায়ের কাপ এসে পৌঁছোতে অলীকশেখরের মনে হল কেউ বোধহয় এসেছে তাঁর কাছে। খবরের কাগজ নামিয়ে তিতিক্ষাকে দেখে বললেন, বিবেকের ফ্লাইট কখন ল্যান্ড করছে?

মায়ের কাছে বলা খবরের প্রতিটি পঙক্তিই বাবার কানে গেছে তা তিতিক্ষা বুঝে ফেলে বলল, আটটা পঁচিশে লেখা আছে দেখলাম।

—এয়ারপোর্টে ফোন করে জেনে নিয়েছিস প্লেন রাইট টাইম কি না?

তিতিক্ষা ঘাড় নাড়ে, হাতের কব্জিতে চোখ রেখে বলল, না। তবে রাইট টাইমে তো আসে শুনেছি।

—ওরকম অনেক কিছু লেখা থাকে। একবার এয়ার পোর্টে ফোন করে দেখে নে ঠিক সময়ে প্লেন ল্যান্ড করছে কি না।

তিতিক্ষা মুখ ব্যাজার করে বলল, এয়ারপোর্টের নম্বর তোমার কাছে আছে?

অলীকশেখর তাঁর পিছনের একটি শৌখীন দেরাজ খুলে বার করলেন একটি ছোটো আকারের টেলিফোন নম্বর লেখা ডায়েরি। তার পৃষ্ঠা খুলে এগিয়ে দেন তিতিক্ষার দিকে, এই নে।

বলে কর্ডলেসটাও এগিয়ে দেন, নে—

তিতিক্ষা তার হাতঘড়িতে পুনর্বার চোখ বুলিয়ে বলল, আ রে, আটটা বত্রিশ বাজে। নিশ্চয় প্লেন ল্যান্ড করেছে।

বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে কর্ডলেসের বোতাম টিপতে শুরু করে, দু-একবার এমন প্রক্রিয়ার পর বলল, এনগেজড্ টোন আসছে।

বলে আবারও টিপতে শুরু করে কর্ডলেসের বোতাম।

এমন মিনিট দশেক টানা ব্যর্থতার পর হঠাৎ শুনল তার মোবাইলের রিংটোনে ঝরনাসুর। দ্রুত কর্ডলেসটা নামিয়ে রেখে লাফিয়ে ওঠে, এই তো ওর ফোন।

সঙ্গে সঙ্গে সুইচ অন করতেই ওদিক থেকে কিছু শোনে, তার চোখে ভীতির ছাপ, তার গলা শুকিয়ে যায় দ্রুত, শুধু ফ্যাঁসফ্যাঁস স্বরে বলতে পারল, সে কী! তুমি এখন কোথায়?

তার গলায় প্রায় আর্তনাদের সুর, তারপর আবার কিছু শোনে, হঠাৎ মোবাইল বন্ধ করে বাবার দিকে তাকায়, সেই একই রকম আর্তনাদের গলায় বলল, বাবা, ও খুব বিপদে পড়েছে—

অলীকশেখর লক্ষ করছিলেন তিতিক্ষার অভিব্যক্তি, ভুরু কুঁচকে বললেন, কী বিপদ?

—ও বলছে এয়ারপোর্ট থেকে বেরোনোমাত্র ওকে কিডন্যাপ করেছে।

—কিডন্যাপ! কে কিডন্যাপ করল?

—তা ও বুঝতে পারছে না। এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে গাড়ি খোঁজাখুঁজি করছে, রোহনের দেখা পেয়ে যেই না গাড়িতে উঠতে যাবে, হঠাৎ একটি লোক এসে বলল, 'এক মিনিট দাঁড়ান, আপনার সঙ্গে কথা আছে।' তার কথা শুনে একটু থমকে গেছে অমনি তাকে গাড়ির মধ্যে ঠেলে দিয়ে তিনজন লোক উঠে বসেছে গাড়ির মধ্যে। এখন ওর বুকে পিস্তল ঠেকানো, ওরা উঠেই বলেছে, তোমার কাছে যা আছে দিয়ে দাও, নইলে এক গুলিতে—

বলতে গিয়ে ফুঁপিয়ে উঠল তিতিক্ষা।

অলীকশেখর কড়া চোখে তাকাচ্ছিলেন তিতিক্ষার হাতের মোবাইল সেটটির দিকে, জিজ্ঞাসা করলেন, বিবেক কোথা থেকে কথা বলছে?

—বলছে এয়ারপোর্টের বাইরে কোনও একটা জায়গা থেকে।

—কী ছিল ওর কাছে? টাকাপয়সা কিছু?

—হ্যাঁ। বলল পাঁচ লাখ টাকা ক্যাশ ছিল—

—পাঁচ লাখ? সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল দিল্লিতে?

তিতিক্ষা মাথা নাড়ে, না। দিল্লিতে গিয়ে পেমেন্ট পেয়েছে। তা ছাড়া ওর সঙ্গে চেক ছিল, পঁয়ষট্টি লাখ টাকার। চেকটাও নিয়ে নিয়েছে।

—চেক নিয়ে ওরা কী করবে? ক্রশ্‌ড্ চেক ছিল না?

—হ্যাঁ। অ্যাকাউন্ট পেয়িই। কিন্তু সেটা নিয়ে বলছে, এখনই তোমার বাড়ির কাউকে অন্তত চল্লিশ লাখ টাকার ক্যাশ নিয়ে আসতে বলো। তা হলে চেকটা ফেরত দিয়ে দেব। পরে ভাঙিয়ে নেবে।

—ইমপশিব্‌ল্। অলীকশেখরের অভিব্যক্তি খুবই কঠিন দেখাল।

তিতিক্ষার মুখখানা মুহূর্তে চুপসে এইটুকু। বাবার মুখের দিকে তাকায় অসহায় চোখে, বলল, বাবা, ওর গলার স্বরে মৃত্যুভয়। কেমন বিশ্রী শোনাচ্ছিল স্বরটা। বলছিল টাকাটা না দিলে ওরা এখনই খুন করবে ওকে। ক-দিন ধরেই বলছিল কে বা কারা ফলো করছে ওকে। টেলিফোনে শাসাচ্ছে অনবরত।

—কারা শাসাচ্ছে? ও কি চিনতে পেরেছে কাউকে?

তিতিক্ষা ঘাড় নাড়ে, মনে হয় না।

—ঠিক আছে, আমি পুলিশে খবর দিচ্ছি।

—পুলিশে! তিতিক্ষার স্বরেই এবার মৃত্যুভয়, বাবা, ওরা নাকি একটা ধারালো ছুরি ওর গলার কাছে ধরে রেখেছে। বলছে, এখনই কোনও পজিটিভ উত্তর এনে দাও। নইলে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তোমার ধড়মুণ্ডু আলাদা হয়ে যাবে।

তিতিক্ষার মা বোধহয় আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন অলীকশেখরের সঙ্গে তিতিক্ষার কথোপকথন, হঠাৎ তাঁর গলায় অদ্ভুত গোঙানি শুনে দুজনেই সচকিত হয়ে সেদিকে চোখ রাখতে দেখল তাঁর দাঁতে দাঁত লেগে এক অদ্ভুত দৃশ্য। দরজা ধরে চোখ বুজে নিশ্চল দাঁড়িয়ে।

তিতিক্ষা দ্রুত উঠে গিয়ে তাঁকে ধরে না-ফেললে নির্ঘাত পড়ে যেতেন মেঝেয়। তাতে একটা বড়ো বিপর্যয় ঘটে যেতে পারত এখনই। তাঁকে বিছানায় শুইয়ে জলবাতাস করে কিছুটা সুস্থ করতেই তিনি অলীকশেখরের উদ্দেশে বললেন, তুমি যা হোক করে টাকাটা দেওয়ার ব্যবস্থা করো—

অলীকশেখর তাঁর সিদ্ধান্তে অনড়, এ তো পুলিশের কাজ। আমি বরং ডি সি ডি ডি-কে ফোন করে দি।

তিতিক্ষা হাউমাউ করে কেঁদে বলল, বাবা, বরং আমি গার্গীদিকে ফোন করে দি। পুলিশে ফোন করলেই হয়তো ওকে মার্ডার করে দেবে।

৪

ফেব্রুয়ারির শেষ, সামান্য গরম পড়ে যাওয়া কথা, কিংবা আসার কথা বসন্তের, তবু সকালের হাওয়ায় এখনও শীতের কিছু কামড় থাকায় ভারি উপভোগ্য লাগছিল গার্গীর। সায়নকে বলছিলও, কী ব্যাপার, শীত দীর্ঘায়িত হচ্ছে, বসন্ত আসছে না, দেশের কোথাও কি কোনও স্বার্থপর দৈত্যের আগমন ঘটে গেল!

সায়ন বলছিল, সারা দেশেই স্বার্থপরতা বাড়ছে, হয়তো তাই—

কসবা এলাকায় 'ড্রিমহাউস' নামের একটি হাইরাইজ বিল্ডিঙের ফোর্থ ফ্লোরে প্রায় আঠারোশো স্কোয়ার ফুটের নতুন ফ্ল্যাটে সায়ন আর গার্গী উঠে এসেছে কয়েক মাস। বাড়িটির চারপাশে অনেকটা ফাঁকা জায়গা থাকায় কলকাতার পূর্বপ্রান্তের অনেকখানি দেখা যায় তাদের জানালা দিয়ে। প্রতি দেওয়ালেই একটা-দুটো জানালা থাকায়, সেই সঙ্গে ঘরগুলোও বেশ প্রশস্ত হওয়ায় খুব আলোবাতাস খেলে ঘরের সর্বত্র। এতকাল পরে অনুভব করতে পারছে বসবাসের আরাম।

কিন্তু জীবনযাপনের ব্যস্ততা রয়েই গেছে। শুধু ব্যস্ততা নয়, যাকে বলে শশব্যস্ততা। সারাদিন অফিস, মিটিং আর ছুটে বেড়ানো এখানে-ওখানে। নিশ্বাস নেওয়ারও নেই ফুরসত। গার্গী বলছিল, মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে ছুটে পালিয়ে যাই কোথাও।

সায়ন তার নৈর্ব্যক্তিক কণ্ঠস্বরে যথারীতি বলল, কোথাও বেড়াতে গেলেই হয়।

গার্গী হেসে বলল, তোমার সময় আছে!

ড্রয়িংরুমের ফিকে সবুজ রঙের দেওয়ালে একটি ক্যালেন্ডারের পৃষ্ঠা উড়ছিল হিমেল হাওয়ায় উথালপাতাল হয়ে। যতবারই রং-চকচকে পৃষ্ঠাগুলোর ওলটপালট হওয়ার শব্দ হয়, গার্গীর চোখ আছাড় খেয়ে পড়ে ক্যালেন্ডারের ছবিটার উপর। ইংলিশ চ্যানেলের নীলচে জলের উপর ভেসে থাকা একটি বড়োসড়ো জাহাজ, জাহাজটার রং এমনই দুধসাদা যে দেখলেই মনে হয় একটি বিশাল রাজহাঁস ডানা মুড়ে বসে আছে মাঝসমুদ্রে। এমন একটি স্বপ্নের জাহাজের ডেকে আড় হয়ে বসে একটি স্বল্পবসনা সুন্দরী তরুণী ডাকছে হাতছানি দিয়ে, যেন তার পাশে বসে থাকলে অনুভব করা যাবে অমৃত-আরাম।

ক্যালেন্ডারটি কোনও এক বিদেশি হোটেল কম্পানির যাদের নামীদামি হোটেলগুলি ছড়িয়ে আছে ইউরোপের প্রতিটি শহরে। ইউরোপের এমন বারোটি শহরের ছবিসমৃদ্ধ ক্যালেন্ডারটির প্রতিটি পৃষ্ঠায় চুম্বকপ্রতিম ছবি যা দেখলেই প্রতি মুহূর্তে ইচ্ছে হবে সেই সব শহরে বেড়াতে যেতে। প্রতি পৃষ্ঠায় একটি করে বসনস্খলিত তরুণীর হাস্যমুখী আহ্বান। ফেব্রুয়ারিতে যদি ইংলিশ চ্যানেলের ছবি হয়

তো মার্চে প্যারিসের আইফেল টাওয়ার। এপ্রিলে বার্লিনের একটি সুদৃশ্য পার্ক, মে-তে...

রাতে খাবার টেবিলে বসে সায়ন আর গার্গী অনেকবারই আলোচনা করেছে একবার ইউরোপ ঘুরে এলে হয়! কিন্তু ভাবনাটা আলোচনার স্তরেই থেকে যায় রোজ কেন না প্রতিবারই দিনক্ষণ ঠিক করতে গিয়ে সায়নের মনে পড়ে যায় মার্চে তার এই প্রোগ্রাম, এপ্রিলে অমুক, মে-তে তমুক ইত্যাদি। তারপর একসময় গার্গী হেসে বলে, বোধহয় আমাকে নিয়ে গেলে অমন সুন্দরী তরুণীরা তো আর তোমার অপেক্ষায় থাকবে না, তাই তোমার সময় হচ্ছে না! আর আমি তেমন সুন্দরীও তো নই।

সায়ন হো হো করে হেসে উঠে বলল, আমার স্ত্রীর সৌন্দর্য যত না বাইরে, তার চেয়ে ঢের বেশি তার মনের ভিতরে। তোমার একটা অন্য সৌন্দর্য আছে যা ডাকসাইটে সুন্দরীদের থাকে না।

গার্গী তার কথায় পাত্তা না দিয়ে বলল, তবে ইউরোপে যাওয়া হোক না হোক মানসভ্রমণ তো হয় মাঝেমধ্যে!

আজ সকালেও ক্যালেন্ডার ওড়ার শব্দে আর এক প্রস্থ মানসভ্রমণ দুজনের। আজ সায়ন বলেছে জুন-এ কোনও প্রোগ্রাম রাখবে না, ইউরোপে যাবেই যাবে। লুনা একটু বড়ো হয়েছে, তিন প্লাস। এমন পাকা পাকা কথা বলতে শিখেছে যে, সে এখন ইউরোপ ভ্রমণের পক্ষে যথেষ্ট সাবালিকা।

শুধু তাদের বাড়ির গেস্টরুমে সোনালিচাঁপা থাকে, তাকে নিয়েই যা চিন্তা। সোনালিচাঁপা এখন গার্গীর সঙ্গে লেপ্টে থাকে সারাক্ষণ। তাকে ছাড়া গার্গীর চলেও না। কিন্তু সোনালিচাঁপা তাদের ভ্রমণসঙ্গী হতে নারাজ। বলছে, 'সবসময় আমি তোমাদের ল্যাংবোট হয়ে ঘুরে বেড়াব কেন? তোমাদেরও তো একটা আলাদা লাইফ থাকা দরকার, তাই না, গার্গীদি?' তা হলে সোনালিচাঁপাকে একা রেখে যাবে বাড়িতে, না তার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে সে আলোচনাও করে নিয়েছে ইতিমধ্যে। সোনালিচাঁপা বেশ সাহসী, তার পক্ষে একা এই ফ্ল্যাটে থাকা হয়তো সমস্যা নাও হতে পারে।

অতঃপর সায়ন ব্রেকফাস্ট খেয়ে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর তার নিজের অফিসে যাওয়ার প্রস্তুতিপর্ব। সকালেই সারা হয়ে যায় তার স্নান, তারপর প্রথমে লুনাকে খাওয়ানো, পরে নিজের। লুনাকে খাইয়ে রেখে যাওয়াটাই প্রধান সমস্যা। লুনা তার এই তিন বছর বয়সে কী খাবে আর কী খাবে না সেই দাবিতে সারাক্ষণ মুখর। তার মুখের কাছে খাবার নিয়ে এলেই প্রথমে মুখ ঘুরিয়ে নেবে, তারপর চলবে খাওয়া নিয়ে যুদ্ধ।

সেই যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে গার্গী কর্নফ্লেক্সে দুধ ঢালছিল সাবধানে।

ওদিকে রান্নাঘরে শেষ পদটি রাঁধতে ব্যস্ত চন্নর মা। নতুন একটা কাজের মাসি পেয়েছে, তার নামটাও যেমন ভারি অদ্ভুত, তেমনই তার হাসির ধরনটাও। নাম জিজ্ঞাসা করতেই বলে, চন্নর মা। ঠিকই ধরেছিল, চন্ন বোধহয় তার ছেলের নাম। জানতে চাইতে তা-ই বলেছিল। চন্ন আসলে চন্দনের অপভ্রংশ। গার্গী বারবার জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আপনার আসল নাম কী?' কিন্তু চন্নর মা নিজের আসল নামটাই ভুলে গেছে কীভাবে যেন। চন্নও আর বেঁচে নেই। মাত্র দু-বছর বয়সে চন্নর ম্যানেনজাইটিসে আক্রান্ত হওয়া ও দুদিনের ঘোর জ্বরে মারা যাওয়ার ঘটনা বলতে গিয়ে চন্নর মা সেদিনও কেঁদে ভাসিয়েছে। চন্ন মারা গেছে তাও অন্তত দশ বছর আগে।

সেই চন্নর মা এখন একবার গ্যাসের উপর ঝুঁকে পড়ে পোস্ত-ঢ্যাঁড়শের রসায়নে ব্যস্ত, পরক্ষণে দ্রুত হাতে কয়েকটা পরোটা বেলছে গার্গী টিফিনে নিয়ে যাবে বলে।

ঠাণ্ডাটা যাই-যাই করেও যাচ্ছে না বলে গার্গী লুনার মাথায় একটা উলের হালকা টুপি পরিয়ে দিয়েছে বলে লুনা মাঝেমধ্যে প্রতিবাদ জানাচ্ছিল টুপিটা খুলে ফেলতে চেষ্টা করে। গার্গী তাকে বোঝাতে চেষ্টা করছিল টুপি পরার উপযোগিতা ও আরামের কথা। কিন্তু লুনা ছোটো থেকেই খুব বিদ্রোহী স্বভাবের। মায়ের কথা শোনার চেয়ে না-শোনার ব্যাপারেই বেশি আগ্রহী।

সকালের এই ব্যস্তসমস্ত মুহূর্তে হঠাৎই একটা ফোন বাজতে গার্গীর মুখের রেখায় সুন্দরবনের মানচিত্র। এ-সময় তার মৃত্যুবরণেরও যে সময় থাকে না তা ফোন-কারকরা কেন যে বোঝে না!

সোনালিচাঁপা কাছাকাছি থাকলে সে-ই ফোন ধরে, কিন্তু সেও গার্গীর সঙ্গে একই গাড়িতে অফিসে যায় বলে নিজের ঘরে প্রস্তুত হচ্ছে এখনই এ ঘরে খেতে আসবে। গার্গী অতএব লুনাকে চুপ করে বসে থাকতে বলে, কর্নফ্লেক্সের বাটিটা পাশে জিরোতে দিয়ে তুলে নিল পাশে রাখা কর্ডলেসটি। হ্যালো বলতেই ওপাশে যার গলা সে তিতিক্ষা।

তিতিক্ষার গলায় প্রবল আর্তনাদের ঢেউ, গার্গীদি, খুব বিপদে পড়ে গেছি।

গার্গীর মগজে তিতিক্ষার কিমোনো-পরা হাসি-হাসি মুখখানা চলকে উঠল মুহূর্তে। এই তো দু-দিন আগেই দেখে এল তার ছবির একক প্রদর্শনী। তিতিক্ষার রূপের ঐশ্বর্য এতটাই বেশি তার আঁকা ছবির চেয়ে তাকে দেখাটাই বেশি আকর্ষণের। হঠাৎ তার কী এমন বিপদ হল—

—কী হয়েছে, তিতিক্ষা?

—বিবেককে কিডন্যাপ করেছে একটু আগে।

—সে কী! গার্গীর গলায় তিতিক্ষার আর্তনাদ চারিয়ে গেল মুহূর্তে। পরক্ষণে তার মগজের রিলে পর পর যে-ছবি গড়িযে গেল তা ক-বছর আগে অপহৃত হওয়া এক সফল ব্যবসায়ীর সংবাদপ্রবাহ।

পরক্ষণে গার্গী জানতে চায়, কখন হল? কোথায় হল? সেদিন বলেছিলে দিল্লি গেছে বিবেক!

—দিল্লি থেকে সকালের ফ্লাইটে এসে একটু আগেই ল্যান্ড করেছিল কলকাতায়। এয়ারপোর্ট থেকে বেরোতেই—

তিতিক্ষার কাছে খুব সংক্ষেপে বিবেকের অপহৃত হওয়ার কাহিনি শোনার মধ্যেই লুনা উল্টে দিয়েছে কর্নফ্লেক্সের বাটি। তার মানে সোফাটার দফারফা। কিন্তু গার্গী এখন এমন একটি সমস্যায় লন্ডভন্ড যে সোফার কথাও ভাবার ফুরসত নেই। চন্নর মা গ্যাস নিবিয়ে তড়িঘড়ি চলে এসে পরিষ্কার করতে শুরু করে দামি সোফার কভারটি।

কিছুক্ষণ পর ওপাশ থেকে তিতিক্ষার ভয়ার্ত স্বর, গার্গীদি, তুমি এক্ষুনি চলে এসো। যে কোনও মুহূর্তে বিবেকের কিছু একটা হয়ে যাবে।

গার্গী তার সংশয় কাটাতে জিজ্ঞাসা করে, কিডন্যাপ হওয়ার ঘটনাটা কি এয়ারপোর্টের লোকজনের নজরে পড়েছে?

তিতিক্ষার কণ্ঠস্বর আরও সংশয়ে ভরা, আমি ঠিক জানি না, গার্গীদি। ও বলল ওকে তিনজনে মিলে গাড়ির মধ্যে ঠেলে দিয়ে উঠে পড়েছে জোরজবরদস্তি করে।

—তুমি বলছ বিষয়টা কারও নজরে পড়েনি?

তিতিক্ষার গলা নিঃসন্দেহ হয় না, কী জানি নজরে পড়েছে কি না!

গার্গী বেশ দিশেহারা হয়ে পড়ে ঘটনাটার আগাপাশতলা ভাবতে গিয়ে। তিতিক্ষার বাবা অলীকশেখরকে তারা চেনে বহুদিন থেকে। বেশ লম্বা, জাঁদরেল চেহারা। ফর্সা রং। মাথার সামনে সামান্য টাক। চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা। পুরু ও ঝাঁকড়া গোঁফ থাকায় তাঁর চেহারায় একটা গ্র্যাঞ্জার। ব্যবসায়ী হিসেবে যেমন দক্ষ তেমনই হিসেবি অর্থনৈতিক সংক্রান্ত বিষয়ে। গাড়ির লগবুক নিজেই লেখেন রোজ যাতে প্রতি লিটার ডিজেলের হিসেব রাখতে পারেন খুঁটিনাটি। সেই অলীকশেখর বিবেকের মুক্তিপণ দিতে চল্লিশ লাখ টাকা দিয়ে দেবেন এক কথায় তা প্রায় অসম্ভব। গার্গী শুনেছে বিবেককে একেবারেই না-পছন্দ তাঁর। বিবেকের সঙ্গে তিতিক্ষার বিয়ে দেওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিল না কেন না অলীকশেখরের বিত্তের কাছে বিবেক নিতান্তই ভিখারি সম্প্রদায়ের। তবু মেয়ের ইচ্ছের কাছে নতিস্বীকার করে বাধ্য হয়েছিলেন বিয়ে দিতে, তারপর চেষ্টা করেছিলেন বিবেককে

দাঁড় করাতে। কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক বিবেকের বাণিজ্যবরাত তেমন সুবিধের হয়নি।

—ঠিক আছে, তিতিক্ষা। আমি আধঘন্টার মধ্যেই পৌঁছোব।

অফিসে পর-পর দুটো মিটিং ছিল, তা আপাতত ঘন্টা তিনেকের জন্য মুলতবি করে লুনাকে চন্নর মায়ের হেপাজতে দিয়ে গার্গী রওনা দিল তিতিক্ষাদের নিউ আলিপুরের বাড়ির দিকে। বিজন সেতু পার হয়ে টালিগঞ্জ ফাঁড়ির জ্যামবিক্ষুব্ধ মোড় পেরিয়ে মিনিট পঁচিশের চেষ্টায় হাজির হল অলীকশেখরের বিশাল তিনতলা বাড়ির গেটের কাছে। তিতিক্ষার কাছে জেনে নিয়েছে সে এখন নিজের বাড়িতে নেই, আছে তার বাবার কাছে। এ ধরনের বাড়ি প্রায়ই সারমেয়সমৃদ্ধ হয়ে থাকে বলে গার্গী মোবাইলে খবর দিল তিতিক্ষাকে, 'আমি এসে গেছি'। একটু পরেই ইস্পাতফ্রেমের রাজকীয় গেট খুলে তাকে ভিতর পর্যন্ত নিয়ে যায় দরোয়ান।

অলীকশেখরেব বিশাল অট্টালিকায় কখনও প্রবেশ করতে হবে তা ভাবেনি গার্গী। এখন আর রাজারাজড়াদের প্রাসাদ বা মঞ্জিলের দিন নেই, তা বর্তেছে বড়ো ব্যবসায়ীদের বরাতে। একের পর এক ব্যবসা বাড়িয়েছেন অলীকশেখর আর তার বৈভব প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর প্রাসাদপ্রতিম বাড়িতে। দোতলার সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময়েই সেই বিত্তের ছাপ। বিশাল সব অয়েল পেন্টিং দেওয়ালের প্রতি খাঁজে টাঙানো। উপরে উঠে দেখল দোতলার চোখ-ধাঁধানো ড্রয়িঙে তখন অলীকশেখরের মুখোমুখি তিতিক্ষা। দুজনেরই মুখ থমথমের চেয়ে কিছু বেশি। তিতিক্ষার মা অসুস্থ, বিছানায়। একটু আগেই ডাক্তার এসেছিল তাঁর জন্য।

গার্গী আসতেই তিতিক্ষা উঠে দাঁড়ায়, এসো, গার্গীদি। তোমার সঙ্গে তো আমার বাবার পরিচয় আছে।

তেমন পরিচয় ছিল তা নয়, তিতিক্ষার একক প্রদর্শনীতে গিয়ে ভালোভাবে আলাপ। অলীকশেখর গার্গীকে পর্যবেক্ষণের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, তুমি প্যারাডাইস প্রোডাক্টস-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর এই পরিচয়টাই সেদিন শুনেছিলাম, কিন্তু তুমি এ সব কেস ইনভেস্টিগেশনও করো তা কিন্তু তিতি সেদিন বলেনি।

পাশের খালি সোফাটায় বসে গার্গী ঈষৎ লাজুক কণ্ঠে বলল, তেমন কিছু নয়, মেসোমশাই। মাঝেমধ্যে কেউ ঝামেলায় পড়লে আমি একটু আধটু চেষ্টা করি যদি কোনও সুরাহা করা যায়।

—তুমি তা হলে দ্যাখো বিবেককে কোনও ভাবে ওদের কবল থেকে ছাড়িয়ে আনা যায় কি না!

গার্গী যে ইতিমধ্যে বিষয়টি নিয়ে অনেক কিছু ভেবেছে তা বোঝা গেল তার পরবর্তী কথায়, বলল, কলকাতা একটি বিশাল শহর। এখানে কাউকে কিডন্যাপ

করলে তাকে লুকিয়ে রাখা খুব সুবিধের। তাকে কোথায় রাখা হয়েছে তা না বোঝা পর্যন্ত বিবেককে ছাড়িয়ে আনা খুবই কঠিন ব্যাপার।

তিতিক্ষা চোখ বিস্ফারিত করে বলল, তা হলে কী হবে?

—আচ্ছা তিতি, ওরা কি বলেছে কোথায় মুক্তিপণ দিতে হবে?

—হ্যাঁ, বলেছে। বিবেকের মোবাইলে এস এম এস পাঠিয়ে ইয়েস বললে ওরা লোক পাঠাবে টাকা নিতে। টাকমাথা একটা লোক মাঝেরহাট ব্রিজের ঠিক মুখে দাঁড়িয়ে থাকবে প্লাস্টিকের একটি ব্যাগ হাতে নিয়ে। তার হাতে টাকাটা দিলে একঘন্টা পরে ছেড়ে দেবে বিবেককে। আর যদি কোনও এস এম এস না পাঠাই তা হলে ওরা বিবেককে—

আর কিছু বলতে পারল না তিতিক্ষা, তার চোখ ভরে আবার জল।

গার্গী দেখছিল তিতিক্ষার চোখে জল দেখেও একটুও ভাবান্তর হয় না অলীকশেখরের। তাঁর মুখ একই রকম শক্ত। তাঁর সিদ্ধান্তে অনড়।

এতক্ষণ যে-কথাটা জিবে জড়িয়ে নিয়ে আসছিল, তাই বলল গার্গী, আপনি কি পুলিশে কিছু জানিয়েছেন, মেসোমশাই?

— না, এখনও দিইনি। তিতি বলতেই দিচ্ছে না পুলিশকে। কিন্তু পুলিশে খবর দেওয়া ছাড়া এখন তো কোনও উপায় নেই।

তিতিক্ষা সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করে যা সে এতক্ষণ বলে আসছে, গার্গীদি, ওরা সাংঘাতিকভাবে থ্রেট করছে বিবেককে। পুলিশে খবর দিলেই—

গার্গী বাবা-মেয়ে দুজনকেই মাপছিল তীক্ষ্ণ নজর ফেলে। বিবেক সম্পর্কে অলীকশেখরের মনে যে বিন্দুমাত্র মায়ামমতা নেই তা বুঝতে অসুবিধে নেই। বিবেকের যদি কিছু হয়েও যায়, তাতেও তাঁর কোনও দুঃখ হবে বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু তিতিক্ষা যে বিবেককে খুবই ভালোবাসে তা তার মুখের ভাষাই প্রমাণ।

কিছুক্ষণ পরে গার্গী অস্ফুটকণ্ঠে বলল, খুব মুশকিলের ব্যাপার। পুলিশ ছাড়া কি এত বড়ো, একটা গ্যাংকে ধরা যাবে!

অলীকশেখর মাঞ্জা-দেওয়া সুতোর মতো খরখরে গলায় বললেন, সেই কথাই তো অনেকক্ষণ ধরে বোঝানোর চেষ্টা করছি। কিন্তু তিতি তো অনড়।

তিতিক্ষার চোখে তখন নতুন করে ভরে এসেছে জলবিন্দু, হয়তো গার্গীকে দেখেই উথলে উঠেছে শোক, বলল, তোমরা যা পারো তাই করো। কিন্তু বিবেক আমাকে বলল, পুলিশে খবর দিলেই ওরা মার্ডার করবে ওকে।

গার্গী বিষয়টা বারবার তোলাপাড়া করছিল নিজের ভিতর। নিস্তব্ধ ঘরের ভিতর এখন এক অদ্ভুত টানাপোড়েন। অলীকশেখর তাঁর একমাত্র কন্যার স্বামী

বিবেককে ছাড়ানোর জন্য একটি পয়সাও দেবেন না, আর তিতিক্ষা তার সর্বস্ব দিতে রাজি বিবেকের মুক্তিপণ হিসেবে দিতে। কিন্তু সমস্যা হল তিতিক্ষার কাছে কোনও টাকাই নেই। তাই মুখে মেঘ মেখে বলল, বাবাকে আমি কত করে বলছি সব টাকা শোধ করে দেব ও ফিরে এলে, কিন্তু বাবার জেদ কিছুতেই মুক্তিপণ দেবে না।

অলীকশেখর কিন্তু মেয়ের চোখের জলের কাছে নতিস্বীকারে নারাজ। ক্রমাগত বলে চলেছেন, এটা একটা সিরিয়াস ক্রাইম। পুলিশে খবর না-দিয়ে মুক্তিপণ দেওয়া মানে ক্রিমিনালদের আরও উৎসাহিত করা। ইট'স ব্যাড। ভেরি ব্যাড।

গার্গী ততক্ষণে গুছিয়ে নিচ্ছিল তার মগজে ঘুলিয়ে ওঠা ভাবনাগুলো। অলীকশেখরের যুক্তি যেমন ফেলে দেওয়ার নয়, তেমনই উড়িয়ে দেওয়া যায় না তিতিক্ষার কথাও। অপরাধীরা যে-মুহূর্তে বুঝতে পারবে তাদের মুক্তিপণ দেওয়া হবে না, উপরন্তু খবর দেওয়া হচ্ছে পুলিশে, অমনি মরিয়া হয়ে কিছু একটা করে বসতে পারে যে কোনও মুহূর্তে।

কখনও না-দেখা বিবেক দ্বিবেদীর মুখটা ভাসছিল তার মনের ভিতর। তিতিক্ষার মুখে সমস্ত ঘটনা শুনে সেও নিশ্চিত হতে পারছে না ঘটনাটার কী ভবিষ্যৎ! এখনই অলৌকিক কিছু ঘটাতে না-পারলে বিবেকের ক্ষতি হয়ে যেতে পারে এখনই।

তিন অবয়ব যখন যার-যার মতো করে বিষয়টা নিয়ে ভাবছে মুখে টুঁ শব্দটি না করে, ঠিক সেই সময় ফোন বাজল অলীকশেখরের ল্যান্ডলাইনে। অলীকশেখর ফোন তুলে হ্যালো বলতেই তাঁর মুখের চেহারায় আরও কাঠিন্য। তিনি ওদিকের সংলাপ শুনছেন আর চোখে আগুন ঝরাচ্ছেন নিঃশব্দে। হয়তো এক কি দেড় মিনিট। কিছুক্ষণ পরে ফোন রাখতেই তিতিক্ষা হামড়ে পড়ে, কার ফোন বাবা, ওর?

অলীকশেখরের মুখে কোনও শব্দ নেই।

—কার ফোন, বাবা?

অলীকশেখর হঠাৎ বললেন, কার আবার? কোনও কালপ্রিটের।

—*কী বলল? তিতিক্ষার গলায় আবার আর্তনাদ।*

অলীকশেখরের গলায় আশ্চর্য নিষ্ঠুরতা, বললেন, মিহি গলায় কেউ বলল, 'এখনই ইয়েস বলতে হবে, তিরিশ সেকেন্ড সময় দিলাম। তার মধ্যে ইয়েস না বললে—', বলে এক দুই তিন চার করে গুনল তিরিশ পর্যন্ত। তারপর একটু অপেক্ষা করে ফোনটা রেখে দিল।

৫

অলীকশেখর রিসিভার রেখে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিতিক্ষা শিউরে উঠে বলল, তুমি কিছু না-বলে ফোনটা রেখে দিলে?

অলীকশেখর যেন কিছুই হয়নি এমন মুখভঙ্গি করে বললেন, তা আমি কী করব?

তিতিক্ষার যেন বিশ্বাসই হচ্ছে না তার বাবার এই নির্বিকার উচ্চারণ। বলল, তুমি টাকা না-দিতে চাওয়া মানে ওকে ওরা কী করবে জানো?

অলীকশেখর কিছু না বলে মুখ গুঁজতে চাইলেন খবরের কাগজের পৃষ্ঠায়।

তিতিক্ষা হঠাৎ কান্না-কান্না গলায় বলে উঠল, তুমি ফোনটা রেখে দিতে পারলে, বাবা?

অলীকশেখর বেশ কঠিন গলায় বললেন, তাই বলে এখন চল্লিশ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দেওয়ার কোনও যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি না। টাকার অঙ্কটা মোটেই ফেলনা নয় তা বোঝার মতো বয়স নিশ্চয় তোমার হয়েছে।

তিতিক্ষা তখনও বিশ্বাস করতে পারছে না তার বাবা চল্লিশ লক্ষ টাকার জন্য বিবেককে ঠেলে দিলেন মৃত্যুর মুখে। বলল, কিন্তু টাকাটা তো ও দিয়েই দিত, বাবা! আমাকে বলল পঁয়ষট্টি লক্ষ টাকার চেক পেয়েছে এ ক-দিনে।

অলীকশেখর কিছু না-বলে আবার মুখ গুঁজলেন খবরের কাগজের পৃষ্ঠায়।

গার্গী দম বন্ধ করে শুনছিল বাবা-মেয়ের কথোপকথন। একমাত্র জামাই বিবেক দ্বিবেদীকে অপহরণ করে তার অপহরণকারীরা মোটা টাকা মুক্তিপণ চাইছে, অথচ কন্যার সামনেই বাবা অলীকশেখর খুবই নির্বিকার ভঙ্গিতে রেখে দিচ্ছেন টেলিফোনটি এ-দৃশ্য চোখের সামনে না ঘটলে বিশ্বাস করতে কষ্টই হত গার্গীর। সেই মুহূর্তে অলীকশেখরকে মনে হচ্ছিল ভারি নিষ্ঠুর আর অমানবিক। কোনও বাবাই কি পারে জামাইকে এভাবে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে!

তিতিক্ষা বহুক্ষণ বিমূঢ় হয়ে বসে থেকে হঠাৎ হু হু করে ভেঙে পড়ল কান্নায়। তার গোঙানির মধ্যে কিছু কথাও ভেসে আসছিল হাওয়ায়, কিন্তু তা বোধগম্য হল না গার্গীর।

তিতিক্ষার মা অসুস্থ অবস্থায় বিছানায় শুয়ে, তাঁর সামনে এই ঘটনাটি ঘটলে তিনি আরও একবার সংজ্ঞাহীন হতেন নিশ্চিত। গার্গী অনুভব করতে পারছে বাবা ও মেয়ের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েনটি। অলীকশেখর মেয়েকে খুবই ভালোবাসেন এরকমটাই জানত, কিন্তু মেয়েকে ভালোবাসেন বলে জামাইকেও ভালোবাসবেন তা কোথাও লেখাজোখা থাকে না, অলীকশেখরও হয়তো এই শ্রেণিভুক্ত।

গার্গী তখনও সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না তার এখন কী করা উচিত। বিবেককে উদ্ধার করতেই তো এসেছিল তিতিক্ষার ফোন পেয়ে। কিন্তু তার সামনেই যে-দৃশ্য ঘটে গেল তারপর বিবেকের আর বেঁচে থাকার সম্ভাবনাই নেই বোধহয়। অলীকশেখর পছন্দ করেননি তিতিক্ষার জীবনসঙ্গী নির্বাচনের পর্বটি, কিন্তু যখন তার বিয়েতে সম্মতি দিয়েছেনই এখন তার প্রতি এতটা নিষ্ঠুর কি না-হলেই চলছিল না!

কিন্তু এ-কথাও তো ভাবতে হবে, তিনি জামাইয়ের ফ্যাক্টরি তৈরির জন্য বেশ কয়েক লক্ষ ঢেলেছিলেন, সেই টাকা বিবেক নষ্ট করেছে, না এক্সপোর্ট করতে গিয়ে ফেঁসে গেছে তা এখনও পুরোপুরি বোধগম্য নয়। তবু টাকার অঙ্কটা সত্যিই তো কম নয়।

গার্গী অবশ্য জানে না শুধু কোটিপতি নয়, কোটিকোটিপতি অলীকশেখরের কাছে চল্লিশ লক্ষ টাকার মূল্য কতটা! তিতিক্ষা তার বাবার তহবিলের খবর রাখে বলেই বাবার এই অনীহা দেখে স্তম্ভিত, মর্মাহতও। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, গার্গীদি, বিবেককে বাঁচাতেই হবে যে করেই হোক। আমি বেরোচ্ছি বিবেকের খোঁজে।

তিতিক্ষা এত দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে বেরিয়ে গেল অলীকশেখরের সামনে থেকে যে, দৃশ্যটি বেশ হকচকিয়ে দিল গার্গীকে। সেও উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি দেখছি তিতিক্ষা কোথায় যাচ্ছে।

তিতিক্ষা অবশ্য তখনই বেরোল না বিবেকের খোঁজে। তার পিছু পিছু গার্গী গিয়ে ঢুকল পাশেই তিতিক্ষার বাড়িতে। গার্গীকে আসতে দেখে সেরকমই কান্না-কান্না গলায় বলল, গার্গীদি, ওকে বোধহয় এতক্ষণে মেরে ফেলেছে!

গার্গী তিতিক্ষার ঝড়-খাওয়া চেহারাটা দেখছিল মনোযোগ দিয়ে, বলল, তা হয়তো নাও হতে পারে। যারা অপহরণ করেছে তারা হয়তো এখনই শিকার হাতছাড়া করতে চাইবে না। হয়তো আরও কয়েকবার চাপ দিয়ে আদায় করে নিতে চাইবে মুক্তিপণ।

গার্গীর কথায় একটু আশার আলো দেখতে পেয়ে তিতিক্ষা থমকে দাঁড়ায়, গার্গীদি, তুমি বলছ বিবেক বেঁচে আছে?

গার্গী জানে না বিবেকের পরিণতি, কিন্তু তিতিক্ষাকে সান্ত্বনা দিতে বলল, আমার তো তাই মনে হয়। ওরা এখনই কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে চাইবে না। একের পর এক চাপ দিতে থাকবে যাতে তাদের কাছে মুক্তিপণ দিতে বাধ্য হন তোমার বাবা। হয়তো আবারও ফোন করবে তোমার বাবাকে। ফোন নম্বর যখন জেনেই গেছে—

তিতিক্ষা আশ্বস্ত হয় কিছুটা, বলল, গার্গীদি, তুমি একটু বোঝাও না বাবাকে। তুমি বললে বাবা হয়তো রাজি হয়ে যাবেন টাকাটা দিতে।

গার্গী মুশকিলে পড়ে। অলীকশেখরকে সে যতটুকু বুঝেছে তাঁর কাছে বিবেকের জীবনের চেয়ে টাকার মূল্য অনেক বেশি। গার্গীর অনুরোধ তিনি রাখবেন কি না বোঝা খুবই দুরূহ। যদি অনুরোধ না রাখেন বা গার্গীর মুখের উপর কিছু বলে দেন গার্গীর পক্ষে তা হবে অস্বস্তিকর। তা ছাড়া সে পুরো ব্যাপারটা ভালো করে জানেও না। তিতিক্ষা হঠাৎ গার্গীর হাতদুটো ধরে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে, গার্গীদি, বিবেককে আমি ভীষণ ভালোবাসি। ওর যদি কিছু হয়ে যায় আমি পাগল হয়ে যাব।

খুবই ঝামেলার মধ্যে পড়ে গার্গী। একদিকে তিতিক্ষার অনুরোধ, বিবেকের মুক্তিপণ চেয়ে ফোন, ওদিকে অলীকবাবুর অনড় মনোভাব, সব মিলিয়ে গার্গী দোটানায়। কিন্তু তিতিক্ষার মুখের উপর না-বলবে তাও সম্ভব নয় এই মুহূর্তে। তিতিক্ষাকে বলল, ঠিক আছে, বলে দেখব। কিন্তু আমার মনে হয় তার আগে পুলিশকে খবরটা জানানো উচিত।

—পুলিশ! তিতিক্ষা ছিটকে উঠতে চাইল কী এক অজানা আশঙ্কায়। বলল, গার্গীদি, পুলিশকে কিছুতেই এখন বলা যাবে না। আগে মুক্তিপণ দিয়ে ওকে ছাড়িয়ে আনি। তারপর—

তাদের কথার মধে হঠাৎই কলিং বেলের মিষ্টিমধুর গুঞ্জন। তিতিক্ষা শিল্পী মানুষ। তার রুচিই অন্য রকম। এমন চমৎকার সুরেলা কলিং বেল নির্বাচন করেছে তার বাড়িতে যে, কিছুক্ষণ শুনলেই মনে হয় আরও কিছুক্ষণ শুনি।

তার একটু পরেই দরজার পাল্লা ঠেলে এক সুন্দরী তরুণীর আবির্ভাব।

তিতিক্ষার অভিব্যক্তি দেখে মনে হল তরুণী তার অপরিচিত। বললও সেরকম কণ্ঠস্বরে, বলুন কাকে চাই?

তরুণী খুবই সপ্রতিভ, তার পরনে ঝাপসা নীলরঙা টাইট জিনসের প্যান্টের উপর হলুদ চাপা টপ। তিতিক্ষার ইঙ্গিতে সোফায় বসে বলল, আপনিই তো তিতিক্ষা দ্বিবেদী। দি গ্রেট আর্টিস্ট?

তিতিক্ষার চোখে বিস্ময়ের আলোছায়া, বলল, গ্রেট কি না জানি না। কিন্তু আমি ছবি আঁকি।

—হ্যাঁ। তা তো এখন কলকাতার সবাই জানে। আপনার সোলো একজিবিশন হওয়ার পর সারা কলকাতায় আপনি এখন বিখ্যাত। প্রত্যেক কাগজে আপনার ছবির এত প্রশংসা বেরিয়েছে যে, বলা যায় আপনি এখন টক অফ দি টাউন।

তিতিক্ষার ফর্সা মুখে সহসা লাল আপেলের ছোঁয়া। তার সম্পর্কে এত প্রশংসাবাণী শুনে পুলকিত, উল্লাসে টলোমলো। তবু তার পুলক চেপে বলল, আপনি কোথা থেকে এসেছেন?

—আপনি নিশ্চয় পেইন্টিং ট্রেজারের নাম শুনেছেন?

—পেইন্টিং ট্রেজার? মানে আপনি শ্রাবণকুমারের কথা বলছেন?

—একজ্যাক্টলি। শ্রাবণকুমারই আমাকে পাঠালেন আপনার কাছে।

—হ্যাঁ। তাঁর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।

—শ্রাবণকুমার আমার বস। তিনিই বললেন আপনার সঙ্গে ছবি কেনার কথাটা পাকা করে যেতে।

তিতিক্ষার মুখে আবার একঝলক আলো। সে কিছু বলার আগেই গার্গী বলল, তিতিক্ষা, সায়নের কাছ থেকে একটা জরুরি মেসেজ এসেছে মোবাইলে। তুমি ততক্ষণে তোমার জরুরি কথাগুলো সেরে ফেলো। আমি বারান্দায় গিয়ে সায়নের সঙ্গে কয়েকটা কথা বলে আসি। বুঝতেই পারছ অফিসের মিটিং ফেলে আমি চলে এসেছি তোমার ডাকে।

তিতিক্ষা তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চলুন, গার্গীদি, আপনাকে পাশের ঘরে বসতে দি। আমার বেশিক্ষণ সময় লাগবে না। তারপর আমি আপনি দুজনে বাবাকে গিয়ে আর একবার বলব কথাটা।

গার্গীকে পাশের ঘরে বসিয়ে দিয়ে তিতিক্ষা চলে গেল তার আর্ট ডিলারের প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলতে। দরজা ভেজিয়ে দিয়ে গার্গী তখনই মোবাইলে ধরল সায়নকে।

সায়ন সব শুনে বলল, কী অদ্ভুত ঘটনা। পুলিশে খবর দিতে দিচ্ছে না কেন বলো তো?

গার্গী বলল, আসলে কী জানো, কিডন্যাপাররা যে-মুহূর্তে জেনে যাবে পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে বা পুলিশ তাদের পিছু নিয়েছে, তারা কিন্তু বিবেককে রেহাই দেবে না।

—কিন্তু পুলিশ ছাড়া উপায়ও তো নেই কিছু। তুমি তো জানো না কিডন্যাপাররা তাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে। জানা সম্ভবও নয়। পুলিশে খবর দিলে তারা কাছাকাছি সমস্ত থানায় রেড অ্যালার্ট পাঠিয়ে দেবে। নিশ্চয় বড়ো গ্যাং কাজ করছে এখানে। শাঁসালো পার্টি শিকার হিসেবে পেয়েছে তারা নিশ্চয় জেনে গেছে শ্বশুর মিলিওনেয়ার। তাঁর একমাত্র কন্যার হাজব্যান্ড। চাপ দিলেই বেরিয়ে আসবে টাকাটা।

গার্গী বারবার জানায় তিতিক্ষা আর তিতিক্ষার মা কেউই চাইছে না পুলিশে জানাতে।

সায়ন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, ভেরি ক্রিটিকাল প্রব্লেম।

—আসলে কি হয়েছে, কলকাতায় এখন বিগ হাউসের কর্ণধারদের অনেকেই এখন গাড়িতে পার্সোনাল সিকিউরিটি নিয়ে বেরোয়। কয়েকজন বিজনেসম্যান কিডন্যাপড হওয়ার পর বেশ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে সবাই। একটা মজার কথা শুনবে? আমার কয়েকজন চেনা ব্যবসায়ী ভয়ে মর্নিং ওয়াক করা ছেড়ে দিয়েছেন। আগে ভোর-ভোর রাস্তায় বেরোতেন স্বাস্থ্য উদ্ধার করতে, এখন বাড়িতে জিম বানিয়ে সেখানেই স্বাস্থ্যচর্চা করেন। কেউ ছাদে জগিং করেন।

—তা হলে কী করবে?

—দেখি কী করা যায়! শেষপর্যন্ত পুলিশেরই শরণাপন্ন হতে হবে মনে হচ্ছে। তিতিক্ষাকে এখন কিছু না-জানানোই ভালো। তার আগে দেখি শ্রাবণকুমার কী বার্তা পাঠিয়েছেন তিতিক্ষাকে।

সায়নের সঙ্গে আলোচনা সেরে গার্গী মোবাইল অফ করে পরক্ষণে ধরল পুলিশ হেডকোয়ার্টারের নির্দিষ্ট চেম্বারে, হ্যালো, আমি কি মি. পুরকায়স্থর সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?

মিষ্টি গলার অপারেটার গার্গীর পরিচয় জেনে নিয়ে পরক্ষণে ধরিয়ে দিল অরিজিৎ পুরকায়স্থকে, ইয়েস ম্যাডাম, বলুন আপনার জন্য কী করতে পারি?

গার্গী খুব দ্রুত বিষয়টি ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি কমিশনার অরিজিৎ পুরকায়স্থর কর্ণগোচর করে বলল, আপনি একটু দেখুন মি. পুরকায়স্থ, আপনার বাহিনীকে কাজে লাগিয়ে কিছু জানতে পারেন কি না কে বা কারা এর পিছনে আছে, বিবেক দ্বিবেদীকে উদ্ধার করা যায় কি না। আমি বিকেলের দিকে আপনাকে ফোন করে জেনে নেব।

সুইচ অফ করার একটু পরেই তিতিক্ষা দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল অপেক্ষাকৃত আহ্লাদিত মুখে, গার্গীদি, একটা গুড নিউজ আছে।

হয়তো বিবেকের খবর পেয়েই তিতিক্ষার উল্লাস। গার্গীর ভিতরও কিছুক্ষণ ঝরনার কুলকুল ধ্বনি।

—গার্গীদি, শ্রাবণকুমার এক ফ্যান্টাস্টিক প্রোপোজাল পাঠিয়েছে।

গার্গী কিছুটা হতাশ, তবু তার উৎকণ্ঠা চেপে জিজ্ঞাসা করে, কী প্রোপোজাল?

—আমার একজিবিশনের সমস্ত ছবি কিনে নিতে চায় শ্রাবণকুমার। তার নাকি একটা বিশাল হোটেল তৈরি হচ্ছে মরিশাসে। হোটেলের সমস্ত দেওয়াল জুড়ে আমার ছবি টাঙিয়ে রাখবে।

—বাহ্, দারুণ প্রস্তাব।

-হ্যাঁ। এই দেখুন শ্রাবণকুমারের চিঠি। তাতে লিখেছে আমার ছবিতে যে একটা মিস্টিক ব্যাপার আছে, হোটেলের ট্যুরিস্ট টানতে তা নাকি খুবই সাহায্য করবে।

গার্গী সায় দেয়, একজন বড়ো বিজনেসম্যান যখন ভেবেছেন তখন নিশ্চয় তার পিছনে যুক্তি আছে।

—হ্যাঁ। তার উপর প্রতি ছবিতে একটা চাপা সেক্স আছে যা নাকি পর্যটকদের আকৃষ্ট করবেই।

—বাহ্, ভালো খবর।

—আর এতগুলো ছবির জন্য শ্রাবণকুমার যা দাম দেবে শুনে আমি তাজ্জব। কত তুমি ভাবতে পারো?

গার্গী ঠিক অনুমান করতে পারে না একজন আর্ট ডিলার তিতিক্ষার ছবির জন্য কত দাম দিতে পারে! ঘাড় ঝাঁকাল, আমার ঠিক আইডিয়া নেই।

তিতিক্ষা মিটিমিটি হাসে, ফর্টি ফাইভ লাখ্‌স।

গার্গী বিস্মিত হয় আবার হয়ও না। আজকাল ছবির দাম যে বেশ চড়া তা সে জানে। কোনও কোনও শিল্পীর ছবির দাম নাকি লাখ লাখ টাকা। এ শহরে এমন শিল্পীও আছেন যাঁকে এক কি দেড় বছর আগে থেকে বায়না দিলে তবেই ছবি পাওয়া যায় এরকমও শুনেছে এর-ওর কাছে। তিতিক্ষা নবীন শিল্পী। তার ছবির দাম এত হতে পারে তা তার ধারণায় ছিল না। উচ্ছ্বাস দেখিয়ে বলল, দারুণ খবর। তোমার কাছে খুবই ভালো সংবাদ এই মুহূর্তে।

—আর এই দেখুন, শ্রাবণকুমার একসেট রুমাল পাঠিয়েছে আমার জন্য।

—রুমাল কেন?

তিতিক্ষার হাতে একটা সবুজরঙের বাক্স আছে তা খেয়াল করেও এতক্ষণ তেমন গুরুত্ব দেয়নি গার্গী। তিতিক্ষা বাক্সটি খুলতেই তার ভিতর কয়েকটি রুমালের উপস্থিতি। রুমালগুলো বার করে মেলে ধরল গার্গীর চোখের সামনে। বলল, খুব অদ্ভুত রঙের রুমাল তাই না?

—হ্যাঁ। অদ্ভুতই বটে।

—অচেনা বলল কফিন রঙের রুমাল।

--অচেনা আবার কে? কারও নাম নাকি?

—হ্যাঁ। ওই যে মেয়েটা এসেছিল ওর নাম অচেনা।

—মেয়েটার নামটা তো ভারি অদ্ভুত। তারও চেয়ে অদ্ভুত লাগছে কফিন রঙের রুমাল শুনে। এ রকম কোনও রঙের নাম তো শুনিইনি।

—আমিও শুনিনি। তুমিও তা হলে শোনোনি, গার্গীদি?

—শবদেহ বয়ে নিয়ে যায় যে-কফিনে, সেই কফিনের কথা বলতে চাইল মেয়েটি?

—হ্যাঁ। তাই তো বলল। তুমি কফিন দেখেছ, গার্গীদি?

—ইংরেজি সিনেমায় দু-একবার কফিন দেখেছি। কিন্তু তার রং কি এরকম?

তিতিক্ষা ঠোঁট উল্টে বলল, এরকম কি না কে জানে! কিন্তু রুমালগুলো ভারি অদ্ভুত দেখতে কিন্তু।

গার্গী সায় দেয়, তোমার ছবির মতোই মিস্টেরিয়াস।

শ্রাবণকুমারের পি এ এসে তিতিক্ষার সব ছবি কিনে নিতে চায় সংবাদটি শুনে এতক্ষণ মশগুল হয়ে ছিল তিতিক্ষা। এখন আবার তার মনে পড়ল বিবেকের কথা। হঠাৎ বলল, গার্গীদি, তুমি বাবাকে গিয়ে এবার বলো না বাবা যদি টাকাটা দিতে রাজি হয়। বাবার টাকা আমি যে-করেই হোক দিয়ে দেব। অন্তত আমার ছবি বিক্রির টাকা যখন পাব তখনই দিতে পারব। বাবার টাকা মারা যাবে না।

গার্গীর খুব খারাপ লাগছিল তিতিক্ষার মুখ থেকে এ ধরনের কথা শুনতে। তিতিক্ষার বলতেও হয়তো খারাপ লাগছে, কিন্তু এই মুহূর্তে আসন্ন বিপদের কথা ভেবে তার মাথাটা ঠিকঠাক কাজও করছে না হয়তো।

গার্গী বাধ্য হয়ে বলল, চলো তা হলে। তোমার বাবার সঙ্গে আর একবার আলোচনা করে আসি। আমার ধারণা কিডন্যাপাররা নিশ্চয় আরও একবার ফোন করে জানতে চাইবে মুক্তিপণ সত্যিই পাওয়া যাবে কি না।

দুজনে আবার এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে পৌঁছে গেল পাশের বাড়িতে। গার্গীর খুবই অস্বস্তি লাগছিল এরকম একটি ঝামেলাপূর্ণ বিষয়ে তাকে নাক গলাতে হওয়ায়। অলীকশেখর তাঁর জামাইকে বাঁচাবেন কি বাঁচাবেন না তা তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়। গার্গীর পক্ষে তাঁকে অনুরোধ করাটা তার এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে কি না তা ভাবছিল অন্যমন হয়ে। অলীকশেখরের সামনে পৌঁছে সেই দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব তাকে জেরবার করতে থাকে।

তিতিক্ষা অলীকশেখরের সামনে পৌঁছোতেই তিনি কঠিন গলায় বললেন, সেই মিহি ভয়েসের লোকটা আবার ফোন করেছিল।

তিতিক্ষার সঙ্গে গার্গীর বুকের ভিতরেও জলপ্রপাতের লাফিয়ে পড়ার শব্দ।

—ওরা কী বলল, বাবা?

—সেই একই গল্প। এখনই চল্লিশ লাখ টাকা নিয়ে চলে আসুন।

—তারপর? তিতিক্ষার উৎকণ্ঠা আবার চরমে।

—কিন্তু আমি ফার্ম। মুক্তিপণ আমি কিছুতেই দেব না। তাতে ওদের লোভ বেড়ে যাবে দিন দিন।

সেই মুহূর্তে গার্গীর মোবাইলে রিংটোনের সুরেলা শব্দ। খুব নরম আর থেমে-থেমে রিংটোন। গার্গী কানে দিতেই তার মুখ ফ্যাকাসে। ওপাশে অরিজিৎ পুরকায়স্থর স্বর, ম্যাডাম, ই এম বাইপাসের ধারে একটা ডেডবডির সন্ধান পাওয়া গেছে একটু আগেই। আপনি ওদের বলুন তো ডেডবডিটা বিবেক দ্বিবেদীর কি না শনাক্ত করতে।

৬

উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার অরিজিৎ পুরকায়স্থর কাছ থেকে এরকম ভয়ংকর একটি টেলিফোন পেয়ে গার্গীর সমস্ত অনুভূতি কিছুক্ষণের জন্য ঘেঁটেঘুঁটে একশা। তিতিক্ষার দিকে তাকিয়ে নেয় একনজর, তার গলা শুকিয়ে যায় হঠাৎ। সে এখনও নিশ্চিত নয় এই ডেডবডিটা বিবেকের কি না। কিন্তু তার বুকের গভীরে কোথাও টপটপ করে রক্তপাত।

তার তাকানোর রকম দেখেই তিতিক্ষা বলে ওঠে, কার টেলিফোন, গার্গীদি?

গার্গী কী বলবে তা সেই মুহূর্তে তার মাথায় এল না, এতক্ষণ তিতিক্ষা তার বাবার সঙ্গে অভিমান আর কান্নায় ভেজানো লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল যদি তার বাবা মুক্তিপণ দিতে রাজি হন তা হলেই মুক্ত করা সম্ভব বিবেককে। কিন্তু তার বাবা অতিনিষ্ঠুরভাবে এখনও তাঁর টাকা-না-দেওয়ার সিদ্ধান্তে অনড়। এখন তিতিক্ষার সামনে টেলিফোন-সংবাদটি খোলসা করে বললেই নিবে যাবে তার লড়াই করার ক্ষমতা। একটু ভেবে নিয়ে বলল, পুলিশ হেডকোয়ার্টার থেকে।

—কী বলল ওরা?

গার্গী তেমন গুরুত্ব না দিয়ে বলল, ই এম বাইপাসে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে, বলল একবার দেখে যান।

—দুর্ঘটনা! তিতিক্ষা ছটফট করে ওঠে।

—পুলিশের কাণ্ড তো। এয়ারপোর্টের কাছে একটা ঘটনা ঘটেছে শুনেই ওরা একটা জিপ পাঠিয়েছিল পেট্রল দেওয়ার জন্য। তাতেই খবরটা এসেছে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে। কিন্তু বলছে যখন দেখেই আসি একবার। গার্গী দ্রুতগতিতে সিঁড়ির দিকে এগোতে এগোতে বলল, তিতিক্ষা, তুমি কি যাবে আমার সঙ্গে?

যেন তিতিক্ষার না-গেলেও চলে। আসলে গার্গী ইচ্ছে করেই তিতিক্ষার উপস্থিতি গৌণ করে দেখাতে চাইল যাতে তিতিক্ষা অযথা না আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। অথচ তিতিক্ষার যাওয়াটাই এখন সবচেয়ে জরুরি। যেহেতু গার্গী বিবেককে কখনও দেখেনি, তিতিক্ষাকে এখন যা-হোক করেই নিয়ে যেতে হবে ঘটনাস্থলে।

গার্গী এও অনুমান করছে হয়তো মৃতদেহটা অন্য কারও, বিবেকের নিখোঁজ হওয়া ও ঠিক একই সময়ে ই এম বাইপাসে দুর্ঘটনাটা ঘটেছে বলেই সবার মনে হচ্ছে হয়তো বিবেকই--

গার্গীর হঠাৎ 'তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে' শুনেই তিতিক্ষার মুখচোখ ফ্যাকাসে। গার্গীর অভিব্যক্তি দেখে কী যেন খুঁজল তার শরীরী ভাষায়, কী যেন আশঙ্কা করে ফ্যাসফেসে গলায় বলল, তবে কি--

--না না, তেমন কিছু নয়। শুধুমাত্র একবার দেখে আসা। তা ছাড়া এখন ঘরে বসে শুধু টেলিফোনের উপর নির্ভর করে নিশ্চেষ্ট থাকাটাও তো যুক্তিযুক্ত নয়, ই এম বাইপাস থেকে ফেরার সময় একবার পুলিশ হেডকোয়ার্টার থেকে ঘুরেও আসব দুজনে।

কিন্তু টেলিফোনের আকস্মিকতায় কী যেন আশঙ্কা করে তিতিক্ষা আর দাঁড়াতেই পারছে না, তার পায়ে কেউ যেন চাপিয়ে দিয়েছে একশো টনের পাথর। তার চোখ স্থির হয়ে গেছে কী এক অজানা ত্রাসে। গার্গী কিছুটা এগিয়ে আবার ফিরে এসে তিতিক্ষার হাত ধরে বলল, চলে এসো।

তিতিক্ষাকে প্রায় টেনে হিঁচড়ে গাড়িতে তুলল গার্গী। কিন্তু কাকে নিয়ে যাচ্ছে গার্গী! তিতিক্ষার শরীরটা যেন পাষাণপ্রতিম হয়ে গেছে হঠাৎই। তার গলায় কোনও স্বর নেই। অবশ শরীরে কোনও ক্রমে গাড়িতে উঠে বসে পড়ে গার্গীর পাশে। বসেই মুখ ঢাকল দু-হাতে। গার্গী বুঝতে পারছিল কান্না চেপে রাখার চেষ্টা করছে তিতিক্ষা।

একটু পরেই তিতিক্ষার শরীরটাকে ফুলে ফুলে উঠতে দেখে গার্গী। খুব কষ্ট হচ্ছিল তার।

তিতিক্ষা বসতেই গার্গী তার ড্রাইভারের উদ্দেশে চাপা গলায় বলল, চলো রতন, ই এম বাইপাসে।

ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাস বেশ লম্বা রাস্তা, তার ঠিক কোথায় লাশ পড়ে আছে ঘটনার আকস্মিকতায় তা জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছে গার্গী। কসবা পেরিয়ে বাইপাসে উঠে বাঁয়ে মোড় নিয়ে দুরন্তগতিতে গাড়ি ছুটল এয়ারপোর্টের দিকে। এর মধ্যে কোথাও না কোথায় ভিড় দেখতে পেলেই--

একটু পরেই গার্গী শোনে তিতিক্ষার কান্না-ভেজানো গলা, জানতাম কিছু একটা হবে। বাবা কিছুতেই-

গার্গী সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে, এখনই সবটা ভাবছ কেন? আগে স্পটে যাই।

তিতিক্ষা অসহিষ্ণু হয়ে ঘাড় নাড়ে, মুখ দিয়ে প্রকাশ করে এক অস্ফুট গোঙানি।

গাড়িটা তখন গতি বাড়িয়ে যত দ্রুত সম্ভব ছুঁতে চাইছে গন্তব্য যদিও গন্তব্যটি কোথায় তা কারও জানা নেই এখনও। তিতিক্ষা কখনও মুখ ঢেকে বসে, কখনও মুখ তুলে কী যেন খুঁজছে রাস্তার ধারে।

পার্ক সার্কাস কানেক্টর পেরিয়ে হায়াথ ছাড়িয়ে কিছুটা এগোতেই গার্গী যা অনুমান করেছিল তাই। দূর থেকে পুলিশ আর পুলিশের গাড়ি দেখে তিতিক্ষাই চেঁচিয়ে উঠল, ওই তো। ওই তো।

সামনে অপেক্ষমান পুলিশের দু-দুটি গাড়ি। একটি লালরঙের জিপ, আর একটি জাল ঘেরা কালো দেড়টন। প্রায় দশ বারোজন পুলিশ মোতায়েন জায়গাটা ঘিরে।

পুলিশের ভিড় দেখে একটানা ধক ধক করতে থাকে গার্গীর বুকের ভিতরটা। বলল, তিতিক্ষা, তুমি একটু বোসো। আমি আগে দেখে আসি ব্যাপারটা।

তিতিক্ষা মুখ ঢেকে বসে আছে তখন থেকে। কখনও চোখ তুললে বোঝা যাচ্ছে তার ভিতরে যেন বাস করছে একটা পাথর।

কিছুটা গিয়েই গার্গী দেখতে পায় একটা লাল টকটকে রঙের মারুতি। পুলিশের গাড়ি নয়, সম্ভবত দুর্ঘটনায় জড়িয়ে পড়া গাড়ি, এখন পড়ে আছে অভিভাবকহীন, তার ভিতরে কী আশ্চর্য ড্রাইভার নেই। কোনও ভাঙচুরের চিহ্নও নেই গাড়িতে। পুলিশ ঘিরে রেখেছে জায়গাটা, তাদের পিছনে অজস্র মানুষ। বলা যায় ভিড়ে ভিড়াক্কার। অনেকেরই নাকে রুমাল বা হাত চাপা দেওয়া। মানুষের ভিড় ছাপিয়ে একটা বিশ্রী পোড়া গন্ধ ঠোক্কর দিল গার্গীর নাকেও। সেও রুমালটা দ্রুত বার করে চাপা দিল নাকে। কীসের গন্ধ বাতাসে? গার্গীর মগজে তখন হাজার চিন্তার ঝড়। বমি উঠে আসছে বিকট গন্ধে।

ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাসের গাড়িস্রোত গিনেস বুকে ছাপার মতো। সেই অসংখ্য গাড়ির কোনও কোনওটা চলতে চলতে থেমে দাঁড়াচ্ছে একটু দূরে গিয়েই, কিন্তু পুলিশের গাড়ি আর পুলিশের ভিড় দেখে নামছে না কোনও আরোহী, দু-দণ্ড দাঁড়িয়ে দূর থেকে বোঝার চেষ্টা করছে ঠিক কী হয়েছে ঘটনাস্থলে। কেউ বুঝছে কেউ বুঝছে না। পরক্ষণে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় হুশ করে বেরিয়ে যাচ্ছে নিজের গন্তব্যে।

গাড়ি থেকে নেমে চারপাশের ভিড় ঠেলে একটু এগোতেই গার্গীর পাও শিকড়। প্রধান রাস্তা থেকে একটু দূরেই খাদের কিনারে পড়ে থাকা লাশ দেখে শিউরে উঠে স্থানু হয়ে গেছে তিতিক্ষা। এরকম বীভৎস হত্যাকাণ্ড সচরাচর দেখা যায় না বোধহয়। মৃতদেহটির কোমর থেকে নীচের অংশ প্রায় অবিকৃত, শুধু ওপর শরীরটা আগুনে ঝলসানো। গার্গী খুঁটিয়ে দেখল মৃতদেহের গলায় একটা চেন, সেটাও পুড়ে কালচে। মাথা সহ দেহটা পুড়িয়ে ঝলসে ফেলে দেওয়া হয়েছে

রাস্তার ধারে। কিন্তু খুব বেশিক্ষণ আগে হত্যা করা হয়েছে তা নয়, কারণ বাতাসে পোড়া মাংসের গন্ধটাও উড়ে বেড়াচ্ছে শরীরে বিবমিষার উদ্রেক করে।

গার্গী বিবেক দ্বিবেদীকে দেখেনি, কিন্তু তার কথা শুনেছে নানাভাবে। গার্গীর যা কিছু পরিচয় তিতিক্ষার সঙ্গে। অথচ এখন সেই বিবেক দ্বিবেদীর অনুসন্ধানেই তার এখানে আসা।

মৃতদেহের সামনে হাজির হতেই এগিয়ে এলেন পুলিশ অফিসারের ইউনিফর্ম পরা একজন সুদর্শন যুবক, নমস্কার জানিয়ে বললেন, আপনিই কি মিসেস গার্গী চৌধুরি?

গার্গী অনুমান করল তার কথা বলে দিয়েছেন পুলিশ হেডকোয়ার্টারের বড়ো কর্তা অরিজিৎ পুরকায়স্থ।

গার্গী ঘাড় নেড়ে 'হ্যাঁ' বলতেই—

—ম্যাডাম, আমি দেবজ্যোতি নাগ রায়। ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের পুলিশ ইনস্পেক্টর। আপনার কথা আমি আগেও শুনেছি। বড়ো সাহেব বলেছেন তদন্তের ব্যাপারে যথাসম্ভব আপনার সাহায্য নিতে।

বলেই গার্গীকে নিয়ে গেল সেই বিকৃত মৃতদেহের সামনে, বলল, আপনি চিনতে পারছেন কার মৃতদেহ?

গার্গী খুবই বিপন্ন বোধ করছিল এই ভয়ংকর দৃশ্যটির সামনে দাঁড়িয়ে। মৃতদেহের পরনে ঘন কালো রঙের দামি প্যান্ট, গায়ের জামাটা পুড়ে কালো হয়ে গেলেও লক্ষ করলে বোঝা যায় তার গায়ে ছিল প্রায়-নতুন একটি হলুদ চেককাটা শার্ট। পায়ে নামী কম্পানির সাদায়-কালোয় মেশানো রঙের ঝকঝকে জুতো। জুতোর নীচের খোপ-কাটা কারুকাজ লক্ষণীয়। সব মিলিয়ে যে-দৃশ্য গার্গীর চোখের সামনে দৃশ্যমান তা এক শৌখিন যুবকের বীভৎস পরিণতি।

শরীরের নীচের অংশ দেখে ভাবাই যায় না শুধু উপরের শরীরটা এরকম ভাবে ঝলসানো।

পুলিশ ইনস্পেক্টর গার্গীকেই বলেছিলেন মৃতদেহটিকে শনাক্ত করতে, কিন্তু গার্গী মাথা নেড়ে বলল, আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। তিতিক্ষাকেই শনাক্ত করতে হবে। তিতিক্ষা গাড়িতে বসে আছে।

—তাই নাকি, ম্যাডাম? তা এতক্ষণ বলেননি কেন? তা হলে ওঁকেই ডাকতে হবে। দাঁড়ান, আমি একজন কনস্টেবল পাঠাচ্ছি ওঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে।

গার্গী শিউরে উঠছিল মৃতদেহ দেখে তিতিক্ষার প্রতিক্রিয়া কী হবে তা ভাবতে গিয়ে। হঠাৎ বলল, কিন্তু এই দৃশ্য দেখলে তিতিক্ষাকে ঠেকিয়ে রাখা মুশকিল হবে কিন্তু।

পুলিশ ইনস্পেক্টর আস্তে আস্তে বললেন, কিন্তু কোনও উপায় তো নেই, ম্যাডাম। কোনও নিকটজনকে মৃতদেহ শনাক্ত করতে হবে এটাই তো বাস্তব।

গার্গী তাকায় গাড়িতে বসে থাকা তিতিক্ষার দিকে। তিতিক্ষা অপেক্ষা করছে একবুক উৎকণ্ঠা নিয়ে, তার মনে এখনও ক্ষীণ আশা হয়তো এই মৃতদেহ বিবেকের নয়। মুখটা পুড়ে ঝলসে এমন বিকৃত হয়ে গেছে যে দেখলে আঁতকে উঠতে হয় ভয়ে।

গার্গী বলল, দাঁড়ান, আমিই ওকে বুঝিয়ে ডেকে নিয়ে আসি।

খুবই রূঢ় বাস্তব, কিন্তু সত্যিই কোনও উপায় নেই তিতিক্ষাকে না-দেখিয়ে। অবশ্য এরপর আরও বহু রূঢ়তার মুখোমুখি হতে হবে তিতিক্ষাকে। অতএব ভিড়ের ভিতর দিয়ে ঠেলে আসার সময় সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লাল মারুতিটা দেখেই চিৎকার করে ওঠে তিতিক্ষা, এই তো আমাদের গাড়িটা।

তিতিক্ষার চোখমুখ কেঁদে-ফুঁপিয়ে এমনিতেই ফোলা-ফোলা, তার উপর এত ভিড়, ভিড়ের মধ্যে তাদের গাড়ি দেখে যা বোঝার বুঝে গেল, কিন্তু তার সামনে অপেক্ষা করেছিল আরও নিষ্ঠুরতম অভিজ্ঞতাটি, বিবেকের মৃতদেহের দিকে চোখ পড়তেই তার গলা দিয়ে বেরিয়ে এল সাংঘাতিক এক চিৎকার, পরক্ষণেই, গার্গীদি, ও গার্গীদি, এ কী দেখলাম। তুমি আমাকে এখানে নিয়ে এলে কেন?

গার্গী তিতিক্ষার হাত শক্ত করে ধরে রেখে বলল, তুমি শিওর, বিবেকই—, মানে ডেডবডির মুখটা চেনা যাচ্ছে না কিন্তু।

গার্গীর গলা কাঁপছিল, এই মুহূর্তে সে-ই তার আবেগ সামলাতে অক্ষম।

তিতিক্ষাও থরথর করে কেঁপে উঠে বলল, ওর গলার সোনার চেনটা তো আমি চিনি। এই তো ক-মাস আগে আমিই দোকানে নিয়ে গিয়ে কিনে দিয়েছিলাম চেনটা। আমি—

হঠাৎ কী হল, তিতিক্ষার শরীরটা নিস্তেজ হয়ে ঢলে পড়ল গার্গীর গায়ের উপর। পুলিশ ইনস্পেক্টর দেবজ্যোতি নাগ রায় তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললেন, ম্যাডাম, মিসেস দ্বিবেদী সেন্সলেস হয়ে পড়েছেন, চলুন, ওঁকে বাড়ি পৌঁছে দিই। অবভিয়াসলি, খুব শক পেয়েছেন।

গার্গী খুবই অস্বস্তিতে, এখন তিতিক্ষাকে নিয়ে কী করবে। তাকে বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছে, এখন তাকে পুলিশ মারফত বাড়িতে ফিরিয়ে দেওয়াটা উচিত হবে না, তাকেই সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে অলীকশেখরের কাছে। একবার ভাবল অলীকশেখরকে ফোন করে আসতে বলে এখানে, কিন্তু অলীকশেখর আসবেন কি না বলা কঠিন। তবে যদি শোনেন তিতিক্ষা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছে তা হলে হয়তো—

কিন্তু তার কাছে এই মুহূর্তে অলীকশেখরের মোবাইল বা টেলিফোন নম্বর নেই। ইচ্ছে করলে ফোন নম্বর জোগাড় করা কঠিন নয়, বিশেষ করে কয়েকজন পুলিশ অফিসার যখন এসে পড়েছেন ইতিমধ্যে। গার্গী ভেবে দেখল এখন এখানে তার কোনও কাজ নেই, সে-ই তো নিয়ে যেতে পারে তিতিক্ষাকে।

সংজ্ঞাহীন তিতিক্ষাকে গাড়িতে বসিয়ে গার্গী কিছুক্ষণ দোলাচলে। হঠাৎই তার সামনে এমন একটি অদ্ভুত সমস্যা উড়ে এসে ধাক্কা দেবে তা কিছু আগেও ছিল ভাবনার বাইরে। কিন্তু তিতিক্ষার বাবা এত সব সাংঘাতিক পরিস্থিতির মধ্যেও, কী আশ্চর্য, কেমন নিরুত্তাপ, অবিচলিত। তিতিক্ষার জীবনে এত বড়ো একটা ঘটনা ঘটতে চলেছে তা তাঁকে নাড়া দিতে পারেনি একটুও। হয়তো বিবেকের উপর তাঁর ছিল এতটাই বীতরাগ ও অসহিষ্ণুতা।

কিন্তু গার্গী এখন তিতিক্ষাকে নিয়ে তাদের বাড়ি যাবে, না হাসপাতালে, না কি শরণাপন্ন হবে কোনও স্থানীয় ডাক্তারের তা ভেবে জেরবার। বিবেকের বিপদ শুনে তিতিক্ষার মা যেভাবে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন, এখন আরও বড়ো বিপদের কথা শুনলে দ্বিগুণ অসুস্থ পড়বেন নিশ্চিত। এখন গার্গীকেই মুখোমুখি হতে হবে নানা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির। তাই রওনা দেওয়ার আগে পুলিশ অফিসার দেবজ্যোতি নাগ রায়কে কিছু কথা বলে যাওয়া প্রয়োজন মনে করে এগিয়ে গেল, মি. নাগ রায়, নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন বিষয়টা খুবই গোলমেলে। কেন বিবেক দ্বিবেদী খুন হল তা খুবই রহস্যময়।

দেবজ্যোতি নাগ রায় ইতস্তত করে বললেন, এঁরা কি আপনার পরিচিতজন?

গার্গী ঘাড় নাড়ে, ধরে নিন সেরকমই। বিবেক উঠতি বিজনেসম্যান। তিতিক্ষার বাবা অলীকশেখর আরও বড়ো বিজনেসম্যান। তাঁর নাম নিশ্চয় আপনারা শুনেছেন সংবাদপত্র মারফত। অনেকগুলো কম্পানির কর্ণধার। তিতিক্ষা একজন নামী পেইন্টার। সব মিলিয়ে এদের প্রোফাইল সমীহ করার মতো।

—ও, দেবজ্যোতি নাগ রায় বুঝলেন ঘটনার গুরুত্ব, বললেন, আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব কেসটা ঠিকঠাক ইনভেস্টিগেশন করতে।

—হাই প্রোফাইল পরিবারের একমাত্র জামাই খুন হয়েছেন। বুঝতেই পারছেন খবরের কাগজও কাভার করতে শুরু করে দেবে কাল থেকে।

—শুনলাম বিবেক দ্বিবেদী দিল্লি গিয়েছিলেন। এয়ারপোর্টে নামার পরেই কিডন্যাপড। তারপরেই খুন। খুব মিস্টেরিয়াস লাগছে না?

—হ্যাঁ। খুবই রহস্যময়। সব কিছু জানতে হবে আস্তে আস্তে। কেন দিল্লি গিয়েছিলেন, ব্যবসা-সংক্রান্ত বিষয়ে কার কার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল। ওখানে

পঁয়ষট্টি লাখ টাকার চেক আদায় করে নিয়ে আসছিলেন এরকমই খবর আছে আমাব কাছে। ডেডবডির শরীর সার্চ করে সেই চেক পাওয়া সম্ভব হয়েছে কি না।

—ম্যাডাম, প্যান্টের পকেটে কোনও চেক নেই তা আমরা দেখে নিয়েছি। শার্টের পকেটে ছিল কি না তা এখনই বোঝা যাবে না। জামাটার প্রায় সবটাই পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।

—প্যান্টের পকেটে মোবাইলটা আছে কি না তা দেখেছেন?

—না, না। কোনও মোবাইল পাওয়া যায়নি।

—আপনারা কি বলতে পারবেন ঠিক কখন বিবেককে মার্ডার কবা হয়েছে?

—সম্ভবত ঘন্টাখানেক আগে। আগুন ধরানো হযেছে তারপর। অর্ধেক শরীর পুড়ে গেলে আগুন নিবিয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে এখানে।

—খুব বীভৎস খুন এটি। অন্তত এরকম মার্ডার আমি দেখিনি এর আগে। একেবারে পরিকল্পিত খুন। কারা এ কাজ করল তা খুঁজে বার করতেই হবে এখন।

—অবশ্যই, ম্যাডাম। ইনভেস্টিগেশনের প্রথমেই কিন্তু মিসেস দ্বিবেদীর সঙ্গে যথেষ্ট কথা বলে নেওয়ার দরকাব। তাঁর বক্তব্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই কেসে। আপনি দেখবেন তিনি যা-যা জানেন সবই যেন স্পষ্ট জানিয়ে দেন ইনভেস্টিগেশন অফিসারকে।

—সে দায়িত্ব আমার, মি নাগ রায়।

—ঠিক আছে, ম্যাডাম। আমাদের সামনে এখন অনেক কাজ। আগে লাশ পোস্ট মর্টেমে পাঠাতে হবে। যা ভিড় বাড়ছে তাতে ঠিকমতো কাজ করাই মুশকিল।

—হ্যাঁ। আর একটা প্রশ্ন আপনাদের মাথায়ও নিশ্চয় ঘুরছে। লাল মারুতির ড্রাইভার কোথায়?

—সেইটেই তো ভাবছি তখন থেকে। সম্ভবত তাকেও মার্ডার করা হয়েছে। এবং আগেই।

—কিন্তু তার লাশ?

—তার লাশ নিশ্চয় গায়েব করে দিয়েছে খুনিরা। কিন্তু বিবেক দ্বিবেদীর লাশ ফেলে গিয়ে খুনিরা এই বার্তাই পৌঁছে দিতে চাইল তাদের দাবি মেনে না-নেওয়াতেই তারা এত বড়ো একটা শাস্তি দিল।

গার্গী বিড়বিড় করে বলল, যাকে তারা শাস্তি দিতে চাইল, সেই অলীকশেখর কিন্তু নির্বিকার।

বিশেষজ্ঞরা ততক্ষণে পৌঁছে গেছেন ঘটনাস্থলে। তাদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন পুলিশ ইনস্পেক্টর। কেউ মৃতদেহের ফটো তুলছেন নানা অ্যাঙ্গেল থেকে। কেউ আবার গাড়ির কাচে নির্দিষ্ট পাউডার ছড়িয়ে তুলছেন হাতের ছবি।

দেবজ্যোতি নাগ রায়ের নির্দেশে একজন সাব-ইনস্পেক্টর এর-ওর জবানবন্দি নিচ্ছেন ডায়েরিতে। সব কাজ শেষ হলে পোস্ট মর্টেমে পাঠানো হবে লাশ। সেদিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে গার্গী বলল, চলো, রতন।

রতনের গাড়ি ততক্ষণে ই এম বাইপাস বরাবর ছুটে চলেছে কসবা কানেক্টরের দিকে। যাওয়ার ফুরসতে কিছু অদ্ভুত ভাবনা মগজে ভিড় করছিল তার। কেন খুন হতে হল বিবেককে? কেন?

৭

ফাল্গুন শব্দটা শুনতে যতই মনোরম লাগুক, ফাল্গুনের দুপুরগুলো বসন্তের শান্ত হাওয়া ছড়ায় তা কিন্তু মোটেই নয়। বেলা দেড়টা বাজে, এ সময় গায়ের চামড়ায় চিড়বিড় করতে থাকে রোদের প্রবল তাত। সেই রোদ্দুরে পুড়তে পুড়তে ই এম বাইপাশ ধরে ফিরছিল গার্গী।

বিবেক দ্বিবেদীকে কেন খুন হতে হল তা নিয়ে তখন থেকে সে ভেবে চলেছে একশো ভাবনা। প্রায়-সংজ্ঞাহীন তিতিক্ষাকে কোলের মধ্যে শুইয়ে যখন ফিরে আসে তাদের বাড়িতে, সামান্য চোখ মেলে তিতিক্ষা বলল, এ তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে এলে, গার্গীদি?

ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাস থেকে নিউ আলিপুর আসতে বেশ জ্যামজটলা পেয়েছিল পার্ক সার্কাস কানেক্টরের কাছে। পার্ক সার্কাস মোড়েও আটকে ছিল বহুক্ষণ। কিন্তু একবার ফ্লাই ওভারে উঠতে পারলে গাড়ি ছোটে মিশাইলের মতো। তবু সব মিলিয়ে প্রায় পঁয়ত্রিশ মিনিট লেগে গেল ওটুকু পথ আসতে। তিতিক্ষা চোখ মেলছে না বলে একবার মনে হচ্ছিল কোনও হাসপাতাল বা নার্সিং হোমে ঢুকে পড়বে কি না গাড়ি নিয়ে। তিতিক্ষাকে এতই সুন্দর দেখতে যে, গার্গী মেয়ে হয়েও তার দিকে বারবার তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে করছিল। তিতিক্ষা এখনও সংজ্ঞাহীন, কী করবে তাকে নিয়ে ভেবে ভীষণ টেনশন হচ্ছে গার্গীর। অবশ্য একটু পরেই, ফ্লাই ওভারে ওঠার মুহূর্তে হঠাৎ বড়ো করে একটা শ্বাস ফেলতে স্বস্তির ছাপ গার্গীর মুখেও। এখন তিতিক্ষার গলায় কথা ফুটতে আরও স্বস্তি।

তিতিক্ষা এতক্ষণে বাস্তবে ফিরে এসেছে কিছুটা। হঠাৎ হাউমাউ করে কেঁদে বলল, গার্গীদি, আমার সর্বনাশ হয়ে গেল।

কান্নাভেজা তিতিক্ষাকে ধরে-ধরে উপরের তলায় নিয়ে গেল কোনও ক্রমে। নিজের বাড়িতেই আসতে চাইল, বাবা-মায়ের কাছে নয়। অলীকশেখরের নাম শুনলেই তার মুখ বেঁকে যাচ্ছে ঘৃণায়। কিন্তু নিজের বাড়িতে লোকজন বলতে বেশি নেই। কাজের লোকটির নাম ঝিমলি। সে-ই গার্গীর হাত থেকে তিতিক্ষাকে নিয়ে

গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে কিছু পরিচর্যা করে, তারপর বাইরের ঘরে এসে জিজ্ঞাসা করে, বউদিমিণি কি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন?

রোদ্দুরে তেতেপুড়ে, ঝঞ্ঝাটের পর ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে পড়ে গার্গী তখন খুবই ক্লান্ত, নিঃশেষিত। একটা সোফায় বসে এলিয়ে দিয়েছে শরীর। সেই কখন থেকে একটা ঝড় চলছে তার উপর দিয়ে। ঘাড় নেড়ে বলল, ডাক্তারকে একবার খবর দিলে হত।

—ও কিছু হবে না কো, দিদি। বেশ রাগারাগি করলে বউদিমণির এ'রম হয়ে যায়।

—তাই নাকি? প্রায়ই এরকম হয় নাকি?

—প্রায়ই হয় তা নয়। দাদাবাবুর সঙ্গে ঝগড়া করলে কী'রম অজ্ঞান-অজ্ঞান হয়ে যায়।

—প্রায়ই ঝগড়া হয় নাকি? গার্গী তার ইন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ করে।

—প্রায়ই হয় তা নয়। দাদাবাবু তো শান্তশিষ্ট মানুষ। কিন্তু বউদিমণি একটু রাগী। সামান্য কথা নিয়ে দুজনের মধ্যে প্রায়ই গোলমাল।

হঠাৎ তিতিক্ষার গলা শুনে কাজের মেয়ে ঝিমলি ছুটে ভিতরে যায় তার বউদিমণিকে সামলাতে। কিছুক্ষণ পরে তিতিক্ষা নিজেই উঠে এল বাইরের ঘরে। তার মুখের দিকে তাকাতেই পারছে না গার্গী। বলল, এখন কি একটু সুস্থ বোধ করছ, তিতিক্ষা?

তিতিক্ষাকে কেমন পাথরের মতো শক্ত আর অভিব্যক্তিহীন দেখাচ্ছে, বলল, গার্গীদি, আমার জীবনটা শেষ হয়ে গেল।

গার্গী বুঝে পায় না এরকম শোকের মুহূর্তে ঠিক কী বলে সান্ত্বনা দেবে সদ্য স্বামীহারা যুবতীটিকে। কিছুক্ষণ দুজনের মধ্যে বিরাজ করে একসমুদ্র নীরবতা। হঠাৎ বাইরে কলিং বেল বেজে উঠতে গার্গী ব্যস্ত হয়ে বলল, তোমার বাবাকে মোবাইলে খবর দিয়েছিলাম তুমি সামান্য অসুস্থ হয়ে পড়েছ বলে, বোধহয় তিনিই—

ঝিমলি ছুটে গিয়ে নামল সিঁড়ি বেয়ে, নীচে কার সঙ্গে কী যেন কথা বলে ফিরে এল একটু পরেই, তার হাতে বেশ বড়ো আকারের একটি সুদৃশ্য খাম, সেটি তিতিক্ষার হাতে দিতেই তিতিক্ষা কিছুক্ষণ দেখল খামটি, খামের উপর লাল প্যাস্টেল রঙে লেখা তিতিক্ষা দ্বিবেদীর নাম। বেশ কায়দা করে লেখা নামটি। এরকম কার্ড যে খুব বেশি-বেশি আসে তা নয় তাই তিতিক্ষার ভুরুতে জমে উঠল ঘন ভাঁজ। দেরি না করে খামটি খুলে ফেলল অনভ্যস্ত হাতে। তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটি রঙিন কার্ড। খামের সঙ্গে মানানসই আকারের কার্ডটি।

সাধারণত বড়ো ঘরের বিয়েতে আজকাল এ ধরনের বড়ো আকারের কার্ড পাঠানো হয় বিয়ের আভিজাত্য ও গ্র্যাঞ্জার বোঝাতে। কার্ডটা রঙিন, তার উপরে খুব আলঙ্কারিক হস্তলিপিতে ইংরেজিতে লেখা : বিশ্বাসঘাতকের জন্য এটাই সেরা উপহার।

কার্ডের লেখাটি পড়ে তিতিক্ষার মতো গার্গীও বুঝে উঠতে পারল না লেখাটির রহস্য। বিশ্বাসঘাতক বলতে বিবেক দ্বিবেদীকেই নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে তা নিশ্চিত। হঠাৎ সুদৃশ্য কার্ডে এরকম লিখে পাঠিয়ে এ হেন নিষ্ঠুর রসিকতা কে করেছে তা ভেবে বিস্মিত হল গাগী। ঝিমলিকে জিজ্ঞাসা করতেই সে জানাল কোনও ক্যুরিয়ার সংস্থার লোক এসে দিয়ে গেছে কার্ডটি।

গার্গী তৎক্ষণাৎ দোতলা বারান্দায় গিয়ে দেখার চেষ্টা করল ক্যুরিয়ারের লোকটিকে। কাউকে না-দেখে ফিরে এসে তিতিক্ষার হাত থেকে কার্ডটা নিয়ে দেখল উল্টেপাল্টে, কিন্তু ক্যুরিয়ার কম্পানির কোনও চিহ্নমাত্র নেই খামের কোথাও।

তার অর্থ এই যে, কার্ডটি ক্যুরিয়ার মারফত আসেনি, পাঠিয়েছে কোনও ব্যক্তি বা তার দলের কেউ।

কার্ডটির লেখা পড়ে তিতিক্ষা কিন্তু দ্বিগুণ বিস্মিত, হঠাৎ তার চোখমুখ কেমন ফ্যাকাসে আর ভয়ার্ত দেখায়। গার্গী তার মুখাবয়ব লক্ষ করছিল গভীর মনোনিবেশে, কী দেখল কে জানে, জিজ্ঞাসা করে, খুবই প্ল্যান্‌ড্ মার্ডার। তুমি কি বুঝতে পারছ কে বা কারা এই কার্ডটা পাঠিয়েছে?

তিতিক্ষা ফ্যালফ্যাল করে তাকায় গার্গীর মুখের দিকে, অতিকষ্টে ঘাড় নাড়ে, আমি কিছুই বুঝতে পারছি নে, গার্গীদি।

—কিন্তু তিতিক্ষা, যারা কার্ডটা পাঠিয়েছে তারা কিন্তু বিবেককে ভালোই চেনে।

তিতিক্ষা হতবাক হয়ে দেখতে থাকে গার্গীকে।

—অর্থাৎ তাদের সঙ্গে কোনও ব্যাপারে বিবেকের একটা ঝামেলা চলছিল, বিবেক তাদের শর্তে রাজি হয়নি, কিংবা দরে পোষায়নি কোনও বিষয়ে, তাই তাকে মার্ডার করে শাস্তি দিল বিবেককে।

তিতিক্ষা হঠাৎ বলল, কিন্তু আমি এ সব বিষয়ে বিন্দুমাত্র জানি না, গার্গীদি। নিশ্চয় কোনও গভীর ষড়যন্ত্র লুকিয়ে আছে এর মধ্যে।

—তিতিক্ষা, অন্তত একটা ক্লু পাওয়া গেল এই কার্ডটা হাতে পাওয়ায়।

তিতিক্ষার স্বরে একটা ক্ষীণ আশা, বলল, পাওয়া গেল, গার্গীদি?

—অবশ্যই। কিন্তু বিবেকের ইদানীংকালের কার্যকলাপ সম্পর্কে আমার কিছু জানা প্রয়োজন। সে কীসের ব্যবসা করছিল, কাদের সঙ্গে ব্যবসা করছিল, সেই

ব্যবসায়ে কীভাবে যুক্ত হল, ব্যবসায়ে যুক্ত হওয়ার ফলে কারা তার শত্রুতে পরিণত হয়েছিল ইত্যাদি কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা প্রয়োজন এই মুহূর্তে।

তিতিক্ষা আবারও ফ্যালফ্যাল করে তাকায়, ফ্যাসফেসে গলায় বলে, আমি ওর ব্যবসা সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানতাম না, গার্গীদি।

—একেবারে জানতে না তা তো হয় না। নিশ্চয় সারাদিনে কিছু না কিছু ফোন আসত, কী ধরনের ফোন, কারা ফোন করত তার কিছুই কি জানতে না তুমি?

—গার্গীদি, আমি আসলে নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতাম এতদিন। ও কোথায় যায়, কার সঙ্গে মেলামেশা করে তার প্রায় কিছুই বলত না আমাকে, আমিও জানতে চাইতাম না। আমি ছবি আঁকতাম নিজের মনে, ওর কাছে কখনও কখনও শুনতাম ওর ব্যবসা কেমন চলছে।

—কীরকম চলছিল ব্যবসা?

—প্রথম-প্রথম ভালোই চলছিল। রোজই এসে বলত কোথায় কার সঙ্গে আলাপ হল, কীরকম অর্ডার পাচ্ছে, বিদেশের অর্ডারও পেতে শুরু করল। একদিন উত্তেজিত হয়ে এসে বলল, জানো, তিতি, প্রায় দু-কোটির টাকার অর্ডার আসবে বিদেশ থেকে।

—দু-কোটি টাকার?

—হ্যাঁ। ক-দিন ধরে পাগলের মতো ছোটাছুটি করল সেই অর্ডারটা যাতে পাঠাতে পারে বিদেশে।

—পাঠাতে পেরেছিল?

—হ্যাঁ। দিন কুড়ি পরে এসে একগাল হাসি নিয়ে বলল, জানো, তিতি, অর্ডারটা পাঠাতে পেরেছি শেষপর্যন্ত।

—তা হলে তো বেশ বড়ো অঙ্কের লাভ হওয়ার কথা?

—তাই তো কথা ছিল। কিন্তু সেই অর্ডার পাঠানোর পর পেমেন্ট আর আসে না।

—একেবারেই না?

—না। তাই তো একেবারে পাগলের মতো ছোটাছুটি করছিল এখানে-ওখানে। মাঝে মধ্যে বলত, বুঝলে তিতি, কোনও মানুষকে বিশ্বাস করতে নেই।

—তারপর?

—তারপর থেকেই তো ভেঙে পড়ল একেবারে। বাবা অনেক টাকা দিয়ে গড়ে দিয়েছিলেন আমাদের ফ্যাক্টরিটা। সেই টাকা তো ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচারেই চলে গিয়েছিল, বেশ কিছু টাকা লোন নিতে হয়েছিল প্রোডাকশনের জন্য।

—কোথা থেকে লোন নিয়েছিল?

—ব্যাঙ্ক থেকে। দুটো ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট ছিল কম্পানির। তারা তো লোন দেওয়ার জন্য হাত বাড়িয়ে বসে ছিল।

—লোন পেতে কোনও অসুবিধে হয়নি?

—না। প্রথমত, আমার বাবার একটা গুডউইল তো ছিলই। তা ছাড়া বিবেক যে-প্রোজেক্ট জমা দিয়েছিল তা দেখে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ খুবই খুশি হয়ে লোন দিয়েছিল।

—কত টাকা লোন নিয়েছিল?

—দুটো ব্যাঙ্ক থেকে পঞ্চাশ লাখ পঞ্চাশ লাখ মোট এক কোটি টাকা।

গার্গীর হঠাৎ কী মনে হতে জিজ্ঞাসা করল, ব্যাঙ্কের লোন নেওয়ার সময় কে গ্যারান্টার হয়েছিলেন তা জানো?

—জানি। বাবাকেই বলেছিলাম গ্যারান্টার হওয়ার কথা। বাবা প্রথমে রাজি হননি। পরে আমি চাপাচাপি করতে বলেছিলেন, ঠিক আছে, নিয়ে এসো ফর্ম। কিন্তু বলেছিলেন, পরে আর কোনও ব্যাপারে আমাকে চাপ দেবে না কিন্তু।

—ও, গার্গী নিজের ভিতরে ডুবুরি নামিয়ে কী যেন খুঁজল কিছুক্ষণ, পরমুহূর্তে—

—তা সেই টাকা তো কম্পানিতে খাটছে?

—খাটছিল।

বলে তিতিক্ষা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে।

—খাটছিল মানে? গার্গী তিতিক্ষার চোখের ভাষা পড়তে চেষ্টা করে।

—টাকাটা তো সবই আটকে গেল বিদেশের অর্ডারি পাঠাতে গিয়ে। বরং আরও অনেক টাকা ধার হয়ে গেল শেষপর্যন্ত।

তিতিক্ষার কান্নাভেজা মুখের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে গার্গী কিছুক্ষণ ভাবল এলোমেলো। তিতিক্ষাকে দেখতে এতই সুন্দর যে তাকে এরকম শোকের মুহূর্তেও দেখাচ্ছে ভারি অপরূপ।

গার্গী উপলব্ধি করছিল কেন অলীকশেখর তাঁর জামাইয়ের এই পরিণতির জন্য বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত নন। অলীকশেখর তাঁর রূপসী মেয়ের জন্য নিশ্চয় আরও ভালো পাত্র পেতে পারতেন। চেয়েছিলেন তাঁর পরিবারের সমান মর্যাদার কোনও পাত্রের সঙ্গে তিতিক্ষার বিয়ে দিতে। তিতিক্ষা নিজেই পাত্র পছন্দ করায় তিনি এতটাই মর্মাহত যে, বিবেকের সঙ্গে তার এই বিয়েটা আজও মেনে নিতে পারেননি। তবে তিতিক্ষার মুখ চেয়েই বিবেককে কারখানা গড়তে বেশ কিছু অর্থের সংস্থান করে দিয়েছিলেন, যদিও বুঝতে পেরেছিলেন টাকাটা দিয়েছেন অপাত্রেই। বিবেক এ ক'বছরে ব্যবসা করতে গিয়ে লাভ করতে তো পারেইনি, বরং জড়িয়ে পড়েছে মোটা অঙ্কের ঋণে।

বিবেকের ব্যবসার বিষয়টা ক্রমে গার্গীর কাছে প্রাঞ্জল হলেও তাকে কী কারণে খুন হতে হল তার একচিলতেও এখনও পরিষ্কার হয়নি তার কাছে। আসলে বিবেককে সে চিনত না, ফলে এখনও তার সম্পর্কে অনেক কিছুই জানা বাকি। তিতিক্ষা এখনও শোকের গভীরে, সে ঠিকঠাক উত্তরও দিতে পারছে না অনেক বিষয়।

গার্গী হঠাৎই জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা তিতিক্ষা, তুমি বলতে চাইছ এখানে তোমাদের তেমন কোনও শত্রু ছিল না?

—একেবারে ছিল না তা কী করে বলব? কিন্তু কখনও তেমন ভয় পেতে দেখিনি যা দিল্লি যাওয়ার পর দেখলাম।

—দিল্লি গিয়ে কী ধরনের ভয় পেয়েছিল তা বলতে পারবে?

—বলল কেউ তাকে সারাক্ষণ অনুসরণ করছে। রাস্তায় একা হাঁটতে ভয় পাচ্ছিল। এমনকী রাতে হোটেলে থাকতেও ভয় পাচ্ছিল।

—কে বা কারা অনুসরণ করছিল তা কি বলেছিল একবারও?

—না। তিতিক্ষা আপসোস করে, তখনই জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল।

—তা হলে তারাই কি বিবেকের পিছু অনুসরণ করে এসেছিল কলকাতা পর্যন্ত?

তিতিক্ষা একটু ভাবে, তারপর বলে, হয়তো তারাই।

গার্গী তিতিক্ষার স্মৃতিকে আরও একটু উসকাতে চাইল, কিংবা এও হতে পারে তাদের কাউন্টারপার্ট এখানে অপেক্ষা করছিল, প্লেন থেকে নামার পর তারাই বিবেককে কিডন্যাপ করে!

তিতিক্ষা অন্যমনস্ক ঘাড় নাড়ে, তাও হতে পারে—

তাদের এই কথোপকথনের মধ্যে হঠাৎই এসে হাজির হল এক মধ্যবয়স্ক মহিলা। পরনের কাপড় দেখে মনে হল পরিচারিকা গোছের। তিতিক্ষার সঙ্গে গার্গীকে দেখে একটু থতমত, পরক্ষণে তিতিক্ষাকে দেখে বলল, বউদিমণির শরীর কি খারাপ?

তিতিক্ষার চোখের দৃষ্টিতে অসীম শূন্যতা।

—মা পাঠালেন আপনার খোঁজ নিতে।

তিতিক্ষার ঠোঁট কাঁপছিল, খুব কষ্ট করে কান্না চেপে বলল, লবঙ্গদি, মাকে বোলো আমি ভালো আছি।

—কোথায় ভালো আছেন? আপনাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে আপনার শরীর খারাপ। ডাক্তারবাবুকে খবর দেব?

—না, তিতিক্ষা সজোরে ঘাড় নাড়ে।

গার্গী অনুমান করছিল লবঙ্গদি নামের পরিচারিকাটি অলীকশেখরের বাড়ি থেকে এসেছে। নিশ্চয় সারাক্ষণের কাজের লোক। তিতিক্ষার সঙ্গে কথার বলার

সময় বারবার তাকাচ্ছিল গার্গীর দিকে। এ বাড়িতে গার্গী এই প্রথম, কৌতূহল হওয়াটাই স্বাভাবিক।

লবঙ্গদি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকে তার আর কিছু করার আছে কি না এ বাড়িতে। তিতিক্ষাই হঠাৎ বলল, মা এখন কেমন আছে, লবঙ্গদি?

—মা এখন ভালো। আপনার কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন।

গার্গী বুঝে উঠতে পারছিল না অলীকশেখরের বাড়িতে বিবেকের খুনের খবরটা পৌঁছেছে কি না। হয়তো পৌঁছোয়নি। পৌঁছোলে লবঙ্গদির গলার স্বর অন্যরকম ঠেকত। তিতিক্ষার মা-ও 'ভালো' থাকতেন না এখন। তা হলে কি অলীকশেখর কিছুই বলেননি বাড়িতে! অবশ্য অলীকশেখরের পক্ষে কিছু না-বলাটাই স্বাভাবিক এই মুহূর্তে। বিশেষ করে তিতিক্ষার মা যখন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, বিবেকের খবর শুনলে আরও অনেকটাই অসুস্থ হয়ে পড়বেন। তবু এরকম একটা দুঃসংবাদ কতদিন বা কত ঘন্টা বাড়িতে চেপে রাখা সম্ভব!

লবঙ্গদি হঠাৎ বলল, অনেক তো বেলা হয়ে গেছে বউদিমণি। আপনি স্নান-খাওয়া কিছুই তো করেননি এখনও?

তিতিক্ষার ঠোঁট কাঁপতে থাকে থরথর করে। কিন্তু খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, আমি ঠিক সময়মতো খেয়ে নেব, লবঙ্গদি। তুমি এখন দ্যাখো মায়ের শরীর যেন ঠিক থাকে।

লবঙ্গদি অমনি ঘর থেকে বেরিয়ে রওনা দেয় নীচের দিকে।

গার্গীর মনে হল বিষয়টা খোলসা করে জানানো উচিত অলীকশেখরকে। তিনি তাঁর জামাইকে পছন্দ করেন না যেমন সত্যি, কিন্তু এই মুহূর্তে বিবেকের পরিণতিটাও তো তাঁর জানা দরকার। লবঙ্গদি চলে যাচ্ছিল, গার্গী দ্রুত পায়ে বেরিয়ে পিছন থেকে তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে, অলীকশেখরবাবু কি বাড়িতে আছেন?

লবঙ্গদি অবাক হয়ে নিরিখ করে গার্গীকে, তারপর বলল, না। কোথা থেকে যেন একটা ফোন এল বাবুর কাছে। কে যেন মারা গেছে তার কারণে তাঁকে একবার যেতে বলল তক্ষুনি। খবরটা শুনেই বেরিয়ে গেছেন, এখনও ফেরেননি।

৮

পুলিশ ইনস্পেক্টর দেবজ্যোতি নাগ রায় বহুক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিলেন অলীকশেখরের জন্য। অনেকক্ষণ আগেই মোবাইলে ধরেছিলেন কলকাতার এই বিখ্যাত ব্যবসায়ীটিকে। অলীকশেখরের তেমন পরিচয় জানতেন তা নয়, কিন্তু এই কেসের তদন্ত শুরু হওয়ার পরই জানতে পেরেছেন অলীকশেখর এই মুহূর্তে

একজন বড়ো আকারের বিজনেস ম্যাগনেট। অনেকগুলি ছোটো বড়ো বিজনেসের কোনওটার চেয়ারম্যান, কোনওটার ম্যানেজিং ডিরেক্টর, কোনওটার বা বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব।

ইনভেস্টিগেট করতে গিয়ে জেনেছেন তাঁর কন্যা ও জামাতার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের টানাপোড়েনও। বিশেষ করে তিনি যে জামাতাকে একেবারেই পছন্দ করতেন না এ তথ্য জানার পর তদন্তের গতিমুখ গেছে একেবারেই বদলে।

অলীকশেখরের মানসিকতার এ-টু-জেড আবিষ্কার করার পরে দেবজ্যোতির এও জানা প্রয়োজন কন্যা তিতিক্ষার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের খুঁটিনাটিও।

বেশ কিছু টেনসনবহুল মুহূর্ত কাটানোর পর রীতিমতো অস্থির হয়ে একটা সিগারেট ধরালেন বছর আটত্রিশের ইনস্পেক্টরটি।

আর প্রতিবারই দেশলাই কাঠির মুখের আগুন দিয়ে সিগারেটের মুখ পোড়ানোর পর একটা লম্বা টান দিয়ে ভাবেন, নাহ্, এবারেরটাই শেষ সিগারেট, আর খাবেন না। সিগারেট ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ।

কিন্তু ভাবনাটা ভাবনার স্তরেই থেকে যায়, সিগারেটকে একেবারে গুড বাই করতে পারেন না। পারবেনই বা কী করে। এভাবে একটার পর একটা জটিল মার্ডার কেস যদি সমাধানে নামতে হয় তখন বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিতে তাঁর প্রয়োজন হয় দুজনকে। একজন তাঁর একটি ফিচেল সেপাই টিকটিকিকে। টিকটিকি নামটা অবশ্য তাঁরই দেওয়া। আসল নাম বোধহয় তেজেন। কিন্তু লোকটি সারাক্ষণ এত তড়বড় করে আর কানের কাছে টিকটিক করে যে, দেবজ্যোতি তাকে টিকটিকি বলে ডাকেন। বিরক্তির কারণ ঘটালেও তাকে দরকার হয় কারণ লোকটির মাথায় সর্বক্ষণই কিছু না কিছু বদবুদ্ধি ঘোরে যা প্রায়শ দরকার হয় পুলিশের চাকরিতে। অন্য যে জনকে তাঁর দরকার হয় তিনি হলেন সিগারেট। খুব ঝামেলায় পড়লে সিগারেট ধরিয়ে কায়দা করে তার ধোঁয়ায় রিং তৈরি করতে শুরু করেন দেবজ্যোতি। যত ভালো রিং তৈরি করতে পারেন তত বুদ্ধি খেলতে থাকে তার।

ঠিক যে-কারণে ছাড়ব-ছাড়ব করেও টিকটিকিকে ছাড়তে পারেননি আজও, সিগারেটটা ছাড়ব-ছাড়ব করেও এখনও টেনসন হলেই পকেট হাতড়ান এস ও এস হিসেবে। দুটোই তার কাছে নেসাসারি ইভিল।

আজও যখন অপেক্ষার তুঙ্গে, হঠাৎ কোত্থেকে টিকটিকি ফুঁড়ে উঠে তাঁর কানের কাছে ফিসফিস করে, স্যার, লোকটি কিন্তু খুব গোলমেলে।

গোলমেলে শুনে দেবজ্যোতি শিরদাঁড়া টানটান করেন, গোলমেলে মানে?

গোলমেলে শব্দটির নানা অর্থ হতে পারে, ঠিক কোন অর্থে অলীকশেখর মানুষটি গোলমেলে তা জানতে আগ্রহী হলেন পুলিশ ইনস্পেক্টর। অলীকশেখর

সম্পর্কে যা খবরাখবর পেয়েছেন ও যা পাচ্ছেন তার মধ্যে অনেকই গোলমাল। কিন্তু টিকটিকি কী বলে।

—স্যার, লোকটি কিন্তু বেজায় ধড়িবাজ।

গোলমেলে থেকে ধড়িবাজ। কিন্তু টিকটিকির ধরনই এরকম যে কোনও কথা ঝেড়ে কাশবে না, একটু একটু করে বলবে, ঠিক পেঁয়াজের খোসা যেমন ছাড়ায় আর কি।

—স্যার লোকটি আপনাকে এক হাটে কিনে অন্য হাটে বেচতে পারে।

টিকটিকির এই কথাটায় দেবজ্যোতি সায় দিতে পারলেন না। অন্য কেউ তাঁর চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান বা তাঁর সঙ্গে টক্কর দিয়ে জিততে পারে এরকম কোনও তথ্যে তাঁর খুশি হওয়ার কথা নয়। এবারে টিকটিকিকে কষে একটা ধমক দিয়ে বললেন, যা বলার তাড়াতাড়ি বল। তোর ওই ঘ্যানর ঘ্যানর শোনার মতো সময় আমার নেই।

—স্যার, লোকটাকে যদি আপনি কলকাতার গঙ্গার ঘাটে পুঁতে দেন তো কিছুক্ষণ পরে হাওড়ার গঙ্গার ঘাটে জন্মাবে।

ওহ্, টিকটিকিকে প্রায়ই এই সব কারণে মনে হয় জঘন্যতম মানুষ। তাকে আর এক ধমক লাগাবেন বলে হাতের আঙুল তিনটে মটমট করে মটকেছেন ঠিক সে সময় টিকটিকির পরবর্তী মন্তব্য, স্যার লোকটা রসেবশে থাকে। মানে স্যার ভারি রসালো।

রসেবশে আর রসালো দুটি শব্দের ব্যবহারে বিষয়টি আরও ঘোরালো করে তুলতে দেবজ্যোতির জোড়া ভুরুতে ধানের বনে বাতাসের ঢেউ খেলে যাওয়ার মতো তিন ভাঁজ।

চটে উঠে বললেন, দ্যাখ, টিকটিকি, এত গৌরচন্দ্রিকা করলে বিষয়ের উপর মানুষের আর টান থাকে না। মঞ্চে উঠে দু-একজন বক্তা এত গৌরচন্দ্রিকা করে ফেলেন যে, তিনি যখন বলতে বলতে আসল কথায় এলেন ততক্ষণে শ্রোতা ঘুমিয়ে একশা।

—স্যার এতেও বুঝলেন না আমি ঠিক কী বলতে চাই?

ভুরুতে তখন হাওয়ার ঢেউ খেলে যাওয়া, কী?

—স্যার, লোকটি নাকি সন্ধের পর আর মানুষ থাকে না।

—মানুষ থাকে না কি বনমানুষ হয়ে যায়? কী যে বলিস।

—প্রায় সে রকমই স্যার। লোকটা সারাদিন মোষের মতো ঘুরে বেড়ায় এক কোম্পানি থেকে আর কোম্পানিতে। আর রাতের বেলা মদ খায়।

—মদ খায়? সেটা কোনও খবর হল নাকি? সে তো এখন সবাই খায়।

—না স্যার, এ খাওয়া সে খাওয়া নয়।

—তা হলে? কীরকম খাওয়া? দেবজ্যোতি ক্রমশ অধৈর্য হয়ে পড়ছেন কথার মারপ্যাঁচে। টিকটিকির ধরনই এরকম যে—

—স্যার, লোকটা রাতের বেলা এত মদ খায় যে তখন আর কাউকে চিনতে পর্যন্ত পারে না।

—চিনতে পারে না মানে?

—স্যার, আপনি এবার বুঝে নিন বেশি মদ খেলে কী কী হতে পারে।

দেবজ্যোতি ক্রমে অস্থির হয়ে চেঁচিয়ে বললেন, দ্যাখ, তোর এই টিকটিক করাটা বন্ধ কর তো। এতক্ষণ ধরে আমার সময় নষ্ট করে যা বললি তার জন্য তোর এতক্ষণের ঘ্যানর ঘ্যানর করার কোনও দরকার ছিল না। পুলিশে চাকরি করে যা অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে যে কোনও লোককে একবার দেখলে বা তার সঙ্গে দু-মিনিট কথা বললে তার নাড়িনক্ষত্র সব বুঝে যাই।

—সত্যিই বোঝেন, স্যার?

—বুঝিনে মানে? বেশি মদ খেলে কী কী হয় তা আমার চেয়ে বেশি কে জানে? সারাক্ষণ কত যে মদ্যপকে সামলাতে হয় আমাকে!

—স্যার, তাতে আপনি লোকটির নাড়িনক্ষত্র বুঝলেও লোকটির নারীনক্ষত্র বুঝতে পারবেন না যদি না আপনার প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকে।

—প্রত্যক্ষ জ্ঞান? মানে তোর সেরকম প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে নাকি?

দেবজ্যোতি আবার তাঁর শিরদাঁড়া টানটান করে বসলেন, হ্যাঁ, কী জানিস বল? লোকটা উয়োম্যানাইজার নাকি?

—স্যার, লোকটা—

টিকটিকির কথা শেষ হওয়ার আগেই বাইরে জুতোর আওয়াজ। একটু বেশি জোরেই আওয়াজটা হওয়ায় দেবজ্যোতি বুঝলেন বাইরের লোক। পুলিশ হেডকোয়ার্টারের কোনও স্টাফ বা কনস্টেবল বা হোমগার্ড এত জোরে শব্দ তুলবে না জুতোয়। কোনও অফিসার এলে তার জুতোর শব্দে একটা ছন্দ থাকে যা তাদের শেখানো হয়ে থাকে ট্রেনিংয়ের সময়।

পরক্ষণেই বাইরে বসা তাঁর আর্দালি ল্যাবেঞ্চুষ মুখ বাড়ায়, স্যার, ভিজিটর।

ল্যাবেঞ্চুষ নামটাও তাঁরই দেওয়া যেহেতু বাচ্চু রায় নামের অল্পবয়সী ছেলেটির চেহারাটা গোলগাল আর মিষ্টি ধরনের।

—ঠিক আছে, পাঠিয়ে দে।

তৎক্ষণাৎ দরজায় লাগানো হালকা সবুজ রঙের ভারী পর্দা সরিয়ে যিনি চেম্বারে ঢুকলেন জুতো মসমসিয়ে তিনিই যে অলীকশেখর তা বুঝতে আর অসুবিধে হল না দেবজ্যোতির।

সিগারেটটা ঘন কালো রঙের অ্যাশট্রের উপর আড়াআড়ি রেখে সোজা হয়ে বসলেন দেবজ্যোতি কেন না সামনে যে-মানুষটি লম্বা লম্বা পা ফেলে ঢুকলেন তাঁর চেম্বারে তিনি যে খুব হেলাফেলার ব্যক্তিত্ব নন তা এক পলকেই বুঝে গেলেন অভিজ্ঞ পুলিশ ইনস্পেক্টরটি। হঠাৎ নিজের মনে আউড়ে ফেললেন, এ যে রীতিমতো পাঠান!

সত্যিই পাঠানদের মতো লম্বা-চওড়া চেহারা অলীকশেখরের। টকটক করছে গায়ের রং। সামনে একটু টাক থাকায় বয়সের একটা ছাপ পড়লেও বেশ যুবক-যুবক লাগে লোকটিকে। কত বয়স হবে তার একটা আন্দাজ পাওয়ার চেষ্টা করলেন মনে মনে। হয়তো পঞ্চান্ন হবে, না কি ষাট! তবে পঁয়তাল্লিশ বললেও বিশ্বাস করা যাবে। হাঁটাচলায়, চাউনিতে বেশ তীব্র ব্যক্তিত্ব। দেবজ্যোতির সামনে সটান এসে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ে বললেন, আপনি আমাকে দেখা করতে বলেছিলেন?

দেবজ্যোতিও নিজের ভিতরে কিছু একস্ট্রা ব্যক্তিত্ব আরোপ করতে চাইলেন কেন না এরকম ব্যক্তিত্বের সঙ্গে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়ার আগে নিজেকেও তৈরি করে নিতে হয় ঠিকঠাক। অলীকশেখরকে খুব দ্রুত মেপে নিয়ে বললেন, হ্যাঁ। আপনি নিশ্চয় শুনেছেন বিবেক দ্বিবেদীর খুন হওয়ার কথা।

দেবজ্যোতির প্রথম কথাটাই এত কড়া ছিল যে, তা হজম করতে একটু সময় নিলেন অলীকশেখর। বললেন, সে তো আপনিই ফোনে জানালেন একটু আগে।

—বিষয়টা খুবই দুঃখজনক।

অলীকশেখর বেশ আশ্চর্যজনকভাবে নিরুত্তর রইলেন যা বিস্মিত করছিল দেবজ্যোতিকে।

—এখন কেন খুন হলেন বিবেক, কারা খুন করল সে বিষয়ে ইনভেস্টিগেট করতে গিয়ে বুঝতে পারছি এর পিছনে কোনও একটি গ্যাং আছে যাদের সঙ্গে বিবেক দ্বিবেদীর কোনও বিষয়ে শত্রুতা তৈরি হয়েছিল।

অলীকশেখর কয়েক মুহূর্ত নিশ্চুপ থেকে বললেন, হতে পারে।

—কিন্তু পুলিশ বিষয়টি নিয়ে এখনও একেবারেই অন্ধকারে। তদন্ত করতে গিয়ে প্রথমেই মনে হল আপনার কথা।

অলীকশেখর তেমনই নির্বিকার থেকে বললেন, সেটাই তো স্বাভাবিক।

—আপনার কাছে কিছু তথ্য জানতে চাইব। আপনি সঠিক উত্তর দেবেন।

—বলুন আপনি কী জানতে চান। আমার জানা থাকলে তবেই তার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব।

অলীকশেখরের প্রতিটি কথা, তাঁর অভিব্যক্তি তীক্ষ্ণ চোখে জরিপ করছিলেন দেবজ্যোতি। বেশ কঠিন জায়গায় পড়েছেন এমন মনে হচ্ছিল কথোপকথনের মধ্যে।

—যেটুকু জানতে পেরেছি বিবেক একটি কোম্পানির মালিক ছিলেন। বেশ কিছুদিন যাবৎ কোম্পানির ব্যবসা ভালো চলছিল না।

—ব্যবসার নিয়মই তাই। কখনও ভালো চলে, কখনও খারাপ। তার মধ্যে নতুনত্ব নেই।

—কিন্তু বিবেক মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে বহু টাকা ধার করে ফেলেছেন নানা জায়গা থেকে।

অলীকশেখরের অভিব্যক্তিত্বে একটা একস্ট্রা কাঠিন্য, বললেন, লোন না নিলে কোনও ব্যবসাই চালানো যায় না—ব্যবসার এই সাধারণ জ্ঞানটুকু একজন পুলিশ অফিসারের জানা উচিত।

দেবজ্যোতির মুখ লাল হয়, তার অভিব্যক্তিও, বললেন, কিন্তু ব্যবসায়ের সবটাই যদি লায়াবিলিটি হয়, আর অ্যাসেটের ঘরে একটা বড়ো শূন্য তা হলে সেই ব্যবসাকে আপনারা কী বলেন?

অলীকশেখরের মুখের রেখায় সামান্য ফাটল, বললেন, এ পৃথিবীতে বহু ব্যবসাই লোকসানে চলে। বহু ব্যবসায়ী লাভের মুখ না দেখতে পেয়ে ব্যবসা গুটিয়ে ফেলে। বহু ব্যবসায়ী অল্প সময়ে বহু লাভ করতে গিয়ে ব্যবসাটাই ডকে তুলে দেয়। এরকম উদাহরণ ভূরি ভূরি আছে। বহু ব্যবসায়ী আবার শূন্য থেকে শুরু করে কোটিপতি হয়েছে তার উদাহরণও কম নয়।

—তা হলে বলুন তো, বিবেক কোটি কোটি টাকার ঋণে জর্জরিত থাকা সত্ত্বেও আপনি কেন তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছিলেন?

—আপনাকে কে বলল আমি মুখ ফিরিয়ে রেখেছি?

—সারকামস্ট্যান্সেস বলছে।

—আপনি এই কয়েক ঘন্টার মধ্যে কতটুকু খবর জোগাড় করেছেন যে এত বড়ো একটা কথা ফট করে বলে দিলেন?

—আমরা জেনেছি যারা কিডন্যাপার তারা আপনার কাছে কয়েক লক্ষ টাকা চেয়েছিলেন যে-পরিমাণ টাকা আপনার পক্ষে দেওয়া সম্ভব ছিল। টাকাটা দিলেই হয়তো কিডন্যাপাররা বিবেককে মুক্তি দিয়ে দিত।

অলীকশেখরের কপালে বড়ো বড়ো ভাঁজ ঢেউ খেলে গেল মুহূর্তে, বেশ কড়া চোখে তাকালেন দেবজ্যোতি নাগ রায়ের মুখের দিকে, বললেন, কলকাতায় অজস্র ব্যবসায়ী বাস করে, কিডন্যাপাররা সারাক্ষণ ওত পেতে থাকে কাকে অপহরণ

করবে, তারপর মুক্তিপণ চাইবে তাদের ইচ্ছেমতো। কিন্তু এটাও তো ভাবতে হবে ব্যবসায়ীরা তাদের দাবি মেটালে লাই পেয়ে যাবে কিডন্যাপাররা। তা হলে তো পুলিশের আর কিছু করণীয় থাকে না। তার মানে আপনি বলতে চাইছেন কিডন্যাপাররা প্রতিদিন একজন-দুজন করে ব্যবসায়ী অপহরণ করুক, আর তারা তাদের সর্বস্ব নিঃশেষ করে মুক্তিপণ দিয়ে বাড়ি ফিরুক। বেশ যুক্তি দিলেন আপনি!

দেবজ্যোতি জানতেন অলীকশেখর এভাবে আক্রমণ করবেন পুলিশকে, জেনেও তিনি গলা বাড়িয়ে দিয়েছেন অলীকশেখরের প্রতিক্রিয়া কী হয় জানতে। বললেন, কিন্তু পুলিশকে তো আপনারা তাদের কাজ করতেই দেননি?

অলীকশেখর জ্বলে উঠলেন তৎক্ষণাৎ, মানে?

—মানে আপনারা পুলিশকে আড়াল করে আসছিলেন প্রথম থেকে। বেশ কয়েকদিন ধরে কেউ বা কারা থ্রেট করছিল বিবেককে। আপনারা সব জেনেও চুপ করে বসেছিলেন ঘরের মধ্যে। পুলিশকে যদি আপনারা প্রথমেই জানাতেন তা হলে হয়তো বিবেকের পরিণতি অন্যরকম হতে পারত।

অলীকশেখরের মুখের দীপ্তি নিভে গেল সহসা। ভুরুতে কিছুক্ষণ ঢেউয়ের ওঠাপড়া। হঠাৎ বললেন, বিবেকই বলেছিল পুলিশকে খবর না দিতে। তারা নাকি ধমকাচ্ছিল পুলিশকে খবর দিলেই তাকে মার্ডার করবে। তার আগে সে চেষ্টা করেছিল তাদের চোখে বালি ছিটিয়ে ফিরে আসবে ভোরের ফ্লাইট ধরে।

দেবজ্যোতি ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললেন, বিবেক কিন্তু জানত কারা তাকে ফলো করছে। কারা তাকে মার্ডার করতে পারে। সে জানত তারা সুযোগ পেলেই তাকে খুন করতে চাইবে।

অলীকশেখর হয়তো বা বিস্মিত হলেন বা বিস্মিত হওয়ার ভান করলেন, কিছুক্ষণ সময় নিয়ে বললেন, আপনি কী করে জানলেন এত সব খবর?

—যে কোনও সূত্রেই হোক জেনেছি। আপনি হয়তো জানেন না পুলিশের কাছে নানা ভাবে ভিতরের অনেক খবর এসে যায়।

অলীকশেখর চুপ করে রইলেন।

দেবজ্যোতি বললেন, অলীকশেখরবাবু, বিবেক না হয় ভয় পাচ্ছিল তাকে খুন করে ফেলতে পারে আততায়ীরা। কিন্তু আপনি তো বিচক্ষণ মানুষ। আপনার উচিত ছিল পুলিশকে তক্ষুনি খবর দেওয়া।

—এখন আপনি যা বলছেন তা আমারও মনের কথা। কিন্তু আপনি তো জানেন না ঘরের সব খবর। শুধু বিবেকই নয়, আমার মেয়েও চায়নি পুলিশে খবর দেওয়া হোক। ওরা ফিয়ার সিনড্রোমে ভুগছিল তখন।

দেবজ্যোতি এতক্ষণে গলা চড়িয়ে বললেন, দেখুন, অলীকশেখরবাবু, আপনার অভিজ্ঞতা, আপনার মেধা সম্পর্কে দেশের মানুষ যা জানে তাতে এরকম একটা সাংঘাতিক ভুল করার কথা ভাবাই যায় না। হয় আপনি পুলিশকে খবর দিতে পারতেন, না হয় মুক্তিপণের টাকা মিটিয়ে আপনি উদ্ধার করতে পারতেন আপনার জামাইকে।

দেবজ্যোতি ভাবছিলেন অলীকশেখরকে তিনি কোণঠাসা করতে পেরেছেন, কিন্তু অলীকশেখর পাল্টা আক্রমণ করে বললেন, দেখুন, ইনস্পেক্টর, বারবার আপনি মুক্তিপণের কথা তুলছেন, তুলে পুলিশের ভূমিকা হালকা করতে চাইছেন। একটা কোম্পানিকে আমি সর্বতোভাবে টাকা দিয়ে, নানাভাবে সাহায্য করে দাঁড় করাতে চেয়েছিলাম। বাট ইট ওয়াজ এ সিঙ্কিং শিপ। যতই জল সেঁচে আপনি তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করুন না কেন সে জাহাজ ডুববেই। তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করে লাভ নেই।

—তার মানে আপনি বলছেন বিবেককে এ কারণেই আপনি বাঁচানোর চেষ্টা করেননি?

অলীকশেখরের মুখে রক্তাভা, রাগে লকলক করে উঠল তাঁর অভিব্যক্তি। বললেন, আপনি কথা ডিসটর্ট করতে ভালোবাসেন, ইনস্পেক্টর।

—ডিসটর্ট তো আমি করছি না। আপনার কথার পরিপ্রেক্ষিতে কথাটা বললাম। এখন এ কথাও যদি আমি বলি যে, আপনার সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণেই বিবেক দ্বিবেদীকে খুন হতে হল তা হলে কি আপনি অস্বীকার করতে পারবেন, অলীকশেখরবাবু? যদি বলি আপনি এই মৃত্যুটা চেয়েছিলেন?

৯

পুরোনো দিনের একটা আশ্চর্য গড়নের ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে বসে নিউ ইকনমিব টাইম্‌সের পৃষ্ঠায় চোখ বিদ্ধ করছিলেন অলীকশেখর। ইজিচেয়ারটির বিশেষত্ব এই যে, তার লম্বা হাতলদুটোর উপরে পা তুলে দিয়ে হেলান দিয়ে বসলে সামনে-পিছনে-ডাইনে-বাঁয়ে যে কোনও দিকেই দোল খাওয়া যায়। এ ধরনের ইজিচেয়ার আজকের দিনে দুর্লভ। অলীকশেখরের ঠাকুর্দার আমলে তৈরি এই ইজিচেয়ারটি অ্যান্টিকের আইটেম হিসেবে পরিগণিত হলেও এর মায়া তাই আজও ছাড়তে পারেননি তিনি। প্রতিদিন সকালে চা ও খবরের কাগজের সঙ্গে কিছু অবসরের মুহূর্ত ইজিচেয়ারটির কোলে বসেই কেটে যায় তাঁর। তাঁর সঙ্গে সারাক্ষণ দোল খায় অর্থনৈতিক হালহদিশে ভরা এই বিশেষ সংবাদপত্রটিও।

আজ ছুটির দিন বলে অলীকশেখরের ব্যস্ততা তেমন নেই। অন্যদিন সকাল আটটা না-বাজতে বেরিয়ে পড়েন কোট-প্যান্ট-টাই পরে রীতিমতো ফুলবাবু হয়ে। সারাদিন অজস্র বোর্ড মিটিং ও প্রোগ্রাম থাকে এ- কোম্পানি ও-কোম্পানিতে। তিনি নিজে তিনটে কোম্পানির মালিক ও আরও সাতটা কোম্পানির শেয়ার হোল্ডার। প্রতিটি কোম্পানির জন্য আলাদা সময় বরাদ্দ রাখতে হয় সকাল ন-টা থেকে সন্ধে সাতটা পর্যন্ত। ঠাসা শিডিউল। তারপর অবশ্য তাঁর রিল্যাক্স করার সময়।

শুধু ছুটির দিনটাই যা আলাদা। প্রতিটি ছুটির দিন তিনি উদযাপন করেন একেবারে অন্যভাবে।

ঝুঁকে পড়ে তাঁর একটি বিশেষ কোম্পানির শেয়ারের অস্বাভাবিক দর দেখে তাঁর লোমভর্তি ভুরু বেঁকে গেল দেবদারুপাতার মতো। বুরুশ গোঁফের উপর বারদুই ডান হাতের বৃদ্ধা ও তর্জনীর নড়াচড়া ঘটে গেল অন্যমনস্কভাবে। কিছুক্ষণ সংখ্যাটার উপর নিমগ্ন থেকে পরক্ষণে নজর রাখলেন তার নীচের সংখ্যাটার উপর। সবে একটু প্রসন্ন হতে শুরু করেছে তাঁর ভুরুজোড়া, সেসময় টেলিফোনের টুং নানা টুং নানা শব্দ। অনিচ্ছুক হাতে রিসিভারটা তুলে বললেন, হ্যাঁ, বলুন।

কলকাতার কোনও একটি বণিকসভা তাদের বার্ষিক অনুষ্ঠানে অলীকশেখরকে সম্মাননীয় অতিথি হিসেবে পেতে চায় টেলিফোন মারফত এই অনুরোধ জেনে তৎক্ষণাৎ প্রস্তাবটি নাকচ করে বললেন, না, না, আমার একদম সময় নেই।

বলেই রিসিভারটি নামিয়ে রাখতে যাবেন সেসময় অন্যপ্রান্তের কথক বললেন, স্যার, আমরা গভর্নরকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছি, কিন্তু তাঁর সেক্রেটারি জানতে চেয়েছেন আর কোন কোন ভি আই পি মঞ্চে থাকবেন। স্যার, আমরা আপনার কনসেন্ট পেলে আপনার নামটাও গভর্নরকে জানাব।

অলীকশেখরের সুর অমনি বদলে গেল অস্বাভাবিকভাবে, বললেন, আসলে আমার যাওয়ার কিছু সমস্যা আছে, কিন্তু আপনারা কোন তারিখে মিটিং করতে চাইছেন?

—স্যার, এ মাসের থার্টিএথ। স্যাটারডে পড়েছে। এখনও তো বাইশ-তেইশ দিন সময় অছে। ওদিন ইভনিংয়ে আপনার যদি কোনও অসুবিধে না থাকে তো—

—ঠিক আছে, গভর্নর এলে তো যেতেই হবে। কিন্তু বেশিক্ষণ টাইম দিতে পারব না। গভর্নরের আগেই যেন আমার স্পিচ হয়ে যায়। কারণ গভর্নরের বক্তৃতা শেষ হলেই আমি চলে আসব। ওদিন রাত ন-টায় আমার একটা জরুরি মিটিং আছে।

—নো প্রব্লেম, স্যার। গভর্নর ছাড়া মাত্র তিনজন ডেইসে থাকবেন। আমরা গভর্নরের জন্য পঁচিশ মিনিট বরাদ্দ করেছি, বাকি অতিথিদের জন্য গড়ে পাঁচ-ছ

মিনিট। শেষে একজন নামী ক্লাসিকাল আর্টিস্ট গাইবেন দুখানা রবীন্দ্রসংগীত। ব্যস। সব মিলিয়ে মাত্র এক ঘন্টার প্রোগ্রাম। গভর্নর জানিয়েছেন তাঁর সেদিন আরও দুটো প্রোগ্রাম আছে।

টেলি-আলাপ শেষ হতেই ইজিচেয়ারের পায়ায় একটা ছোট্ট বোতাম আছে, সেটিতে সামান্য চাপ দিলেন অলীকশেখর, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অলিন নামের একটি কাজের লোকের প্রবেশ। মধ্যবয়সী এই লোকটি এ-বাড়িতে আছে বছর পঁচিশেক। খুব বিশ্বাসী আর সৎ। কাঁধে রাখা গামছাটিতে হাত মুছতে মুছতে এসে বলল, কিছু বলছেন, বাবু?

—এই যে অলিনশেখর, তোমাকে সকাল থেকে দেখতেই পাচ্ছিনে যে!

—কেন বাবু, এই তো আপনার ফলের রসের গেলাস দিয়ে গেলাম!

—তাই নাকি? ভুলে গেছি তা হলে । আসলে তোমার মুখ ঘন ঘন না-দেখতে পেলে আমার সারাক্ষণ মনে হয় তুমি বোধহয় কোথাও পালিয়েটালিয়ে গেলে।

—বাবু, মা জননীর শরীল খুব খারাপ। আপনি আজ কোথাও যাবেন না।

—যাব না? বলো কী!

—না, মা জননীর শরীল ভালো ঠেকছে না।

অলিনকে মজা করে অলিনশেখর বলে ডাকেন অলীকশেখর কেন না অলিন বহুকাল এ-বাড়িতে কাজ করায় এ-বাড়ির উপর তার একটা অধিকারবোধ জন্মে গেছে। এতটাই যে, প্রায়ই অলীকশেখরকেও উপদেশ দেয় নানাভাবে। আজও তার উপদেশাবলি শুনে নির্বিকার গলায় বললেন, আমার শোয়ার ঘরের তাকের উপর একটা সবুজ মলাটের একজিকিউটিভ ডায়েরি আছে, ওটা নিয়ে এসো তো।

অলিন তক্ষুনি ছুটে গিয়ে নিয়ে এল সবুজ মলাটের ডায়েরিটা। সেটি খুলে বুক পকেটে কী যেন হাতড়ে বললেন, পেনটা কোথায় রাখলাম? নাহ্, কাজের সময় কিছুই হাতের কাছে পাওয়া যায় না।

অলীকশেখরের পরনে যে একটা ঢাউস ফতুয়া, তার যে কোনও বুকপকেটেই নেই তা অলিন মনে করিয়ে দেয় না, সে একছুট্টে শোয়ার ঘরে গিয়ে টেবিলে জিরোতে থাকা পেনটি নিয়ে এসে তুলে দিল অলীকশেখরের হাতে। অলীকশেখর সবুজ ডায়েরিটার পৃষ্ঠা খুলে বার করলেন মার্চের তিরিশ তারিখের নির্দিষ্ট জায়গাটি। কী একটা প্রোগ্রাম লেখা রয়েছে দেখে মুখময় বিরক্তির ছটা। তার ঠিক উপরে লিখে রাখলেন রাজ্যপালের প্রোগ্রামটি। তারপর ডায়েরির পৃষ্ঠা বন্ধ করে ডায়েরি আর পেন দুটিই ফিরিয়ে দিলেন অলিনের হাতে। অলিন চলে যেতেই আবার খুলে বসতে যাচ্ছিলেন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা, সেসময় ঝমঝম শব্দে পাশেই রাখা অন্য আর একটি টেলিফোন। এই নিয়ে সকাল থেকে এটি ষষ্ঠ ফোন।

বিরক্তিতে চোখমুখ কুঁচকে রিসিভার তুলতেই ওপাশে এক ভারী কণ্ঠস্বর, আমি পুলিশ হেডকোয়ার্টার থেকে বলছি।

পুলিশের নাম শুনে অলীকশেখরের মুখ বেঁকেচুরে সাতখানা, একটু দম নিয়ে বললেন, বলুন, কী চাই?

—আপনার জামাই, মানে বিবেক দ্বিবেদীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সন্ধান করছি আমরা। আপনি তাঁর ব্যাঙ্ক আকাউন্ট সম্পর্কে কতটা জানেন তা জানতেই এই ফোন।

অলীকশেখরের বিরক্তি বাড়ল আরও কয়েকগুণ, বললেন, বিবেকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে আমি জানব কী করে? তার বিজনেসের খবর আমার জানার কোনও অধিকার নেই, কৌতূহলও ছিল না। আপনি বরং বিবেকের ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করুন।

—বিবেকবাবুর ম্যানেজার প্রথমেই হাত ধুয়ে ফেলেছেন। তিনি বলেছেন তিনি মাত্র একটিই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের খবর রাখেন। সেখান থেকেই যা খরচ করার তা করতেন।

—ম্যানেজার যখন বলছেন সেইটেই ঠিক।

—কিন্তু সেই অ্যাকাউন্টে তো কোনও টাকাই নেই।

—টাকা নেই মানে?

—মানে খুব সোজা। দিন সাতেক আগে সেই অ্যাকাউন্ট থেকে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা তোলার পর সেখানে এখন পড়ে আছে মাত্র চোদ্দশো সতেরো টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

অলীকশেখর কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে বললেন, তা হলে নিশ্চয় অন্য কোনও ব্যাঙ্কে টাকা আছে।

—কিন্তু আমরা তাঁর আর কোনও ব্যাঙ্কের কোনও হদিশ পাচ্ছি না।

—তিতি মানে তিতিক্ষার সঙ্গে কি আপনি যোগাযোগ করেছেন?

—করেছি। কিন্তু তিতিক্ষা দ্বিবেদীও বলতে পারছেন না বিবেক দ্বিবেদীর নামে অন্য কোনও অ্যাকাউন্ট আছে কি না।

—সে কী!

—তিতিক্ষা দিবেদ্বীর নিজের নামে অবশ্য একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে। তাতে তেইশ হাজার তিনশো বাইশ টাকা ব্যালেন্স। তিতিক্ষা বলেছেন এ টাকার সঙ্গে বিবেক দ্বিবেদীর বিজনেসের কোনও সম্পর্ক নেই।

—হতেই পারে। আমার মেয়ে ছবি আঁকে তা নিশ্চয়ই জানেন।

—হ্যাঁ, তিনি বলেছেন ছবি এঁকে তিনি প্রতি মাসে কিছু টাকা রোজগার করেন। এই অ্যাকাউন্টের টাকা সেই ছবি বিক্রির টাকা।

—একজ্যাক্টলি। আপনি হয়তো জানেন না ওর রিসেন্টলি একটা সোলো একজিবিশন হয়েছে অ্যাকাডেমিতে। সেই একজিবিশনের অনেকগুলো ছবি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে বেশ মোটা টাকায়।

টেলিফোনের অন্যপ্রান্তের ভারী গলা কিন্তু পরক্ষণেই পাল্টে গেল অনেকখানি, বললেন, অলীকশেখরবাবু, তিতিক্ষা দ্বিবেদীর অ্যাকাউন্টের টাকা নিয়ে আমরা মোটেই চিন্তিত নই। কিন্তু বিবেক দ্বিবেদীর মতো একজন ইয়াং বিজনেসম্যানের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে মাত্র এক হাজার চারশো সতেরো টাকা পঞ্চাশ পয়সা পড়ে আছে এ তথ্য ঠিক বিশ্বাসযোগ্য হচ্ছে না।

—আপনি কী বলতে চান?

—বলতে চাইছি বিবেক দ্বিবেদীর আরও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নিশ্চয়ই আছে। এত বড়ো একটা কোম্পানির ফান্ডে এত সামান্য টাকা পড়ে আছে তা কি বিশ্বাসযোগ্য?

অলীকশেখর কিছুক্ষণ থেমে থেকে বললেন, টেলিফোনে এত সব প্রশ্নের তো উত্তর দেওয়া যায় না। আমি বিবেকের কোম্পানির নাড়িনক্ষত্রের খবর রাখি না। আমার মেয়ে যখন যেরকম সমস্যার কথা বলেছে তা মেটানোর চেষ্টা করেছি। তিতি প্রায়ই বলত কোম্পানির অবস্থা খারাপ। টাকার কথা বলত। কিন্তু টাকা দেওয়ারও একটা সীমা আছে। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের ট্রানজাকশন সব খতিয়ে না দেখে কিছুই বলা ঠিক হবে না।

—আমরা যা দেখছি পাশবই থেকে তাতে বিবেক দ্বিবেদী দিল্লি যাওয়ার আগে গত কয়েকদিনে দফায় দফায় টাকা তুলেছেন। বেশ মোটা অঙ্কের টাকা। কখনও পনেরো হাজার, কখনও কুড়ি হাজার, কখনও বারো হাজার ইত্যাদি। কিন্তু জমার অঙ্কে নি—ল।

অলীকশেখর এবার ধৈর্য হারিয়ে বললেন, দেখুন, বিজনেসে এরকম ট্রানজাকশন হয়েই থাকে। একটা কোম্পানির ব্যালান্স শিট না-দেখে কিছুই বলা যাবে না। আপনারা বরং একটা ইনভেস্টিগেটিং টিম পাঠান। তারা কোম্পানির সবকিছু খুঁটিয়ে দেখুক। তার পরেই বরং ভাবা যাবে কোম্পানির দশা কেন এরকম হল। আমার নিজেরও জানতে ইচ্ছে কীভাবে একটা রোরিং বিজনেসের এভাবে পতন হতে পারে। এত পদস্খলন।

টেলিফোনের ও-প্রান্তের স্বর কিছুক্ষণের জন্য মৌন। অলীকশেখর ধৈর্য হারিয়ে বললেন, আশা করি আপনার আনাড়ি ধরনের প্রশ্নাবলির হাত থেকে এবার রেহাই পাওয়া যাবে। আমার আরও অনেক কাজ আছে। আশা করি বুঝতে পারছেন।

অলীকশেখরের অভাবিত আক্রমণে পুলিশ অফিসারটি হঠাৎ বললেন, অলীকশেখরবাবু, আপনি নিশ্চয় বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারছেন। ইতিমধ্যে আমাদের কাছে যে অসংখ্য অভিযোগ আসছে তার যদি যাথার্থ্য থাকে তা হলে কিন্তু মিসেস দ্বিবেদীর কপালে অনেক দুঃখ আছে। দুটো ব্যাঙ্ক থেকে মোটা টাকার লোন নেওয়া ছাড়াও বিবেক দ্বিবেদী যে কতজনের কাছ থেকে পার্সোনাল লোন নিয়েছিলেন তার পরিমাণ হিসেব করে আমরা স্তম্ভিত।

অলীকশেখর যেন কোনও গুরুত্বই দিলেন না পুলিস অফিসারটির কথায়, বললেন, ল উইল টেক ইটস ওন কোর্স। একজন বিজনেসম্যান খুন হয়েছে তারও যেমন তদন্ত হবে, তার কোম্পানি কেন ডকে উঠল তারও তদন্ত হওয়া উচিত।

ওপাশ থেকে টেলিফোনের যোগাযোগ ছিন্ন হতেই অলীকশেখর মুখ বিকৃত করে নিজের মনে কিছু বললেন নিচু গলায়, রিসিভারটি যথাস্থানে রেখে দিয়ে কাগজের পৃষ্ঠায় পুনর্বার মন দিয়েছেন অমনি আবার ফোন, বিরক্তির রেখাগুলি আবারও বিজবিজ করে উঠল মুখে ও কপালে, কিন্তু ওপাশ থেকে কারও গলা শুনে বিরক্তি নিশ্চিহ্ন হয়ে ফুটে উঠল পরম প্রশান্তি, 'ওহ্, তুমি! তোমার গলার স্বর শুনলেই মনে হয় পৃথিবীর আলো-বাতাস তাই এত মধুর। পৃথিবীর রূপ রস গন্ধ এত মনোরম। পৃথিবীর—

আর কী ভালো ভালো কথা বলা যায় তা সেই মুহূর্তে মাথায় এল না অলীকশেখরের। বললেন, ঠিক আছে, আমি এখনই যাচ্ছি তোমার ওখানে। ভালো একটা স্কচ এনে দিয়েছিলাম পরশু, রেডি করে রাখো।' বলেই রিসিভার রেখে হাঁক দিলেন, অলিন, অলিন—

মধ্যবয়স্ক লোকটি দ্রুত এসে যায় তাঁর ইজিচেয়ারের পাশে, বাবু—

—রওশনকে বল তো গাড়ি লাগাতে।

—বলছি, বাবু।

অলিন অমনি ছুটল সিঁড়ি বেয়ে নীচের দিকে। অলীকশেখর ইজিচেয়ারের দুই হাতল থেকে পা নামিয়ে উঠতে যাচ্ছিলেন তৈরি হওয়ার জন্য, কিন্তু যেই মাত্র উঠে দাঁড়িয়েছেন, আবারও একটি টেলিফোন আসায় তাঁর যাওয়া স্থগিত রাখতে হল, রিসিভার তুলে বললেন, হ্যাঁ, বলুন।

ওপাশে তাঁর পার্সোনাল সেক্রেটারি রামেন্দু মুৎসুদ্দির গলা, স্যার, গতকাল আপনার পার্সোনাল নামে যে-অ্যাকাউন্টটি আছে, সেই অ্যাকাউন্ট থেকে একটা চেক ক্লিয়ার্‌ড্ হয়েছে, একষট্টি লাখ টাকার। কিন্তু চিফ অ্যাকাউন্টস অফিসার বলছেন তিনি চেকবইয়ে এই চেকটির কোনও হদিশ পাচ্ছেন না।

—একষট্টি লাখ? অলীকশেখর কিছুক্ষণ এলোমেলো হয়ে গেলেন একষট্টি লাখের ভাবনায়।

—স্যার, এরকম কোনও চেক কি পার্টিকে আপনি ইস্যু করেছেন?

কোম্পানির এই অ্যাকাউন্টটি ঠিক ব্যবসার কারণে রাখা হয়েছে তা নয়। এতগুলি কোম্পানির মালিক হওয়াতে প্রায়ই তাঁকে নানা কারণে বিভিন্ন ফান্ডে অর্থদান করতে হয়। কখনও কোম্পানির গুডউইল বাড়াতে কোনও দুঃস্থ সংস্থা বা দুঃস্থ ব্যক্তিকেও অর্থ সাহায্য করতে হয়। অনেক সময় ট্যাক্স বাঁচাতে নানা প্রতিষ্ঠানে চেক কেটে দেন যাতে সেই অঙ্কের টাকা ট্যাক্স থেকে বাদ দিয়ে হিসেব করতে পারে অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট। সপ্তাহের শেষদিনে চেকবই সঙ্গে করে বাড়িতে নিয়ে আসেন যদি ছুটির দিনে কাউকে চাঁদা দিতে হয় বা দান করতে হয়। আবার সপ্তাহের প্রথমদিনে চেকবইটি হিসেব-সহ ফেরত দেন চিফ অ্যাকাউন্টস অফিসারের কাছে। এই ব্যবস্থাই চলে আসছে বহু বছর, কখনও এর ব্যত্যয় হয়নি।

অর্থনৈতিক সংক্রান্ত কোনও বিষয়ে অলীকশেখরের স্মৃতিশক্তি অসাধারণ, কিন্তু আজ তিনি কিছুতেই মনে করতে পারলেন না গত কয়েকদিনের মধ্যে এত টাকার কোনও চেক কেটেছেন কি না, না করাই সম্ভব। বললেন, কাকে ইস্যু করা হয়েছে চেকটা?

—পার্টির নাম জোগাড় করেছি ব্যাঙ্ক থেকে। কোনও এক 'সারমন বিশপ'স' নামে ইস্যু হয়েছিল চেকটি।

--সারমন বিশপ'স! ইমপসিবল। অলীকশেখরের ভিতরে ছটফট করে ওঠে দুশ্চিন্তার ঢেউ, বললেন, ভালো করে খুঁটিয়ে দেখতে বলো কাশ্যপবাবুকে।

—স্যার, চিফ অ্যাকাউন্টস অফিসার ভালো করে দেখে নিশ্চিত হয়েই জানিয়েছে আমাকে।

অলীকশেখর গুম হয়ে গেলেন কিছুক্ষণ, স্মৃতির ঝাঁপি ধরে নাড়া দিলেন এরকম কোনও ক্লায়েন্ট তাঁর চেনার পরিধির মধ্যে পড়ছে কি না। কিন্তু কিছুতেই কোনও বিশপের সন্ধান পেলেন না, তার সারমন তো দূরের কথা। জিজ্ঞাসা করলেন, কবে ইস্যু করা হয়েছিল চেকটি?

—স্যার, ফেব্রুয়ারির আঠারো তারিখে চেক কেটেছিলেন। সেটা ছিল ছুটির দিন। হলিডেতে আপনি অনেক সময় চেকবই বাড়িতে নিয়ে যান।

—তা নিয়ে যাই। কিন্তু ক্যাশ হয়েছে কবে?

—এই তো মাত্র দু-দিন আগে চেকটা জমা পড়েছে ক্লিয়ারিং-এ। ইস্যু করার প্রায় দু-সপ্তাহ পরে।

—চেকবইটা ভালো করে দেখুন তো। চেকবইয়ের প্রথমে ইস্যু হওয়া চেকের যে-তালিকা আছে তাতে এই চেকের উল্লেখ আছে কি না?

—নেই বলেই তো সি. এ. ও-র কনফিউশন হচ্ছে। ওই চেক নম্বরের লাস্ট ডিজিট ছয়। অথচ চেকবইয়ের ভিতরে ওই নির্দিষ্ট জায়গায় চেকটি নেই। লাস্ট ডিজিট পাঁচ এর পরেই সাত। মানে চেক কাটা হয়েছে কিন্তু তার রেকর্ড রাখা হয়নি চেকবইয়ের তালিকায়।

—সে কী! ইজ ইট এ কেস অফ থেফ্‌ট্‌ ?

—স্যার, চেকবইটা তো আমাদের অফিসে যথেষ্ট নিরাপত্তার মধ্যেই থাকে। তা ছাড়া প্রতিটি চেক আপনি সই করেন সব দেখেশুনে। আপনার সাবধানতার কথা জানে সবাই।

—তা হলে কি আমার বাড়ি থেকেই?

—কিন্তু আপনার বাড়ি থেকেই বা কী করে চেক চুরি হবে?

—ইমপসিবল। আমার শোওয়ার ঘরে বালিশের নীচে চেকবই রেখে ঘুমোই। ঠিক আছে, আমি কাশ্যপবাবুকে ফোন করে জেনে নিচ্ছি আরও ডিটেইলস।

ফোন রেখে দিয়ে অলীকশেখর অলিন মারফত নিয়ে এলেন তাঁর মভ-কালারের ডায়েরিটা। এই ডায়েরিতে খুব সংক্ষেপে লেখা থাকে সারাদিনে কোন কোন ক্লায়েন্ট দেখা করতে এসেছিল বা ফোন করেছিল। সেই ডায়েরি খুলে বার করলেন আঠারো তারিখের দিনলিপি যেদিন কাটা হয়েছিল চেকটি। কুচি কুচি অক্ষরে নোট করা মন্তব্য খুঁজে দেখলেন কোনও এক ফরাসি সংস্থার ফোন এসেছিল তাদের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যাওয়ার জন্য। কিন্তু তার কোনও ফলো আপ নেই ডায়েরিতে। কে ফোন করেছিল? তাকে কেনই বা একষট্টি লাখ টাকার চেক দেবেন?

পরক্ষণেই দেখলেন ডায়েরিতে বিবেক দ্বিবেদীর নাম। সে বলেছিল সংস্থাটিকে চেনে।

১০

মার্চের রোদ্দুর তেরচা হয়ে পড়ছে পিচরাস্তার উপর, যদিও রোদের হলকার তেজ আজ অন্যদিনকার তুলনায় যথেষ্ট কম। গার্গী দেখছিল ঘন নীল আকাশে কিছু সাদাটে মেঘের আনাগোনা। সেই কৌণিক রোদের উত্তাপ শরীরে নিতে নিতে গার্গী বলল, একটু নিউ আলিপুর হয়ে যাব, রতন।

অফিস যাওয়ার সময় এমনটি সচরাচর হয় না, তবু গার্গী তার গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে দিল নিউ আলিপুরের পথে। কসবা থেকে দূরত্ব হিসেবে খুব বেশি নয়, কিন্তু

সকালের এই শশব্যস্ত মুহূর্তে কলকাতার পথঘাট থাকে জ্যামজটলার তুঙ্গে। একটার পর একটা জটলা কাটিয়ে নিউ আলিপুরের বিশাল বাড়িটির সামনে এসে গাড়িটা ব্রেক করে দাঁড়ায়। গার্গী নেমে গেটের ভিতর দিয়ে ভিতরে অন্তরিন। পাশাপাশি দুটি বাড়ির তিনতলাটি অলীকশেখরের, দোতলাটি তিতিক্ষার। আজ সকালেই তিতিক্ষার সঙ্গে যেরকম কথা হয়েছে সেভাবেই তিতিক্ষার বাড়ির দিকেই পা বাড়ায় গার্গী।

গার্গী জানত তিতিক্ষা সকালের দিকে খুবই ব্যস্ত থাকবে তার প্রদর্শনীর ছবিগুলি নিয়ে। নীচের বারান্দায় সেই সব ছবি নিখুঁতভাবে প্যাকিং চলছে। তিনজন শার্টপ্যান্ট পরা লোক যথাযথ দক্ষতায় ছবিগুলির নিরাপত্তা বজায় রেখে কাজটি করছে দক্ষ হাতে। তাদের পেরিয়ে দোতলায় উঠে যায় তরতরিয়ে। উপরের বারান্দায় তখন তিতিক্ষা একটি গাঢ় হলুদরঙের হাউসকোটে নিজেকে মুড়ে তুলি চালাচ্ছে সামনের ক্যানভাসে। গার্গীকে দেখে তুলি থামিয়ে বলল, এসো, গার্গীদি। কী যে ঝামেলার মধ্যে পড়ে গেছি হঠাৎ।

ঝামেলা এখন যে তুঙ্গে তা গার্গীর চেয়ে কে বেশি আর জানে! তৎক্ষণাৎ কথার মোড় ঘোরায় অন্যদিকে, বলল, তোমার এতগুলি ছবি যে চট করে বিক্রি হয়ে যাবে তা তুমি তো নিজেও ভাবতে পারোনি, তাই না?

—পারিনিই তো। এর আগে যখন গ্রুপে একজিবিশন করেছি, তখন দুটো-একটা করে ছবি বিক্রি হয়েছে। বাড়িতেও দু-চারটে অর্ডার পেয়েছি। তবে বেশিরভাগ ক্রেতাই আমার চেনা কেউ। এবারে সোলো করে যে এভাবে বাল্‌ক্ অর্ডার পাব তা স্বপ্নেও ভাবিনি।

গার্গী লক্ষ করছিল তিতিক্ষার অভিব্যক্তি। গত কয়েকদিনে তার উপর দিয়ে যে এলোঝড় প্রবাহিত হয়েছে তা বোধহয় কাটিয়ে উঠতে পেরেছে একটু। আর তা সম্ভব হয়েছে তার সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত ব্যাপারটিই অচমকা ঘটে যেতে। যে কোনও নবীন শিল্পীরই একমাত্র ইচ্ছে থাকে একটি সোলো একজিবিশন করা, আর সেই একজিবিশন দেখে সমালোচকরা লিখবেন ভালো ভালো প্রশংসার কথা, আর নামিদামী ক্রেতারা কিনে নিয়ে যাবেন বহু কষ্টে আঁকা ছবিগুলি। সেই অভীষ্টে এত দ্রুত পৌঁছে যেতে তিতিক্ষার যে আনন্দ হয়েছে সে-কথাই তাকে বলে তার মনকে কিছুটা প্রফুল্ল করে তুলতে।

—তা হলে এতদিনে তোমার স্বপ্ন সার্থক হতে পারল?

—তা বলতে পারো, গার্গীদি, কিন্তু এখন আমার খুব মুশকিল।

তিতিক্ষার ভিতরে যে অসম্ভব দহন হচ্ছে তা গার্গী অনুমান করতে পারে, কিন্তু তার কথার গতিপথ কোনদিকে তা বুঝতে একটু সময় নেয়। কোনও কথা বলার

আগেই তিতিক্ষা বলল, ছবিগুলো কয়েকদিন প্রদর্শনীতে থেকে কোথাও কোথাও একটু ম্যাড়মেড়ে হয়ে গেছে, কোথাও চটলা উঠে গেছে। এখন তার কোনও কোনও ছবিতে এক-আধটু টাচ না-করে দিলেই নয়। ওদিকে প্যাকিং চলছে, এদিকে আমাকে তুলিতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম টাচ দিয়ে ছবিগুলিকে আগের মতো করে তুলতে হচ্ছে।

—তা হলে তো খুব ভুল সময়েই চলে এসেছি। এখন তুমি এত ব্যস্ত।

—না না, গার্গীদি, আমি কাল প্রায় সারা রাত ধরে কাজ করেছি।

বলে তিতিক্ষা হাসল মিষ্টি করে। সেই হাসির মধ্যে কোথাও লুকিয়ে আছে একটুকরো বিষণ্ণতা। তবু মাত্র কয়েকদিনেই তিতিক্ষা যে কিছুটা সামলে উঠেছে তার শোক এটাই সান্ত্বনা। তিতিক্ষার মুখময় বিষণ্ণতা ঝুলে থাকার কারণেই তাকে কি আরও সুন্দর লাগছে আজ! আসলে তিতিক্ষা এতটাই সুন্দরী যে তার যে-কোনও অভিব্যক্তিই রচনা করে এক অন্য সৌন্দর্য।

পরক্ষণে তিতিক্ষা বলল, আর এই একটা ছবিই বাকি। ছোটো ছোটো টাচ তো। বেশিক্ষণ লাগবে না। তুমি যদি মিনিট পাঁচেক বোসো তো আমি কাজটা শেষ করে ফেলি।

—ও শিওর। গার্গী সোফায় বসেছিল, উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ততক্ষণে আমি তোমার ঘরের এই ফার্নিচারগুলো দেখি। যা চমৎকার সব আসবাবপত্র কিনেছ দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

সোফায় গা এলিয়ে বসে গার্গী এতক্ষণ দেখছিল দেশবিদেশের পাত্র সংগ্রহের অভিনবত্ব। ঘটিবাটিগেলাসের সংগ্রহই বেশি। কোনওটা রুপোর, কোনওটা পিতলের, কোনওটা ব্রোঞ্জের। সেই সঙ্গে পাত্রগুলির উপরকার কারুকাজ মুগ্ধ হয়ে দেখার মতো। বিশেষ করে পানপাত্রের সংগ্রহ দেখলে চক্ষু একলাফে মগডালে। সেই সংগ্রহগুলি দেখতে থাকে সারা ঘর ঘুরে ঘুরে। প্রতিটি সংগ্রহের নীচে লেখা রয়েছে পাত্রটি কেনা হয়েছে কোন দেশ থেকে ও কবে। একটা পাত্রের নীচে লেখা রয়েছে এস্কিমোদের দেশের নাম।

তিতিক্ষা তুলিতে মন দিয়েছিল, মুখ তুলে গার্গীর শেষ কথাটার রেশ টেনে নিয়ে বলল, আর চোখ জুড়োনো! যার ব্যবসা লাটে উঠছে তার কী করে এমন সব খেয়াল মাথায় চাপে বলো তো!

—মানুষের খেয়াল সব সময়েই বিচিত্র। কোন মানুষের মনে কী খেয়াল চাপে তা সে নিজেও হয়তো বুঝতে পারে না। যেমন সেদিন এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে আলাপ হল যাঁর হবি হল নানা আকারের গণেশ জমানো। তাঁর বাড়িতে নাকি তিন হাজারেরও বেশি গণেশের মূর্তি আছে। বিশাল প্রমাণ সাইজের যেমন আছে, তেমনই গণেশের বাহন ইঁদুরের চেয়েও ছোটো আকারের আছে।

তিতিক্ষা ক্যানভাসের উপর ঝুঁকে পড়ে তার ছবিতে সূক্ষ্ম কারুকাজ করছিল, তুলি তুলে বলল, গার্গীদি, আমার এক বন্ধু আছে যার হবি পেঁচা জমানো। তার বাবা ছিলেন পুলিশ অফিসার। কত রকম যে পেঁচা হতে পারে তার বাড়ির পেঁচাঘরে না ঢুকলে বিশ্বাসই হবে না। খবরের কাগজে লেখালিখিও হয়েছে তার পেঁচা জমানোর কাহিনি নিয়ে।

বলেই তিতিক্ষা আবার ঝুঁকে পড়ল ক্যানভাসের উপর। তিতিক্ষার ঝুঁকে পড়ে নিবিষ্ট হয়ে কাজ করার ভঙ্গিমাটি দেখছে গার্গী, সহসা তার খেয়াল হয় তিতিক্ষার গাঢ় হলুদ রঙের হাউসকোটের সামনের দিকের বোতাম খোলা থাকায় তার সমৃদ্ধ স্তনের কিয়দংশ দৃশ্যমান। তার ফর্সা শরীরের সঙ্গে হাউসকোটের রং মিলেমিশে সৃষ্টি হয়েছে এক অপূর্ব দৃশ্যের। হয়তো তিতিক্ষার অনবধানতায় বোতামটি খুলে গেছে, এই মুহূর্তে কোনও পুরুষের উপস্থিতি হত অস্বস্তিকর। গার্গী কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকে তিতিক্ষার মনঃসংযোগে চিড় ধরতে পারে এই ভাবনায়। তার হাতে একটি সরু তুলি, পাশে রাখা প্যালেট থেকে রং চুবিয়ে নিচ্ছে যখন যেরকম দরকার। গার্গী দেখছিল তিতিক্ষার আঁকা এই ছবিটি আগে কখনও দেখেনি। একক প্রদর্শনীতে যে-ছবিগুলি ছিল তার মধ্যে এই ছবিটি ছিল না, হয়তো পরে এঁকেছে। কিন্তু ছবিটি নিবিষ্ট হয়ে দেখতে দিয়ে গা শিরশির করছিল গার্গীর। অন্ধকারের পটভূমিতে একটি বিশাল পরিত্যক্ত অট্টালিকা, দেখতে ভূতুড়ে ধরনের, তার পিছনে একটি বিশাল ঝাঁকড়া অশত্থগাছ। গাছটির অবস্থান এমনই যে, তার পাতাডালপালা দিয়ে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বেষ্টন করে আছে অট্টালিকাটিকে। তার দোতলার বারান্দায় ভাঙা রেলিং ধরে ঝুঁকে রয়েছে এক প্রায়-ভূতুড়ে স্বাস্থ্যবতী যুবতী, তার চোখদুটিতে মণি নেই, সাদা ধবধবে, তাতেই ছমছম করছে শরীর। কিন্তু তার উর্ধ্বাঙ্গের যেটুকু দৃশ্যমান সবটাই অনাবৃত। নগ্ন নারীশরীর আঁকা শিল্পীদের প্রিয় বিষয়। এমনকী মহিলাশিল্পীরাও পছন্দ করেন নগ্নিকা আঁকতে। কিন্তু এই ছবিটির বিশেষত্ব হল নগ্নিকার স্তনদুটি অস্বাভবিক বড়ো যা বাস্তবে সম্ভব নয়।

গার্গী খেয়াল করল কথা শেষ করেই তিতিক্ষা নগ্ন যুবতীর কাঁধের উপর বসিয়ে দিল একটি অদ্ভুত ধরনের পেঁচা। পেঁচাটির ঠোঁট দেখে ভ্রম হতে পারে পেঁচাটি হাসছে। গার্গী অবাক হচ্ছিল তিতিক্ষার কাণ্ডকারখানায়। একটু আগেই গার্গীর সঙ্গে কথা বলছিল তার বন্ধুর পেঁচা-সংগ্রহের বিষয়ে, হঠাৎ কী খেয়াল হল কথা বলতে বলতেই সে নগ্ন যুবতীর কাঁধে পেঁচার অবস্থান ঘটিয়ে দিল ঠোঁটের ডগায় কৌতুক ঝুলিয়ে।

আর কী আশ্চর্য, গার্গীর মনে হচ্ছিল তিতিক্ষার ছবিটির রহস্যময়তা যা তার এই সিরিজের প্রধান আকর্ষণ, পেঁচাটি আঁকার কারণেই, তা বেড়ে গেল অনেকখানি।

বিস্ময়াহত গার্গী লক্ষ করতে থাকে ছবিটি যতক্ষণ না তিতিক্ষার আঁকার কাজ শেষ হয় ও প্যালেটে তুলি রেখে উঠে পড়ে। হাতদুটো ঝাঁকিয়ে বলল, যাক, গার্গীদি, এখন আমি নিশ্চিন্ত। শ্রাবণকুমারের কোনও রিপ্রেজেন্টেটিভ যে কোনও মুহূর্তে এসে পড়বে, তার আগেই যে আমি কাজটা শেষ করতে পারলাম—

গার্গী অনেকখানি সময় অপেক্ষা করছে অকাজে, এখন তিতিক্ষার ফুরসত হতেই সোফায় বসে বলল, তা হলে আমার কয়েকটা জিজ্ঞাস্য আছে আমি দ্রুত সেরে নিই।

—হ্যাঁ, বলো এবার, বলে তিতিক্ষা তার দু-হাত তুলে বেঁধে নিল এলো হয়ে থাকা চুলের গোছা, তাতে তার বোতাম-খোলা হাউসকোট কিছুক্ষণের জন্য প্রকাশিত করে তার ভরাট স্তন, গার্গী সেদিকে একলহমা চোখ রেখে বলল, তিতিক্ষা, তুমি কি এর মধ্যে বিষয়টি নিয়ে কিছু ভেবেছ?

তিতিক্ষা এতক্ষণ ঘোরের মধ্যে ছিল, সংবিৎ ফিরতে বলল, কী বিষয়, গার্গীদি?

—এ ক-দিনে বুঝেছি তোমাদের মাথার উপরে বহু টাকার ঋণ।

তিতিক্ষা বাধা দিয়ে বলল, তোমাদের উপর নয়, বলুন তোমার উপর। এখন যাবতীয় ঋণ শোধ করার দায় আমার একার উপরেই।

—হ্যাঁ। তাই দাঁড়িয়েছে এখন। কিন্তু ঠিক কত টাকার ঋণ তা হিসেব করেছ কি?

তিতিক্ষা কিছুক্ষণ অনড়। সকাল থেকে ছবি আঁকার ব্যস্ততায় ও নিবিষ্টতায় তার মুখের দীপ্তি ছিল অন্যরকম, তাতে মিশে ছিল স্রষ্টার আনন্দ, হঠাৎই সেই প্রভায় ঘনিয়ে এল আঁধার। বলল, না, করিনি এখনও।

তিতিক্ষার গলায় প্রবল ভীতির আভাস, বলল, আসলে কি জানেন, ব্যাপারটা ভাবতেই ভয় পাচ্ছি। কত টাকার ঋণ তা বিবেক নিজেও হয়তো হিসেব করেনি। কোম্পানিকে বাঁচানোর তাগিদে পাগলের মতো লোন নিয়ে গেছে যেখানে পাওয়া সম্ভব।

—কিন্তু পুলিশ ইতিমধ্যেই একটা হিসেব করেছে যার অঙ্ক আড়াই কোটি পেরিয়ে গেছে—

তিতিক্ষা দাঁড়িয়ে ছিল, হঠাৎই টাল খেয়ে গেল তার শরীর, আর একটু হলেই পড়ে যাচ্ছিল, গার্গী চট করে উঠে সময়মতো ধরে না ফেললে—

তিতিক্ষা সোফায় বসে নিজেকে সামলাতে সময় নিল কিছুটা, বলল, গার্গীদি, ও আমাকে একদম পথে বসিয়ে দিয়ে গেছে।

গার্গী লক্ষ করছিল তিতিক্ষার অভিব্যক্তি। এ ক-দিনের মধ্যে বিবেকের মৃত্যুশোক সামলে তিতিক্ষা উপলব্ধি করেছে বিবেক চারদিক থেকে কী পরিমাণ টাকা নিয়েছিল ঋণ হিসেবে, এখন সেই টাকা শোধ করার দায় একমাত্র তারই।

—গার্গীদি, আমি বুঝে উঠতে পারছি না এত টাকা কী করে শোধ দেব একা-একা! পার্সোনাল লোন যে কতজনের কাছে!

—আচ্ছা, তিতিক্ষা, ব্যাঙ্ক লোন থাকতে এত পার্সোনাল লোন নিতে হয়েছিল কেন?

—কিছু উপায় ছিল না, গার্গীদি। ওভারড্রাফটের কোটাও যখন শেষ হয়ে গেল তখন এর ওর কাছে চাইতে হয়েছিল ধার।

—সবই কি তোমাদের নিজের লোক?

—কিছু লোন নিয়েছিলাম আত্মীয়পরিজনদের কাছে, যাঁরা চাওয়ামাত্র ধার করে দিয়েছিলেন তখন। কিছু টাকা বন্ধুবান্ধবও দিয়েছেন।

—তাঁরা তো সবাই এখন ফেরত চাইবেন?

—তা তো চাইবেনই।

বলে কিছুক্ষণ কী এক ভাবনায় আবর্তিত হয়ে তিতিক্ষা বলল, গার্গীদি, তুমি তো জানো, আমার এই ছবিগুলো বিক্রি হয়ে গেছে। বিক্রির টাকা বেশ মোটা অঙ্কের। হয়তো আজই পাব টাকাটা। তা থেকে বেশ কিছু পার্সোনাল লোন মেটাতে পারব।

গার্গী সেদিন থেকে একটি কূট ভাবনায় আবৃত রেখেছে নিজেকে। তিতিক্ষার বাবা অলীকশেখর জামাইয়ের উপর বিন্দুমাত্র সন্তুষ্ট ছিলেন না, তবু তার পায়ের তলায় মাটি খুঁজে দিতে অনেকখানিই চেষ্টা করেছিলেন, শেষে বুঝেছিলেন তাঁর জামাইয়ের আর যে বুদ্ধিই থাকুক, ব্যবসা চালানোর বুদ্ধি নেই। শেষদিকে তিনি হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন মেয়ের ভবিতব্য বিষয়ে। তিনি একটু উদ্যোগ নিলে হয়তো বিবেককে জীবন্ত উদ্ধার করা যেত । কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক নেননি। এখন তার মৃত্যুর পর বিবেক এত ঋণ রেখে গেছে তিতিক্ষার কাঁধে, সেই ঋণের দায় কি অলীকশেখর নেবেন!

গার্গী ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই কথাটাই বলতে চাইছিল তিতিক্ষাকে। বলল, তুমি এ বিষয়ে তোমার বাবার সঙ্গে আলোচনা করেছ?

তিতিক্ষা জোরে জোরে ঘাড় নেড় বলল, না, করিনি। আমি আমার বাবাকে চিনে গেছি এ ক-দিনে।

বলতে বলতে তিতিক্ষার গলা ধরে আসে। একটু পরে কেঁদেও ফেলে হাউমাউ করে। কাঁদতে কাঁদতে জানায় বিবেক কীভাবে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ল ব্যবসা করতে গিয়ে। শ্বশুরের দেওয়া টাকায় তার কম্পানি দাঁড় করানোর চেষ্টায় যেখান থেকে যে-অর্ডারই পেয়েছে চেষ্টা করেছে ঠিকমতো সাপ্লাই করতে। কিন্তু বিবেকের বরাত এমনটাই যে, বেশিরভাগ সাপ্লাইয়ের পেমেন্ট পায়নি। তার ফলে শ্বশুর

বরাবর জামাইকে অবজ্ঞা করেছে, তার বুদ্ধিহীনতার কথা তুলে তাকে হেয় করার চেষ্টা করেছে। বিবেক তাতে খুব ভেঙে পড়েছিল শেষদিকে। তখন তার একমাত্র চেষ্টা কত দ্রুত উন্নতি করা যায়। তার ফলে জড়িয়ে পড়েছে আরও লোকসানের ফাঁদে। তখন তার আর ফেরার কোনও উপায় ছিল না।

তিতিক্ষার চোখের জল দেখে বিষণ্ন হয়ে গেল গার্গী। মানুষের ভাগ্য মাঝেমধ্যে তাকে কোন গন্তব্যে উপনীত করবে কেউ বলতে পারে না। বড়োলোকের সুন্দরী কন্যা প্রেমিক নির্বাচনের ভুলে এখন গভীর সংকটে। সেই সংকটের কথাই মনে করিয়ে দিল গার্গী, বলল, তিতিক্ষা. তোমার পার্সোনাল লোন যেমন আছে, তেমনই মোটা টাকার ব্যাঙ্ক লোন। পার্সোনাল লোনের চাপ একরকম, ব্যাঙ্ক লোনেব চাপ অন্য রকম। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ টাকা না পেলে তোমার বিরুদ্ধে মামলা করবে। হয়তো বসতবাড়ি অ্যাটাচ করে দেবে কোর্ট।

তিতিক্ষার বড়ো বড়ো চোখে কিছুক্ষণ বিমূঢ় চাউনি। বাড়ি অ্যাটাচ করার অর্থ সে ভালোই জানে।

—তিতিক্ষা, তোমার কাছে এর মধ্যে পুলিশ এসেছিল নিশ্চয়?

—আসেনি আবার! আসছে। ঘন ঘন ফোন করছে। জিজ্ঞাসা করে আমার নাড়িভুঁড়ি টেনে বার করতে চাইছে। কিন্তু এখন ও সব কথা জেনে কী হবে? বিবেককে তো আর ফিরিয়ে দিতে পারবে না ওরা।

—হুঁ। তুমি কিছু ক্লু দিতে পেরেছ?

—ক্লু? তিতিক্ষা বুঝতে চাইল গার্গীর জিজ্ঞাস্য।

—তিতিক্ষা, বিবেককে কে বা কারা অপহরণ করেছিল ও কেনই বা তাকে মার্ডার করেছে তার অনুসন্ধান করবে পুলিশ। পুলিশকে সাহায্য করা তোমার প্রধান কর্তব্য।

তিতিক্ষা ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল, আমি কতটুকু আর জানতাম ওর ব্যবসা সম্পর্কে! যতটুকু জানা আছে আমি পুলিশকে বলেছি। কিন্তু পুলিশ খুশি হতে পারেনি। বলছে, আপনি সব কথা আমাদের বলছেন না। বিশ্বাস করো, গার্গীদি, আমি সত্যিই খবর রাখতাম না ওর ব্যবসায়ে কারা কারা জড়িত ছিল, কাদের কাছে মাল সাপ্লাই করত। আমি আমার ছবি আঁকা নিয়েই ব্যস্ত থেকেছি সারাক্ষণ।

গার্গী লক্ষ করছিল তিতিক্ষার অভিব্যক্তি।

—গার্গীদি, আমি যদি ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারতাম আমার এই অজ্ঞতার কারণে আমাকে এতখানি মূল্য দিতে হবে এখন তা হলে আমি পাই টু পাই খবর জেনে নিতাম রোজ।

তিতিক্ষার গলা ধরে আসে পুনর্বার।

—তিতিক্ষা, তোমাদের কোম্পানির অফিসটা একবার দেখব।

—কোম্পানির অফিস! তিতিক্ষার গলায় বিস্ময়। বলল, সে তো আমাদের একতলার ওই ঘরটায়।

—কোন ঘরটায় ?

—চলুন, আপনাকে দেখাই।

তিতিক্ষা পরক্ষণে সিঁড়ি বেয়ে তরতরিয়ে একতলায় নেমে আসে গার্গীকে সঙ্গে নিয়ে। তার ব্যাগ থেকে একটা চাবি বার করে খুলে ফেলে আঠারো বাই বারো সাইজের একটা ঘর। তার একদিকে একটি হাফ সার্কুলার বাহারি টেবিল। টেবিলের উপর কাচ বিছোনো। এক কোণে একটি সুদৃশ্য লালরঙের টেলিফোন। একটি পেনস্ট্যান্ড, তার মধ্যে দুটি মাঝারি দামের ডটপেন। পেনস্ট্যান্ডের পাশে একটা পিনকুশন, একটা স্টেপলার, কয়েকটা পেপারওয়েট। টেবিলের পিছনে আরও বাহারি একটা চেয়ার। ঘরের কোণে একটা স্টিল আলমারি।

—অফিস বলতে এটুকুই? গার্গী জিজ্ঞাসু চোখে তাকায় তিতিক্ষার দিকে।

—আমি তো তাই জানি।

—কতজন কাজ করত কম্পানিতে?

—কতজন আবার! ওই একজন ম্যানেজার ছিলেন যিনি হিসেবনিকেষ রাখতেন বলে জানতাম।

—তিনি কোথায়?

—তাঁকে তো ছাড়িয়ে দিলাম। বললাম, কোম্পানিই নেই তো আপনি আর থেকে কী করবেন?

গার্গী ব্যস্ত হয়ে বলল, তাঁকে একবার ইন্টারোগেট করার প্রয়োজন।

তিতিক্ষা বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল, তাঁর ঠিকানা আমি পুলিশ অফিসারকে সেদিন দিয়েছিলাম। তিনি আমাকে ফোন করে জানালেন ওই ঠিকানায় জনার্দনবাবু আগে থাকতেন। অনেকদিন হল ছেড়ে দিয়েছেন বাড়িটা।

গার্গী হতাশ হয়ে বলল, তা হলে বিবেকের কোম্পানির বিষয়ে আর কিছুই জানা যাবে না!

১১

বিবেক দ্বিবেদীর কম্পানির হালহকিকত কিছুটা জেনে ও অনেকটাই না-জেনে গার্গী রীতিমতো হতচকিত। অনুমান করা যায় তিতিক্ষা কিছুই খবর রাখত না তার স্বামীর ব্যবসার। শিল্পীমানুষদের নিয়ে এই হয় বিপত্তি। বিবেক কাদের সঙ্গে কী ব্যবসা করত, কত টাকার লেনদেন হত তা যেমন খবর নেয়নি, তেমনি জানেনি ব্যাঙ্ক থেকে একের পর এক লোন নিয়েছে, ওভারড্রাফট নিয়েছে তার বৃত্তান্ত। সে-

টাকাতেও কোম্পানির ব্যবসা না-চলায় বহু পার্সোনাল লোন নিয়েছে ও এভাবেই বিবেক ডুবে গিয়েছে অপর্যাপ্ত ঋণের ভারে। এখন তার মৃত্যুর পরে তিতিক্ষার সামনে সেই ঋণ শোধ করার দায়।

বিবেককে কে বা কারা হত্যা করেছে তাও যেমন অনুমান করা যাচ্ছে না, বোঝা যাচ্ছে না বিবেকের কম্পানির কর্মকাণ্ডও। মাত্র একটি ম্যানেজার রেখে বিবেক দ্বিবেদী কীরকম ব্যবসা চালাত তাও অনুমান করা দুঃসাধ্য। সমস্ত বিষয়টিই এখন বেশ রহস্যে আবৃত। তিতিক্ষার সরল মুখের দিকে তাকিয়ে ভারী মায়া হল গার্গীর। বেচারি তার নিজের ছবি আঁকাআঁকির জগতে ব্যস্ত থাকে সারাদিন। ছবি আঁকার নিবিষ্টতার ফুরসতে সে অনুমানও করতেও পারেনি কখন সরে গেছে তার পায়ের তলার কার্পেট।

বিবেকের কোম্পানির হাল দেখিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এসে তিতিক্ষা বলল, 'জানেন, আমি কতদিন বলেছি এভাবে নিজে সব করছ, শেষে সামলাতে পারবে তো?' তো বলত, 'আমার কাজ তো সাপ্লাইয়ের। টেলিফোনে অর্ডারি ধরব, আর সেই মাল সাপ্লাই করব টেলিফোনে।আমার কাজ শুধু মধ্যস্থতার। শুধু খাতায় হিসেব রাখার জন্য একজন ম্যানেজার থাকলেই যথেষ্ট।'

গার্গী তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু শুনেছিলাম একটা বড়ো কারখানা করছে বিবেক, অনেকগুলো শেড তৈরি করেছে কারখানার কাজকর্ম বাড়াতে!

—ওই কাঠামোটাই করেছিল, তার ভিতরে কিছু নেই। প্রথমে ঠিক করেছিল নিজেই প্রোডাকশন ইউনিট করবে। ব্যাঙ্কে যে-প্রোজেক্ট জমা দিয়েছিল তাতে প্রোডাকশনের কথাই লেখা ছিল, ইউনিট তৈরিও করেছিল সেইমতো, পরে বুঝল এক্সপোর্টের লাইনে গেলে ঝক্কি কম। বলল, বিশাল ফ্যাক্টরি করে গুচ্চের লোক রেখে প্রোডাকশন করলে হয়তো লাভ একটু বেশিই হয়, কিন্তু তাতে যা ঝক্কি তা আমার পোষাবে না। আজ লেবার ট্রাবল তো কাল র-মেটিরিয়ালের সাপ্লাই নেই। তার চেয়ে এক্সপোর্টের লাইনে লেবার ট্রাবলের বালাই নেই। শুধু অর্ডারি জোগাড় করো আর সাপ্লাই করো।

গার্গী কথা বলছিল, আর দেখছিল তিতিক্ষার চেয়ারে হতাশ হয়ে বসে থাকার দৃশ্য। অসাধারণ সুন্দরী বলে তার বিষণ্ণ মুখের অভিব্যক্তিও দু-দণ্ড তাকিয়ে দেখার মতো। তার উপর গাঢ় হলুদ রঙের হাউসকোটে তাকে দেখাচ্ছে প্রায় সম্রাজ্ঞীর মতো। এরকম একটি মেয়ের বরাতে এমন একটি দুর্ঘটনা জড়িয়ে ছিল ভাবতেই অবাক লাগছে গার্গীর।

তাদের কথা বলার মধ্যেই বাইরে কলিং বেল শুনে কাজের মেয়েটি ছুটে গেল নীচে। ঝিমলির কর্মতৎপরতার দৃশ্য আগের দিনই দেখেছিল গার্গী। তিতিক্ষাকে আগলে রাখে সারাক্ষণ। আজও সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাকে নিয়ে তরতরিয়ে উপরে উঠে এল তিনি এক বত্রিশ-তেত্রিশের যুবক। বেশ হ্যান্ডসাম চেহারা, লম্বায় পাঁচ সাত-টাত হবে, খুবই স্মার্ট ভঙ্গিতে পকেট থেকে একটি কার্ড বার করে তিতিক্ষার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, আমি নিশ্চয় দি গ্রেট আর্টিস্ট তিতিক্ষা দ্বিবেদীর সঙ্গে কথা বলছি।

তিতিক্ষা এ ধরনের কথনভঙ্গির সঙ্গে বোধহয় পরিচিত, উঠে দাঁড়িয়ে যুবকটির বাড়ানো হাতে হাত ছুঁইয়ে বলল, হ্যাঁ, বসুন।

—আমি নীলার্ণব কাশ্যপ। বুঝতেই পারছেন আমি শ্রাবণকুমারের কাছ থেকে আসছি।

নীলার্ণব সামনের সোফায় বসতেই গার্গী উসখুস করে ওঠে হঠাৎ। সে বুঝে ফেলল তার পক্ষে আপাতত কথা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না, চলা উচিতও নয়, কেন না এখন তিতিক্ষার ছবি সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু বৈষয়িক কথা হবে শ্রাবণকুমারের প্রতিনিধি মানে নীলার্ণব কাশ্যপের সঙ্গে। এই পরিস্থিতিতে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে তার উপস্থিতি হয়তো পছন্দ করবে না দু-পক্ষই। যুবকটির দিকে তার চোখ ছুঁয়ে, মনে মনে তাকে একবার মেপে নিয়ে তিতিক্ষার দিকে তাকিয়ে বলল, তিতিক্ষা, তা হলে আমি এখন আসি?

—তুমি যাবে, গার্গীদি? একটু বোসোই না, নীলার্ণব এসেছেন আমার ছবিগুলি একবার দেখে নিয়ে ডেলিভারি নিতে। আর নীলার্ণব, ইনি গার্গী চৌধুরি—

বলে তিতিক্ষা তার সম্পর্কে প্রচুর বিশেষণসহ প্রশংসা উজাড় করে দিয়ে বলল, গার্গীদি আমার শুভানুধ্যায়ী। এই মুহূর্তে আমার ফ্রেন্ড অ্যান্ড গাইড।

গার্গী প্রতি-নমস্কার করে বলল, আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুশি হলাম।

নীলার্ণবের সৌজন্যবোধ অসাধারণ, উঠে এসে গার্গীর সামনে বাও করে বললেন, আপনাকে প্রথম দর্শনেই চেনা উচিত ছিল আমার। আপনার চোখমুখ এতটাই বুদ্ধিদীপ্ত যে, বহু ভিড়ের ভিতরেও আপনাকে আলাদা পরিচয়ে আইডেন্টিফাই করে ফেলা সম্ভব। আমি এতটাই আহাম্মক যে, আমার চিনতে দেরি হয়ে গেল আপনাকে।

গার্গী নীলার্ণবের প্রশংসাবাক্য হজম করল নিঃশব্দে, হেসে বলল, আসলে তিতিক্ষা আমাকে খুব পছন্দ করে বলেই —

—ঠিক আছে, ম্যাডাম, আপনি নিশ্চয় জানেন মরিশাসে আমাদের নতুন হোটেলে মিসেস দ্বিবেদীর পেইন্টিং দিয়ে সাজাতে মনস্থ করেছি। হোটেল এমনই

একটি ব্যবসায় যেখানে বোর্ড আর লজিঙের আরামের সঙ্গে হোটেলের বাইরের ও ভিতরের সাজপোশাক, রুচিবোধ—এগুলোও কাউন্ট করে বোর্ডাররা।

গার্গী ঘাড় নেড়ে সায় দিতেই নীলার্ণব আবার বললেন, মিসেস দ্বিবেদীর পেইন্টিং দিয়ে আমাদের হোটেল সাজানো হলে আমরা নিশ্চিত বোর্ডাররা সারাক্ষণ ছবি দেখেই কাটাতে চাইবেন হোটেলে থাকাকালীন। এত অ্যাট্রাকটিভ আর বিউটিফুল—

তিতিক্ষা নিজের প্রশংসায় অভিভূত হচ্ছিল, লজ্জাও পাচ্ছিল, দু-হাত তুলে তার অবিন্যস্ত চুল ঠিকঠাক করে নেওয়ার মুহূর্তে তার বোতাম-খোলা শরীরের অনেকটাই নীলার্ণবের সামনে উদ্ভাসিত হয়, তিতিক্ষা অবশ্য তার বোতাম বিষয়ে কতটা ওয়াকিবহাল তা বুঝে উঠতে পারছিল না গার্গী, তিতিক্ষা চুলপর্ব সমাপ্ত করে একটা আলসেমি-মাখানো হাই তোলে, প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে অন্য বিষয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে বলল, শ্রাবণকুমার নিজেই আসবেন বলেছিলেন?

—শ্রাবণকুমার হঠাৎ মরিশাসে চলে গেলেন কাল সন্ধেয়। আমাকে এই দায়িত্ব দিয়ে বললেন, নীলার্ণব, তুমি অন্যের চেয়ে মানুষের মন একটু বেশিই বোঝো। তোমাকেই এই দায়িত্ব দিলাম। শিল্পী তিতিক্ষা দ্বিবেদী কিন্তু খুবই টাচি তাঁর ছবির ব্যাপারে। খুব সাবধানে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করবে।

তিতিক্ষা কিছু বলতে চাইছিল তার আগেই নীলার্ণব বললেন, 'আমি শ্রাবণকুমারকে বলেছি, আমি অনেক বড়ো মাপের শিল্পীদের সঙ্গে কথা বলতে অভ্যস্ত। ডোন্ট ওরি।' আপনার কী মনে হয়, আমি কি যথেষ্ট সাবধানে কথা বলছি না আপনার সঙ্গে?

তিতিক্ষা বিব্রত হয়ে হাসল একটু, বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক আছে।

গার্গী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, মানুষের মন বিষয়ে কি আপনি বিশেষজ্ঞ?

—তা বলতে পারেন। আমি পড়াশুনো করেছি সাইকোলজি নিয়ে। বহু সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গেও কথা বলেছি। তা ছাড়া গুলে খেয়েছি ফ্রয়েড।

গার্গী হাসল শব্দ করে, যাক, আপনি যখন ফ্রয়েড সাহেবকে হজম করেছেন, আপনাকে বিশেষজ্ঞ হিসেবে সম্মান দিতেই হবে।

নীলার্ণব উৎসাহী হয়ে বললেন, বিশেষ করে সুন্দরীদের নিয়ে আমি আলাদা করে গবেষণা করেছি—

গার্গী আরও মজা পেয়ে গেল, কিন্তু তার মনোভাব নিঃশব্দ রেখে অপেক্ষা করতে লাগল নীলার্ণব কাশ্যপের পরবর্তী সংলাপের। তার অফিসে যেতে দেরি হয়ে যাচ্ছিল খুব। ইতিমধ্যে একবার ঘড়িতে নজর ছুঁয়ে দেখে নিয়েছে এগারোটার সীমা পেরিয়ে গিয়েছে কাঁটাদুটো। একটা ফোনও এসেছিল তার পি এ পিয়ালির

কাছ থেকে, তার আসতে আরও কত দেরি হবে তা জানতে। দুজন অফিসার তার অপেক্ষায় অনেকক্ষণ বসে আছেন ভিজিটর'স রুমে। গার্গী উঠি-উঠি করেও উঠতে পারছিল না তিতিক্ষাকে নীলার্ণবের কাছে সমর্পণ করে চলে যাওয়া কতখানি যুক্তিযুক্ত হবে ভেবে। তার উপর নীলার্ণবের সুন্দরীদের নিয়ে গবেষণার ফল জানতে আগ্রহী হল খুবই। এও খেয়াল করছিল তিতিক্ষার অনবধানতায় তার ভরাট স্তনের একাংশ ছুঁয়ে যাচ্ছে নীলার্ণব কাশ্যপের চোখ।

পিয়ালিকে ফোন করে অপেক্ষমানদের দুটোর পর আসতে বলে গার্গী নিবিষ্ট হয় নীলার্ণব কাশ্যপের পরবর্তী আকর্ষণের জন্য।

হঠাৎ নীলার্ণব উঠে গেলেন ক্যানভাসে নতুন আঁকা ছবিটির রঙের বিন্যাস দেখতে, কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করে অতিউচ্ছ্বাসের ভাষায় বলে উঠলেন, রিয়্যালি, মিসেস দ্বিবেদী, আপনার ছবি আমরা যত দেখছি, ততই মুগ্ধ হচ্ছি আমরা।

আমরা শব্দটির উপর গার্গী তার ভাবনা ছুঁয়ে রাখে কিছুক্ষণ। আমরা মানে নীলার্ণবের সঙ্গে নিশ্চয় শ্রাবণকুমারও।

—যেমন এই ছবিটি, ইট'স এ সুপার্ব ক্রিয়েশন। এরকম মিস্টিক ছবি খুব কম আঁকা হয়েছে পেইন্টিং ওয়ার্ল্ডে। আই ক্যান বেট।

তিতিক্ষা হাসি-হাসি মুখে তাকিয়ে রইল নীলার্ণব কাশ্যপের ফর্সা মুখের দিকে।

নীলার্ণবের পরনে সমুদ্ররঙের একটি চমৎকার শার্ট, পরনে জেটব্ল্যাক রঙের ট্রাউজার। মুখে স্মিত হাসি। তাতে তার সুপুরুষ চেহারায় একটা অদ্ভুত জেল্লা। মেয়েদের মন কাড়তে এরকম চেহারা খুব কাজে লাগে।

পরক্ষণে নীলার্ণব বললেন, আসলে কী জানেন, জীবনকে দেখার চোখ সুন্দরীদের একটু অন্যরকম হয়।

তিতিক্ষার মুখে জমা হচ্ছে লজ্জামেশানো বিস্ময়। গার্গী তার সঙ্গে এক লহমা চোখাচোখি করল নীলার্ণবের কথার ধাক্কা সামলাতে। তিতিক্ষা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে, সত্যিই কি তাই?

—অফ কোর্স। সুন্দরীদের আত্মবিশ্বাস অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি। তারা কোনও কাজে হাত দিলে তার সাফল্য আসে অন্যের চেয়ে ঢের আগে।

তিতিক্ষার অভিব্যক্তিতে অস্বস্তি। গার্গী হেসে বলল, এটাই আপনার গবেষণালব্ধ ফল?

—আমি একটু খুলে বলি, নীলার্ণব হাসলেন আত্মবিশ্বাসের ভঙ্গিতে।

কিন্তু এরপর নীলার্ণব যে-বিষয়ের অবতারণা করলেন তা গার্গীর মনে হচ্ছিল ভারি অদ্ভুত, অব্যাকরণীয়। নীলার্ণব বললেন, যে কোনও সুন্দরী জ্ঞান হওয়ার পর থেকে এক ধরনের এক্সট্রা অ্যাটেনশন পায় সবার কাছে। সে কিছু চাইলে তাকে

খুশি করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে অন্যেরা। অনেক সময় না-চাইতেই তার কাছে পৌঁছে যায় অনেক দুর্লভ বস্তু। সে যা প্রার্থনা করে তা অমনি গ্রান্টেড হয়ে যায় যত দ্রুত সম্ভব। ফলে তার আত্মবিশ্বাস, ব্যক্তিত্ব সবই অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি হওয়া সম্ভব। প্রোভাইডেড—

হঠাৎ একটি লম্বা ঢঙের 'প্রোভাইডেড' শুনে গার্গী তিতিক্ষা দুজনেই টানটান হয়ে শোনে। যে কোনও আইনের বইয়ে এরকম অজস্র 'প্রোভাইডেড' এর উল্লেখ থাকায় খুব জটিল হয়ে পড়ে আইনের ধারা-উপধারাগুলি।

—প্রোভাইডেড সেই সুন্দরী যদি একটু বুদ্ধিমতী হন। আমার কী মনে হয় জানেন? বোকা সুন্দরীরাই পৃথিবীর নাম্বার ওয়ান ট্র্যাজিক হিরোয়িন।

গার্গী বুঝে উঠতে পারছিল না নীলার্ণব কাশ্যপের গবেষণালব্ধ ফল শুনতে আর কতক্ষণ বসতে হবে তাকে! কিন্তু তিতিক্ষা তাকে বসতে বলেছে হয়তো কোনও কারণে, ফেলে চলে যায়ই বা কী করে!

হঠাৎ নীচের একজন প্যাকার উঠে এসে বলল, ম্যাডাম, আমাদের কাজ শেষ।

তিতিক্ষা ব্যস্ত হয়ে বলল, না, শেষ নয়, এই একটা ছবি এখনও প্যাকিং করা বাকি। এটাও প্যাকিং হলে বলো। তারপর গাড়িতে তুলে দিতে হবে।

মাঝবয়সী লোকটি ছবিটি তুলে নিয়ে গেল দ্রুত হাতে। বলে গেল, ম্যাডাম, পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমরা তুলে দিতে পারব গাড়িতে।

কাজ শেষ জেনে নীলার্ণব তার পকেট থেকে খামে ভরা একটা চেক বার করে ধরল তিতিক্ষার সামনে, বলল, ম্যাডাম, শ্রাবণকুমার আপনার জন্য এই সামান্য অর্থমূল্য পাঠিয়েছেন। আপনি দয়া করে গ্রহণ করে আমাদের কৃতার্থ করবেন।

তিতিক্ষা সাগ্রহে চেকটি নিয়ে তাতে চোখ রাখতে অপার বিস্ময়ে আপ্লুত। বলল, এ তো এক কোটি টাকার চেক!

—ম্যাডাম, শ্রাবণকুমার আপনার ছবির মূল্য হিসেবে ঠিক এই টাকাটাই বরাদ্দ করেছেন। বলেছেন, তিতিক্ষা দ্বিবেদীর ছবির কোনও অর্থমূল্য হয় না। যা ছবি এঁকেছেন তা এক কথায় অমূল্য। তবু কিছু তো দিতেই হবে, তাই—

গার্গী এক নজর উঁকি দিয়ে দেখল টাকার অঙ্কটা। তিতিক্ষার মুখে স্মিত হাসির ঢেউঢক্কার, তার সুন্দর মুখে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো এক আশ্চর্য লালচে আভা। গার্গীর দিকে চেকটি বাড়িয়ে দিয়ে বলল, গার্গীদি, আমার জীবনের সবচেয়ে বড়ো প্রাইজ।

—ও কিছু না, মিসেস দ্বিবেদী, শ্রাবণকুমার বলেছেন আপনাকে আরও অনেক ছবি আঁকতে হবে। মানি ইজ নো ফ্যাক্টর। মরিশাসের হোটেলেই হয়তো আরও কিছু ছবি দরকার হবে। তারপর লাক্ষাদ্বীপেও একটা হোটেল বানাচ্ছি আমরা।

সেখানে আরও বড়ো হোটেল। আরও বহু ছবির প্রয়োজন হবে আমাদের। আপনি শুধু এঁকে যান। মানি ইজ নো ফ্যাক্টর।

গার্গীর কেমন অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল ঘটনাটা। তবু ছবির পৃথিবীটা সে ভালো করে জানে না। শুনেছে ভালো শিল্পীদের ছবি বিক্রি হয় এরকমই অবিশ্বাস্য মূল্যে। পৃথিবীর ধনী মানুষেরা মূল্যবান পেইন্টিং ঘরে দেওয়ালে টাঙিয়ে একই সঙ্গে শোভা বর্ধন করেন ঘরের, অন্যদিকে বর্ধিত করেন নিজেদের আভিজাত্য।

গার্গী স্বস্তি বোধ করছিল তিতিক্ষার আকস্মিক অর্থপ্রাপ্তিতে। একেই বোধহয় বলে দৈববলে অবস্থা ফিরে যাওয়া। তিতিক্ষার এখন প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। অন্তত আরও দেড় কোটি টাকার ছবি বিক্রি করতে পারলে সে ঋণমুক্ত হতে পারে।

গার্গীর হাত থেকে চেকটি ফিরিয়ে নিয়ে তিতিক্ষা যখন চেকটি পুনর্বার নিরীক্ষণে ব্যস্ত, হঠাৎ নীলার্ণব বললেন, ম্যাডাম, শুধু একটাই অনুরোধ করেছেন শ্রাবণকুমার। আপনি হয়তো খেয়াল করেননি চেকটি পোস্ট-ডেটেড। সাতদিন পরে চেকটি প্রেজেন্ট করবেন আপনার ব্যাঙ্কে।

না-গার্গী না-তিতিক্ষা কেউই খেয়াল করেনি চেকে কী তারিখ দেওয়া আছে। আসলে এমন বিশাল অঙ্কের একটি চেক পেয়ে তিতিক্ষার মতো গার্গীও কিছুটা চমৎকৃত। তিতিক্ষার কাঁধে যে-বিশাল অঙ্কের ঋণ, সেই ঋণমুক্ত হওয়ার পথে এই চেকটি অনেকখানি সুরাহা করবে এই ভাবনায় ব্যস্ত ছিল দুজনে। এখন চেকের উপর তারিখটি দেখে তিতিক্ষা জিজ্ঞাসা করে, তার মানে নেক্সট উইকে চেকটা ব্যাঙ্কে দিতে পারব।-

—হ্যাঁ। আজ মাসের পাঁচ তারিখ। আপনি বারো তারিখে চেকটা ভাঙাতে পারবেন। আসলে কী হয়েছে—

নীলার্ণব ইতস্তত করে বললেন, শ্রাবণকুমার একই সঙ্গে দশ-বারো কোটি টাকার চেক কেটেছেন বিভিন্ন জনকে। বুঝতেই পারছেন হোটেলটি করতে অন্তত কুড়ি-পঁচিশ কোটি টাকা খরচ। ফলে খুব চাপ পড়ে গেছে তাঁর উপর। তবে পর-পর ডেটে চেকগুলো কাটা হয়েছে। আশা করি কোনও অসুবিধে হবে না।

মাত্র সাতদিন পরে চেক প্রেজেন্ট করতে বলেছেন নীলার্ণব, তবু তিতিক্ষার মনে সামান্য অস্বস্তি। টাকাটা হাতে পেয়েও যেন এখনও অধরা। নীলার্ণব তিতিক্ষার আংশিক অনাবৃত বুকের দিকে অপাঙ্গে তাকিয়ে বলল, ডোন্ট ওরি, মিসেস দ্বিবেদী। আর শ্রাবণকুমার আপনার জন্য এই গিফটটি পাঠিয়েছেন।

বলে পকেট থেকে বার করলেন একটি রঙিন প্যাকেট। তার ভিতর থেকে উঁকি মারছে একগুচ্ছ রুমাল। ঠিক অচেনা যেমন এনেছিল আগের দিন । আর তার রং—

অচেনা যেমন বলেছিল তেমনই রং রুমালগুলির। নীলার্ণবও বললেন, কফিন রঙের।

গার্গীর সঙ্গে তিতিক্ষার ভুরুতেও সামান্য দেবদারু কাঁপ। নীলার্ণব প্রথমে গার্গীকে পরক্ষণে তিতিক্ষাকে একটা মস্ত বাও জানিয়ে বলল, তা হলে আমি এখন চলি। হোটেলটি হয়তো সামনের মাসে উদ্বোধন হবে। তখন আপনাকে একবার হোটেলে পদধূলি দিতে হবে কিন্তু, ম্যাডাম।

নীলার্ণব পিছু ফিরে নেমে যাচ্ছিল সিঁড়ি বেয়ে, হঠাৎ কী মনে হতে আবার উঠে এল উপরে, হেসে গার্গীকে বলল, ম্যাডাম, শ্রাবণকুমার আমাকে যে-দায়িত্ব দিয়েছিলেন তাতে আমি ডাহা ফেল। আমার উচিত ছিল আপনাকেও মরিশাসে যাওয়ার নিমন্ত্রণ করা। কিন্তু একদম ভুলে মেরেছি। আপনিও কিন্তু আমাদের গেস্ট। মিসেস দ্বিবেদীর সঙ্গে আপনার এয়ার টিকিটও পাঠিয়ে দেব আমরা।

গার্গী মৃদু হাসল শুধু।

নীলার্ণব নীচে নামার একটু পরেই গাড়ির গর্জন শোনা গেল। তিতিক্ষা তখনও চেকটি হাতে নিয়ে বসে আছে অবিশ্বাসের চোখে। বারবার চোখ রাখছে ঠিক যেখানটায় লেখা আছে এক কোটি টাকা। অনেকক্ষণ পরে ফিসফিস করে বলল,গার্গীদি, আমি ভাবতেও পারছি না সত্যিই এতগুলো টাকা হাতে পেয়ে গেছি। যা কাজে লাগবে না আমার!

গার্গী হঠাৎ তিতিক্ষার পাশে পড়ে থাকা রুমালের প্যাকেটটি টেনে নিয়ে বলল, আমার খুব অদ্ভুত লাগছে রুমালের রংটা। নীলার্ণব কাশ্যপও বললেন, কফিন রঙের রুমাল। এরকম কোনও রঙের নাম কখনও শুনিনি কিন্তু!

তিতিক্ষা ভুরুতে কাঁপ এঁকে বলল, আমিও না। কিন্তু শুনেছি রুমাল নাকি কেউ এমনি প্রেজেন্ট করে না। দিলে ঝগড়া হয়। সত্যি নাকি, গার্গীদি?

১২

তিতিক্ষার হাতে একরাশ বিস্ময় ধরিয়ে দিয়ে নীলার্ণব কাশ্যপ যখন চলে গেলেন, গার্গী লক্ষ করছিল সদ্য স্বামীহারা মেয়েটিকে। বিবেক দ্বিবেদী আকস্মিকভাবে খুন হওয়ায় তিতিক্ষার সামনে এখন প্রশান্ত মহাসাগর পার হওয়ার মতো সমস্যা। বিবেকের শোক পালন করার সময়ও যেন নেই তার। তার এখন প্রধান সমস্যা কীভাবে এত-এত টাকার ঋণ শোধ করবে! কাকতালীয় হলেও এরকম ভয়াবহ সংকটের দিনে শ্রাবণকুমারই এখন তার পরিত্রাতার ভূমিকায়।

গার্গী তিতিক্ষার কিছুটা পরিতৃপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে একটা বড়ো করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তিতিক্ষার অগোচরেই। তিতিক্ষার এভাবে বোতাম-খোলা

হাউসকোট পরে বাইরের লোকের সামনে বসে থাকাটা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না। তিতিক্ষা মেয়ে হিসেবে ভারি সরল মনের হলেও একটু সেক্সি টাইপের। তার প্রদর্শনীর ব্রোসিওরে নানা পোজের ফটো ছাপা হয়েছিল তাতে তার খোলামেলা পোশাক দেখেই বুঝে ফেলেছিল সেদিন। আজ নীলার্ণব কাশ্যপের সামনে বারবার নিজের শরীর যেভাবে অনাবৃত করছিল তা থেকেও বুঝে ফেলেছে তিতিক্ষার মনোভাব।

তিতিক্ষা নাকি বলেছে প্রত্যেক আর্টিস্টকে তার ছবি সেল করার নিজস্ব পদ্ধতি আবিষ্কার করতে হয়। নিজেকে প্রজেক্ট করার এটাই তার পদ্ধতি। কিন্তু ব্যাপারটা গার্গীর পছন্দ হল না। তার ধ্যানধারণা কি তা হলে ওল্ড স্কুলের! এ যুগের ছেলেমেয়েদের মূল্যবোধের সংজ্ঞাটাই বদলে যাচ্ছে দ্রুত।

আপাতত তাকে একা থাকতে দিয়ে গার্গী রওনা দিতে চাইল অফিসের দিকে, বলল, তিতিক্ষা, তোমার সঙ্গে পরে কথা বলব। শুধু একটাই জানার আছে তোমার কাছ থেকে, তোমাদের ড্রাইভার রোহন সেদিনের পর থেকেই মিসিং তা তো জানো।

তিতিক্ষার মুখ কঠিন হয়ে ওঠে, বলল, রোহনের কথা ভাবলেই আমার বুকের ভিতর আগুন ছোটে!

গার্গী তিতিক্ষাকে নিরিখ করে বলল, রোহন তোমাদের গাড়ি কত বছর চালাচ্ছিল মনে পড়ছে?

—তা বছর তিনেক তো বটেই।

—নিশ্চয় তোমাদের খুবই বিশ্বাসভাজন হয়ে পড়েছিল ইতিমধ্যে?

—তা হয়েছিল। খুবই বিশ্বাস করেছি ওকে। ঘরের ছেলের মতো যত্ন করতাম আমরা। বোধহয় তারই প্রতিদান হিসেবে আমার সর্বনাশ করেছে রোহন।

—তোমার কি স্থির ধারণা রোহন এর মধ্যে জড়িত আছে?

—নিশ্চয়ই, তিতিক্ষার চোখে পুনর্বার আগুন, বিবেক দিল্লিতে গিয়ে আমাকে বলেছিল, 'তিতি, আমি কোন হোটেলে উঠছি, কখন বেরোব তা এক তুমি ছাড়া কেউ জানে না, অথচ আমাকে যারা ফলো করছে তারা কী করে যেন জেনে যাচ্ছে আমার গতিবিধি।' তখন বিষয়টা মাথায় আসেনি। পরে মনে হয়েছিল বিবেকের সঙ্গে আমার যখন মোবাইলে কথা হচ্ছিল, তার একমাত্র সাক্ষী রোহন। আমি রোহনকে নিয়ে তখন ফিরছিলাম বাড়ির পথে। তখনও রোহনকে সন্দেহ হয়নি। বিবেক কখন কোন প্লেনে যাচ্ছে, প্লেন থেকে নেমে কোন হোটেলে উঠছে সবই রোহন গাড়ি চালাতে চালাতে শুনেছিল, সেই সংলাপ সে জানিয়ে দিয়েছিল দিল্লিতে।

তিতিক্ষার কথাগুলো মগজে নাড়াচাড়া করার ফুরসতে গার্গী লক্ষ করছিল তিতিক্ষার অন্যমনস্ক হয়ে যাওয়া, গলা ধরে আসা, তার স্টেপকাট চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে আরও এলোমেলো করে দেওয়া চুলের কেয়ারি।

—গার্গীদি, আমি যদি ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারতাম রোহন যুক্ত আছে এই ষড়যন্ত্রে সঙ্গে তা হলে বিবেককে এয়ারপোর্ট থেকে আনতে রোহনকে পাঠাতাম না।

গার্গী এবার নিজেই অন্যমনস্ক হচ্ছিল রোহনের কথা ভাবতে গিয়ে। ড্রাইভারের অন্তর্ধান বিবেক হত্যার রহস্যে একমাত্র ক্লু। ইতিমধ্যে খবর নিয়ে জেনেছে পুলিশ গিয়েছিল রোহনের আস্তানায়। দক্ষিণ কলকাতার কোনও একটি কলোনিতে তার বউ-মেয়ে থাকে। মেয়েটার বছর দুয়েক বয়স, এখনও পৃথিবী সম্পর্কে কোনও ধারণাই নেই তার, তাই সে খেলছিল নিজের মনে, কিন্তু রোহনের স্ত্রী কেঁদে ভাসাচ্ছে সারাদিনরাত। রোহন কোথায় গেছে, কেনই বা, কিছুই জানা নেই সেই বাইশ-তেইশের নিরক্ষর মেয়েটির। রোহনের দেশের বাড়ি শিমুলতলার কোনও গণ্ডগ্রামে, তার বিবরণও ঠিকমতো বলতে পারেনি তার বউ।

—গার্গীদি, রোহন গাড়িতে না থাকলে বিবেককে কিছুতেই ওরা ধরতে পারত না। রোহন ইচ্ছে করেই ওখানে গাড়ি স্টার্ট করতে দেরি করেছিল কিছু প্রব্লেম হচ্ছে জানিয়ে, সেই সুযোগে কালপ্রিটরা ওকে কব্জা করে ফেলে।

বিষয়টা একটু-একটু জানা ছিল গার্গীর, তবু অনেকটা জানে না এখনও। বিবেক দ্বিবেদীকে কেন খুন হতে হল, কোন পরিপ্রেক্ষিতে বিবেককে কিডন্যাপ করা হল, শুধু মুক্তিপণের কারণেই কি না তা এখনও পরিষ্কার নয় তার কাছে। তিতিক্ষার কাছ থেকে শুনে যা মনে হচ্ছে রোহনকে যদি উদ্ধার করা যায় হয়তো কোনও কিনারা হতে পারে রহস্যের।

গার্গী ভাবছিল রোহন সম্পর্কে আরও তথ্য পাওয়া যায় কি না, পুলিশের প্রশ্নের উত্তরে তিতিক্ষা বলতে পারেনি তার দেশের বাড়ির হদিশ, কিন্তু কোনও ভাবে জানা যায় কি না শিমুলতলার সেই গণ্ডগ্রামের ঠিকানা, তা হলে হয়তো দেখা যাবে রোহন সেখানে গিয়ে বাস করছে বহাল তবিয়তে।

—তিতিক্ষা, রোহন কখনও গল্প করতে গিয়েও বলেনি তার দেশের বাড়িতে কে বা কারা আছে—

—গার্গীদি, আমার এখন মনে হচ্ছে রোহন যত কথা বলেছে তার নাইনটি নাইন পারসেন্ট মিথ্যে বলেছে আমাদের কাছে। রোহনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আমাদের কাছ থেকে কিছু টাকা হাতানো, ব্যস। প্রথমে তো বলেছিল তার বিয়েই হয়নি। তারপর তার বউ আছে জেনে যাওয়ার পর বলেছিল, ম্যাডাম, আমাদের এই বিয়েটা ঠিক বিয়ে নয়। ওই যাকে বলে একসঙ্গে থাকা।

তিতিক্ষার কাছ থেকে তথ্য পাওয়ার আশা ত্যাগ করে গার্গী ভাবছিল অলীকশেখরের কথা কেন না তাঁর কাছেই প্রথমে চাকরি করতে এসেছিল রোহন। অলীকশেখর হয়তো কোনও খবর দিতে পারেন।

তিতিক্ষার কথা শেষ হতে না হতে বেজে উঠল মধুর রিংটোন নিয়ে টেলিফোন, শব্দ শুনেই বুঝতে পারছিল অনেক দূরের কল, এস টি ডি হতে পারে, আই এস ডি-ও।

কণ্ঠস্বর শুনে তিতিক্ষার মুখ প্রথমে ফ্যাকাসে, পরক্ষণে কান্না-কান্না গলায় বলল, হ্যাঁ, তিতি বলছি, শেষাদ্রিদা। আপনি তো সব শুনেছেন। আমার জীবনটা শেষ হয়ে গেল। আপনি কবে ফিরলেন আমেরিকা থেকে? ও, ফেরেননি? আমেরিকা থেকেই বলছেন? আপনার টাকাটা শিগগির পেয়ে যাবেন, শেষাদ্রিদা। মনে হচ্ছে আর এক সপ্তাহ পরে দিয়ে দিতে পারব।

ফোনটা নামিয়ে রেখে তিতিক্ষা বলল, দেখেছেন, গার্গীদি, সকাল থেকে সারাদিন এরকম অসংখ্য টেলিফোন আসছে 'আমার টাকা কবে ফেরত দিচ্ছ' বলে। আমি এখন কী করি বলুন তো? তবু এই চেকটা ক্যাশ হলে কয়েকজনের দেনা হয়তো শোধ করতে পারব। কিন্তু আমি এখনও বুঝতে পারছি না এরকম কতজন টাকা পাবেন বিবেকের কাছে! প্রতিদিন নতুন নতুন ফোন আসছে টাকা চেয়ে। আমি সবাইকে চিনিও না—

গার্গী বুঝতে পারছিল তিতিক্ষা কীভাবে জড়িয়ে গেছে অজস্র ঋণের দায়ে। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, তিতিক্ষা, যাদের তুমি চেনো বা চেনো না তাদের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার সময় কি কোনও রসিদ দিয়েছিলে?

তিতিক্ষা কিছুক্ষণ ভাবল চুপ করে, তারপর মাথা ঝাঁকায়, অন্তত আমি যেখান থেকে জোগাড় করে দিয়েছিলাম তাদের কারও কাছে রিসিপ্ট দেওয়া হয়নি বলেই মনে আছে—

পরক্ষণে বলল, কিন্তু রিসিপ্ট অর নো রিসিপ্ট, যাদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছি শোধ তো দিতেই হবে, তাই না?

—তা বটেই, গার্গীর এতক্ষণে মনে পড়ল সে অফিসের অনেক জরুরি কাজ ফেলে বসে আছে তিতিক্ষার কাছে, ব্যস্ত হয়ে বলল, আমি তা হলে এখন চলি, তিতিক্ষা, পরে আবার যোগাযোগ করব।

তিতিক্ষারও মনে পড়ে গেল সেও এতক্ষণ এক কোটি টাকার চেক পাওয়ার উল্লাসে বিভোর হয়েছিল বাইরের পৃথিবীর ঝড়ঝঞ্ঝাট ভুলে যদিও আমেরিকা থেকে শেষাদ্রিদার একটি ফোন তাকে মনে পড়িয়ে দিচ্ছে অনেক স্মৃতি। বলল, গার্গীদি, আমি বুঝতে পেরেছি আমার এখন শুধু ছবি আঁকা ছাড়া গত্যন্তর নেই। যতদিন

না সমস্ত ঋণ শোধ না হয় কোনও দিকে তাকাব না, শুধু এই ক্যানভাসের সামনে পাগলের মতো এঁকে যেতে হবে একটার পর একটা ছবি।

গার্গী লক্ষ করছিল তিতিক্ষার সুন্দর মুখে বিষণ্ণতার মধ্যে একঝলক রোদ্দুর। শিল্পী তার ক্যানভাসের সামনে দাঁড়িয়ে ছবি আঁকছে নিবিষ্ট হয়ে এর চেয়ে সুন্দর দৃশ্য কীইবা হতে পারে। শিল্পীর পক্ষেও তা-ই কাঙ্ক্ষিত। ছবি এঁকে যদি তিতিক্ষা তার জীবনের সবচেয়ে অঘটনের স্মৃতি ভুলতে পারে...

তিতিক্ষার বাড়ি থেকে বেরিয়ে গার্গী সোজা অফিসের পথে। যাওয়ার পথে ভাবছিল বিবেক হত্যা রহস্যের জট খুলতে গিয়ে ক্রমশ আরও আরও অন্ধকারের মধ্যে সেঁধিয়ে যাচ্ছে সে। পুলিশ এখনও পর্যন্ত কোনও কিনারা করতে পারেনি, সে নিজেও তেমন সময় দিতে পারছে না যার ফলে গোটা বিষয়টিই এখনও বিশবাঁও জলের গভীরে।

অফিসে গিয়ে প্রথম ঘন্টা কেটে গেল ঝোড়ো হাওয়ায় উড়ে যাওয়ার মতো। প্রচুর ফাইল ও মিটিং সেরে একটু ফুরসত হতেই মোবাইলে ফোন করল সায়নকে। এ সময় সাধারণত সায়ন ফ্যাক্টরিতে থাকে, কিন্তু ফোন পেতে হেসে বলল, কী ব্যাপার, এম ডি সাহেবা, আমি তো হেড অফিসেই আছি। এই কিছুক্ষণ আগে পৌঁছোলাম। কিন্তু তোমার হলটা কী? খুব ঝামেলায় না পড়লে তো তুমি ফোন করো না! মনে হচ্ছে এক বিশাল কৃষ্ণগহ্বরে পড়েছ!

—তা পড়েছি ।

—তাই নাকি? দাঁড়াও, আমি তোমার চেম্বারে আসছি।

সায়ন মিনিট পাঁচেকের মধ্যে বুট গটগটিয়ে ঢুকে পড়ল গার্গীর মুখোমুখি।

—হ্যাঁ, বলো কী ঝামেলা?

গার্গী কপালের উপর ঝরে পড়া চুল বিন্যস্ত করে নিয়ে বলল, হ্যাঁ, বলতে পারো প্রায় ব্ল্যাক হোলে ঢুকে পড়েছি। কী করে বেরোব বুঝে উঠতে পারছি না। শুধু একটাই সান্ত্বনা তিতিক্ষা অনেকগুলো টাকা পেয়ে গেছে, ছবি বিক্রির টাকা, তাতে কিছু পাওনাদারের হাত থেকে রেহাই পাবে আপাতত।

—কিন্তু যা বলছ তাতে ঋণের পাহাড় বোধহয় আরও অনেক উঁচু।

—পাহাড় কী বলছ! বলো পর্বতমালা।

—হ্যাঁ; তাই। এক কোটি টাকায় এত উঁচু পর্বতমালা পেরোনো কঠিন।

—পেরোতেও পারে যদি শ্রাবণকুমার মরিশাসের মতো আরও অনেকগুলো হোটেল তৈরি করেন। আর একটা হোটেল নাকি শুরু করছেন লাক্ষাদ্বীপে। কিন্তু একটা-দুটোয় হবে না, আরও অনেক লাক্ষাদ্বীপ-মরিশাস দরকার।

—ঈশ্বরের কাছে এখন তিতিক্ষাকে সেই প্রার্থনাই জানাতে হবে। তা হলে হয়তো কোনও দিন —

—তাতে একটা লাভ হল। তিতিক্ষা তার স্বামীবিয়োগের ব্যথা কিছুটা হলেও ভুলে থাকতে পারবে।

—ভাগ্যিশ একজন শ্রাবণকুমারের দেখা পেয়ে গিয়েছে তাই স্বস্তি।

—আমি ভাবছিলাম বিবেক বেঁচে থাকতে যদি তিতিক্ষার কপালটা ফিরত, তা হলে হয়তো তাকে আর চারপাশে ঋণ নিতে হত না!

—তাতেও হয়তো তাকে ধার নিতে হত কেন না ওই যে বললে না, ব্ল্যাক হোল, কোনও ব্ল্যাক হোলে ঢুকে পড়েছিল বিবেক। যার ফলে তাকে অবিরত ধার নিতে হচ্ছিল এখান-ওখান থেকে। ব্যাঙ্কের ওভারড্রাফট শেষ হয়ে পার্সোনাল লোন পর্যন্ত গড়িয়েছিল ঋণের পর্বত। আমার অদ্ভুত লাগছে একটা কথা ভেবে।

গার্গী তৎপরতার সঙ্গে বলল, তুমি কী বলবে তা বুঝে ফেলেছি। এত টাকা কেন ঋণ নিয়েছিল বিবেক, তাই তো?

—হুঁ। ঠিক তাই। এত টাকা বিবেক লোন নিয়েছিল তার কোম্পানি চালাতে যে-কোম্পানির তেমন কোনও অস্তিত্বই নেই আদতে!

—তুমি কী বলতে চাইছ?

—বলতে চাইছি বিবেককে হয়তো কেউ ব্ল্যাকমেল করছিল অনেকদিন ধরে। তাদেরই টাকা জোগাচ্ছিল বিবেক। হয়তো ব্যবসার ব্যাপারটাই মিথ্যে।

গার্গী কিছুক্ষণ ভাবল সায়নের যুক্তি। এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে অকাট্য যুক্তি। বলল, কিন্তু এ কথাটাও তো ভাবতে হবে কেন সে টানা এতদিন ব্ল্যাকমেলের শিকার হবে? কেনই বা?

টেবিলের ওপাশে সায়ন কিছুটা সময় নীরবতার গভীরে। তারপর বলল, আমার হঠাৎ মনে হল তাই বললাম। এও হতে পারে হয়তো সাপ্লাই করার মধ্যে কোনও ব্যাপক সমস্যায় পড়ে গিয়েছিল বিবেক। অথবা তার কোনও দুর্বলতার কথা জেনে ফেলেছিল তার কোনও প্রতিপক্ষ।

গার্গী চমৎকৃত হচ্ছিল সায়নের বিশ্লেষণ শুনে। সায়ন সাধারণত গার্গীর কাজেকর্মে, বিশেষত রহস্য-কাণ্ডের তদন্তে মাথা ঘামায় না। সে যেটা বোঝে তা হল ব্যবসা, ব্যবসা আর ব্যবসা। বিবেক যেহেতু একজন ব্যবসায়ী, কিডন্যাপড হয়েছিল দিল্লি থেকে ফেরার পথে, তখন থেকেই সায়ন গভীর আগ্রহে গার্গীর কাছে শুনে নিচ্ছিল ঘটনার গতিপ্রকৃতি। এতদিনে সে ব্যক্ত করেছে তার প্রতিক্রিয়া। আর গার্গীর মনে হল আইডিয়াটা মন্দ নয় সায়নের।

কিন্তু তার এও মনে হচ্ছিল তার পাশের বাড়িতেই বসবাস করছেন অলীকশেখর যিনি কিনা একজন পাঁড়ব্যবসায়ী তিনি কি একবারও বোঝেননি তাঁর জামাই কী ব্যবসা করছে, কাদের সঙ্গে ব্যবসা করছে, কেউ তার সঙ্গে ঝামেলা করছে কি না!

—চেয়ারম্যান সাহেব, কেউ যদি বিবেককে ব্ল্যাকমেল করেই থাকবে, বিবেক কেন সে-কথা কাউকে জানায়নি?

অফিসে দেখা হলে গার্গী কখনও চেয়ারম্যান সাহেব বলে থাকে সায়নকে। আর সায়ন তাকে বলে এম ডি সাহেবা। সায়নের এই সম্বোধনে ভারি মজা পায় গার্গী।

সায়ন একটু ভেবে নিয়ে বলল, না-জানানোর অনেক কারণ থাকতে পারে। হয়তো তারা বিবেকের কোনও দুর্বলতার কথা জেনে ফেলেছিল!

সায়নের এমন অদ্ভুত বিশ্লেষণে গার্গী রীতিমতো চমৎকৃত। বিবেকের মৃত্যুর পর প্রায় সাতদিন পার হয়ে গেছে, তার মৃত্যুর কারণ খুঁজতে গিয়ে গার্গী, সেই সঙ্গে পুলিশও মাথা খুঁড়ছে তারা কেউই ভাবেনি বিবেকের ব্যবসাটা আসলে ভিত্তিহীন। একটা ব্যবসা সে শুরু করেছিল বটে, কিন্তু কিছুদিন পরেই সে কারও পাল্লায় পড়ে, তারাই এতদিন ধরে তাকে ব্ল্যাকমেল করছিল, আর বিবেক পাগলের মতো টাকা ধার করে তাদের চাহিদা মেটাচ্ছিল। কী অদ্ভুত কাণ্ড!

সায়নের অনুমান যদি সত্যি হয় তা হলে পুরো ব্যাপারটা এবার অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবতে হবে। কিন্তু যারা ব্ল্যাকমেল করছিল তাদের কারও পরিচয়ই এখনও জানতে পারেনি পুলিশ। তা যদি জানা না যায় কী করেই বা বিবেক হত্যা রহস্যের জাল ছাড়াতে পারবে এখন।

—চেয়ারম্যান সাহেব, এই ঘটনার সঙ্গে যারা যুক্ত, তাদের কারও আমাদের জালে এসে ধরা পড়ার সম্ভাবনা দেখছি না। একমাত্র সাক্ষী ড্রাইভার রোহন। রোহনের সঙ্গে তাদের যোগসাজশ আছে এ-কথা একটু আগে তিতিক্ষা আমাকে জানিয়েছে। অথচ রোহনের কোনও হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না।

সায়ন মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, এম ডি সাহেবা, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যা বলছে, তোমাদের এখন উচিত ড্রাইভারের হোয়ারঅ্যাবাউটস খুঁজে বার করা। তুমি পুলিশকে বলো যে-করেই হোক ড্রাইভারকে খুঁজে বার করতে হবে নইলে আসল গ্যাং ধরা যাবে না।

গার্গীর চেম্বারে এক কাপ উষ্ণ চায়ের সদ্ব্যবহার করে তার চেম্বারে ফিরে যেতে গার্গী ডেকে পাঠায় সোনালিচাঁপাকে, বলল, সোনালিচাঁপা, তুমি তো অনেকদিন ধরে বলছিলে তুমি একা-একা কোনও একটি তদন্তে যেতে চাও, তাই না?

গোলগাল চেহারা, ফুলো-ফুলো মুখের মেয়েটিকে আজ ভারি মিষ্টি লাগছে। গার্গীর মুখের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করছিল গার্গী ঠিক কী বলতে চায়।

—সোনালিচাঁপা, তুমি নিশ্চয় এ ক-দিনে বুঝতে পেরেছে বিবেক দ্বিবেদী নামের একজন বিজনেসম্যান কীভাবে কিডন্যাপড্ হয়েছিল ও তারপর খুন হয়েছে নৃশংসভাবে। বিবেকবাবুর ড্রাইভারকে তার পর থেকে আর পাওয়া যাচ্ছে না।

সোনলিচাঁপা অস্ফুটকণ্ঠে বলল, জানি।

—সেই ড্রাইভারকে এখন খুঁজে বেড়াচ্ছে পুলিশ।

সোনলিচাঁপা তখনও বুঝে উঠতে পারছে না হঠাৎ এ-প্রসঙ্গ আসছে কেন?

—দ্যাখো, সোনালি, তোমার বয়স এখন খুবই অল্প। কিন্তু তোমার মধ্যে এক ধরনের জিজ্ঞাসু মন আছে যার সাহায্য প্রয়োজন আমার।

সোনালিচাঁপা যেন বুঝতে পারছে অথচ পারছে না এমন ভঙ্গিতে বলল, কিছু করতে হবে?

—হ্যাঁ। তুমি যাদবপুর পেরিয়ে বাঘা যতীন কলোনিতে যাবে। এই হল বাড়ির নম্বর। সঙ্গে একটা গাড়ি দিয়ে দিচ্ছি, সেই সঙ্গে একজন ড্রাইভার-কাম-বডিগার্ড। ঠিকানা খুঁজে বার করবে রোহনের বাড়ি। রোহনের বউ ভীষণ শকড্। তুমি তার বাড়ি গিয়ে যে-করেই হোক জেনে আসবে রোহন এখন কোথায় আছে?

সোনালিচাঁপার বুকের ভিতর হঠাৎ একরাশ কাঁপ। কোনও বিপদে পড়বে না তো? অস্ফুটকণ্ঠে বলল, চেষ্টা করে দেখি, গার্গীদি।

বলল বটে, কিন্তু একা যেতে হবে ভেবে সোনালিচাঁপার ভিতর যুগপৎ আশঙ্কা ও রোমাঞ্চ।

১৩

বিবেক দ্বিবেদী হত্যা রহস্য উন্মোচনের তদন্তে একা চলেছে এক অচেনা গন্তব্যে ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠছিল সোনালিচাঁপা। তাও কিনা যাচ্ছে সেই রোহন ড্রাইভারের বাড়ি যার বিরুদ্ধে উঁচোন রয়েছে অভিযোগের আঙুল। এমন বড়ো একটা ষড়যন্ত্রে রোহনের জড়িত থাকার ব্যাপারটা খুব বিস্মিত করছিল সোনালিচাঁপাকে।

বিবেক দ্বিবেদীকে কখনও চোখে দেখেনি সোনালিচাঁপা, রোহনকে দেখার প্রশ্নই নেই, সেই না-দেখা মানুষদের নানা বিপর্যয় নিয়ে তাকে মাথা ঘামাতে হবে তা ছিল তার ভাবনার বাইরে। কসবার ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে বাঘা যতীন কলোনির দিকে যাওয়ার পথে সে মগজে গুছিয়ে নিচ্ছিল পূর্বাপর কাহিনি। পুলিশ ইতিমধ্যে ঘুরে এসেছে রোহনের আস্তানা থেকে। কিন্তু তার নিরক্ষর স্ত্রীর কাছ থেকে কিছু জানতে না-পারায় রোহনের গতিবিধি এখনও ঘোর কুয়াশায়।

শুধু একটাই সূত্র গার্গীর কাছ থেকে জেনে এসেছে রোহনের গ্রামের বাড়ি বিহারের শিমুলতলায় কোনও এক অজ পাড়াগাঁয়ে।

সূত্রটি তার হাতের ঈষৎ স্থূলাকার আঙুলে জড়াতে জড়াতে সোনালিচাঁপা একসময় পৌঁছে গেল বাঘা যতীনের জ্যামজটিল মোড়ে, সেখান থেকে ঠিকানা অনুসরণ করে লাট খেতে শুরু করল কলোনির ভিতর এক জটিল গোলকধাঁধায়।

বেশ গা ছমছম করছে প্রধান রাস্তা থেকে এতটা ভিতরে সেঁধিয়ে আসায়। প্রতিটি বাড়ির ঠিকানা পড়ছে ও এগোচ্ছে তার পরের ঠিকানার খোঁজে। একজন মোচঅলা লোকের কাছে ঠিকানা জানতে চাওয়ায় কেমন সন্দেহজনক ভঙ্গিতে তাকাতে থাকে তার দিকে। তারপর তর্জনী উঁচিয়ে যেদিকে দেখাল তা সোনালিচাঁপার কাছে অন্ধের হস্তিদর্শনের মতো। সেই পথ অনুসরণ করে একসময় যে-গলিটির সামনে এসে গাড়ি ব্রেক কষে সে-গলিতে গাড়ি কেন রিকশও যাবে না।

বাধ্য হয়ে গাড়ি থেকে নামল সোনালিচাঁপা, ড্রাইভার মৃদুলবাবুর দিকে অসহায় চোখে তাকিয়ে বলে, আপনি এখানে অপেক্ষা করুন, মৃদুলদা, আমি খুঁজে বার করি বাড়িটা।

মৃদুলবাবুকেও হতাশ দেখায়, গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করে বললেন, আমি আপনার সঙ্গে যাব?

সোনালিচাঁপা চাইছিল মৃদুলবাবু তার সঙ্গে যাক রোহনের বাড়ি পর্যন্ত, কিন্তু মুখে সে-কথা বলতে লজ্জাই পেল এই মুহূর্তে, মুখে বলল, না না, যেতে হবে না, আমি দরকার হলে আপনাকে খবর দেব।

অতএব একবুক সাহস সঞ্চয় করে সোনালিচাঁপা রওনা দেয় সেই গলি বরাবর। গলির ভিতরে গলি, তস্য গলি, এরকম কিছু কানাগলিতে ঠোক্কর খেয়ে অবশেষে যে-বাড়িটির সামনে পৌঁছোল তার টালি-ছাওয়া হতশ্রী চেহারা দেখে সোনালিচাঁপা তাজ্জব। তার হতভম্ব দাঁড়িয়ে থাকা দেখে হঠাৎই কোত্থেকে ফুঁড়ে বেরোলেন একজন মধ্যবয়স্ক, কিন্তু বলশালী চেহারার মানুষ, হেঁড়ে গলায় দেহাতি টানে হুঙ্কার ছাড়লেন, কী চান?

সোনালিচাঁপা কিছুটা হকচকিয়ে গেল না তা নয়, কিন্তু প্রতি মুহূর্তে সে অপেক্ষা করছিল এমন কোনও অঘটনের জন্য। অপেক্ষা নয়, আশঙ্কা করছিল। লোকটির পরনে ঘন নীল রঙের একটি লুঙি, খালি গা, লুঙির কষির উপরে তার কালো বিশাল ভুঁড়ি, খালি গা, কাঁধে গামছা।

লোকটির মুখে দেহাতি টানের হিন্দি শুনেও সোনালিচাঁপা ঠিক ঘাবড়াল না, আন্দাজ করল সে রোহনকে ঠিক চিনবে কেন না দেহাতি মানুষরা কলকাতার এক-এক জায়গায় ভিড় করে বসবাস করে। বলল, রোহন কোথায় থাকে জানেন?

বাড়িটির সামনে একটি পেঁপেগাছ ঢ্যাঙা হয়ে দাঁড়িয়ে। তার পাশ দিয়ে একটি সরু রাস্তা সিমেন্টের বারান্দা পর্যন্ত। লোকটি সেদিকে আঙুল তুলে বলল, পেপারসে আয়া হ্যায়?

সোনালিচাঁপা খবরের কাগজের লোক কি না জানতে চাইতেই তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়ল, একটি চালু ইংরেজি কাগজের নাম করে বলল, হাঁ জি।

লোকটি সোনালিচাঁপার আপাদমস্তক জরিপ করে বলল, উধার যাইয়ে।

সোনালিচাঁপা একটু হাঁপ ছেড়ে ঢুকে পড়ল বাড়ির গেট খুলে, বারান্দার কাছে গিযে তার ভাঙাচোরা হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করল, কোঈ হ্যায় ঘরমে?

শব্দটা পুনরাবৃত্তি করার পর কোলে-বাচ্চা-সহ দেহাতি ঢঙে শাড়ি পরা একটি তরুণী ঘোমটা টেনে এসে বলল, আপ কৌন?

—ম্যায় পেপারসে আয়া।

রোহনের তরুণী বধূটির নাম সরসতীয়া তা জেনে নিয়েছে সোনালিচাঁপা। মেয়েটির করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চাইল রোহনের গতিবিধি সে জানে কি না! গার্গীদি তার উপর যে-দায়িত্ব অর্পণ করেছেন সেই কাজ যদি ঠিকঠাক সম্পন্ন করে নিয়ে যেতে পারে তবেই সে পুনর্বার কোনও কাজের ভার পাবে। সোনালিচাঁপা বারান্দায় উঠে একটা ছিন্নচেহারার মোড়া নিয়ে বসে পড়ে, তরুণীকে বলে, বহিনজি, ম্যায়—

সোনালিচাঁপা তার আসার উদ্দেশ্য বলে, কিন্তু একটু ঘুরিয়ে। পুলিশ বার দুই তাদের আস্তানায় ঘুরে যাওয়ার পর তরুণী খুবই শঙ্কিত। কোলের বাচ্চাটিকে নামিয়ে দিতে সে টলতে টলতে হেঁটে বেড়াচ্ছে বারান্দা জুড়ে। একবার সোনালিচাঁপার কাছে এসে দাঁড়ায়, তার শালোয়ার-কামিজ পরা হাঁটুতে ভর দিয়ে কিছু একটা বলার চেষ্টা করে হিজবিজবিজ কণ্ঠস্বরে। অবশ্য কিছুই বোধগম্য হল না সোনালিচাঁপার কানে। পরক্ষণেই সে চইচই করে ছুটে গেল কিছুটা, টাল খেয়ে পড়তে গিয়ে সামলায়। তার মা বসে আছে বারান্দার মেঝেতে সোনালিচাঁপার কাছেই, কিছুটা জড়োসড়ো ভঙ্গিতে।

সোনালিচাঁপা কথা বলতে শুরু করে খুবই সতর্কভঙ্গিতে। জানতে চায় রোহন সাধারণত কখন বাড়ি থেকে বেরোয়, কখন রাতে ঘরে ফেরে, মালিকের সঙ্গে তার সম্পর্ক কেমন, রোহন সরসতীয়াকে কেমন ভালোবাসে, বাচ্চাকে কতখানি ভালোবসে ইত্যাদি টুকটাক প্রশ্নের পর সে ক্রমে ঢুকতে চায় রোহনের গতিবিধি সম্পর্কে।

রোহনের কথা বলতে গিয়ে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে সরসতিয়া। তাকে বিয়ে করে কলোনির এই ঘরটিতে এসে উঠেছিল রোহন। দু-বছর, না তিন-বছর, না চার-বছর—ঠিক কতদিন আগে তাদের বিয়ে হয়েছিল হিসেব করে বলতে পারে না সরসতিয়া। কিন্তু এই ঘরখানিতে এসে সংসার পাতার পর আর একদিনের জন্যও বাইরের পৃথিবীর মুখ দেখেনি নিতান্ত সরল, নিরক্ষর এই তরুণীটি। টিপিকাল দেহাতি মুখ, মোটের উপর সুশ্রী দেখতে, কিন্তু গত কয়েকদিন কান্নাকাটির ফলে শুকিয়ে গিয়েছে তার গমরঙা মুখ। চোখের কোণদুটো ফোলা। দুই গালে চোখের

জলের শুকনো দাগ। সোনালিচাঁপা মুহূর্তে অনুভব করে রোহন বাড়ি না-ফেরার কারণে তার পৃথিবী শূন্য, ধূসর। তার ঘরে যে-দানাপানি আছে তাতে বড়োজোর আর চার-পাঁচদিন চলবে। যদি রোহন এর মধ্যে না ফেরে তার গতি কী হবে তা সে জানে না। বাচ্চাটাও মাঝেমধ্যে বাবাকে খুঁজছে এদিক-ওদিক।

রোহন সম্পর্কে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করে সোনালিচাঁপা, সরসতিয়া, রোহন সাধারণত কখন বেরিয়ে যেত বাড়ি থেকে?

—কোই ঠিক নেই, দিদি। কভি সুবামে, কোভি বেলা দশ সাড়ে দশ। মোবাইলমে যব রিংরিং হোতা তব—

—আর কখন ফিরত?

—সোওভি কোই ঠিক নেহি। রাত এগারো বারো—

সোনালিচাঁপা ক্রমে জেনে যায় রোহনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কোনও ঠিক ছিল না। তার কাছে রাখা থাকত একটি মোবাইল, সেই মোবাইলে যখনই তার ডাক পড়ত অমনি পোশাক বদলে সে প্রায় ছুটে বেরিয়ে যেত মালিকের বাড়ির উদ্দেশে। ফেরারও কোনও ঠিক থাকত না। কখনও খুব ভোরে বেরিয়ে ফিরত রাত বারোটার ওপারে। আবার এক-একদিন অনেক রাত হলে ফিরতে পারত না ঘরে।

—কোথায় থাকত রোহন?

খুব নিরীহকণ্ঠে একটার পর একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছে সোনালিচাঁপা, আর নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছে তার জেরা করার ভঙ্গিতে। গার্গীদির সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সেও কি গোয়েন্দা হয়ে যাবে একদিন? কিন্তু সরসতিয়ার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে খুব মন খারাপ হয়ে যাচ্ছিল তার। রোহন যদি কয়েকদিনের মধ্যে না ফেরে, নির্ঘাত প্রবল দারিদ্র্যের মধ্যে পড়বে সরসতিয়া। কিন্তু রোহনের ফেরারও তো কোনও উপায় নেই। সোনালিচাঁপা শুনেছে রোহনের বাড়ির উপরে নজর রাখছে পুলিশ। যে-মুহূর্তে সে বাড়ি ফিরবে অমনি গ্রেফতার করবে তিতিক্ষাদের ড্রাইভারকে। তা হলে সরসতিয়ার কী হবে?

গার্গীদির মুখে তিতিক্ষার কথা যা শুনেছে তাতে জানে রোহনের নাম শুনলেই চোখে আগুন ঝরছে সেই শিল্পীযুবতীর। ঝরারই কথা। রোহনের কারণেই যদি তিতিক্ষার জীবন শূন্য হয়ে যায়, তা হলে তিতিক্ষা কি কখনও ক্ষমা করতে পারবে রোহনকে!

এমন জিজ্ঞাসাবাদের ফুরসতে সোনালিচাঁপা ভাবছিল এরকম একটি ঝঞ্ঝাটের মুখোমুখি হবে তা কয়েকদিন আগেও তার ভাবনার পরিধির মধ্যে ছিল না। যাদের সে কখনও দেখেনি, নামই শোনেনি, তাদের জীবনযাপনের শরিক হয়ে কেমন অস্থির হচ্ছিল তার মগজের অন্দরমহল।

একজনের স্বামী আর একজনের স্বামীকে খুন করে উধাও হয়ে গেছে এ হেন এক জটিল পরিস্থিতিতে পরস্পরের শত্রু হওয়াই তো স্বাভাবিক।

সরসতিয়া হঠাৎ কেঁদে উঠে বলল, দিদি, ও মার্ডারি নাই করবে।

পুলিশের আনাগোনা ও জিজ্ঞাসাবাদে সরসতিয়া জেনে গেছে রোহনের বিরুদ্ধে পুলিশের কী অভিযোগ। সরল, নিরক্ষর হলেও সরসতিয়া এও জেনেছে রোহনের ও সেই সঙ্গে তার ভবিতব্যও।

রোহন খুন করেছে, না কি অন্যকে সাহায্য করেছে খুন করতে সেই বাস্তব চিত্রটি কবে স্পষ্ট হবে, না কি আদৌ হবে না তা জানে না কেউই। আপাতত সোনালিচাঁপা এসেছে পলাতক রোহনের সম্ভাব্য গতিবিধির সন্ধানে। কিন্তু সেই প্রশ্নে যাওয়ার আগে সোনালিচাঁপা খুব সতর্ক ভঙ্গিতে ঢুকছে সরসতিয়া-রোহনের জীবনযাপনের গভীরে।

সোনালিচাঁপা হঠাৎই জিজ্ঞাসা করে, তোমার বাড়িতে কেউ নেই?

সরসতিয়া ঘাড় ঝাঁকায়, নেই।

—তোমার বাবা-মা-ভাই-বোন?

সরসতিয়া শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ঘরের চালের টালিতে।

—কেউ নেই তোমার?

সরসতিয়া বোধহয় আনমনে খুঁজে চলেছে তার ক্ষুদ্র জীবনপঞ্জি। খুঁজে কি হয়রান হচ্ছে, না—

—কেউ নেই তোমার? তাই কি হয়, বহিনজি? তুমি খুলে বলো সব।

সরসতিয়া বুঝে গেছে তার ভবিতব্য এখন সুতোয় ঝুলছে। প্রতি মুহূর্তে সে অপেক্ষা করছে রোহন নিশ্চয় তার কাছে ফিরে আসবে। কিন্তু এখন পুলিশের ঘন ঘন আনাগোনা, খবরের কাগজের লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ, পাড়ার লোকদের খোঁজখবর নেওয়া—সব মিলিয়ে সে বুঝতে পারছে তার বিপন্নতার তীব্রতা। সোনালিচাঁপার প্রশ্নে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল সুশ্রীমুখের মেয়েটি। সোনালিচাঁপার কণ্ঠস্বরের সমবেদনা তাকে দুর্বল করে ফেলল সহসা, হঠাৎ হু হু করে বলে ফেলল তার জীবনের করুণ অধ্যায়টি।

সরসতিয়াদের দেশবাড়ি বলতে বিহারের মানভূম অঞ্চলে। সে দেশে মেয়ে হওয়া মানেই প্রায় অভিশাপ। মেয়ের বিয়ে দিতে সর্বস্বান্ত হয়ে যায় এক-একটি পরিবার। তবু আর পাঁচটা মেয়ের মতো সরসতিয়াও ভাবছিল তারও বিয়ে হবে, ঘর করতে যাবে শ্বশুরঘরে।

তার যখন পনেরো বছর বয়স, বিয়ের কথাবার্তা চলছে, সেসময় তাদের দেশের একজন লোক তার বাবাকে এসে বলল, ভালো পাত্র আছে কলকাতায়, সে তাদের মেয়েকে নিয়ে যেতে চায় ভালো ঘরে বিয়ে দেবে বলে।

সরসতিয়া লক্ষ করেছিল তার বাবার মুখে চকচক করছিল এক অদ্ভুত উল্লাস।

সেই লোকটির কথায় রাজি হয়ে তাকে যেতে দিল কলকাতায়। সরসতিয়া তখনও একবারও অনুমান করতে পারেনি কোন অন্ধকারের জগতে সে পৌঁছোবে তার ক-দিন পরেই। আসলে তার বাবা কিছু টাকার বিনিময়ে তাকে বিক্রি করে দিয়েছিল সেই লোকটির কাছে। কলকাতায় একটি 'ভালো' বাড়িতে একজন আধাবৃদ্ধ লোকের ফ্ল্যাটে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে কাটানোর পর হাতবদল হয়ে সে পৌঁছোল আর এক কোঠিতে। তারপর আরও কয়েকবার হাত বদল হয়ে তার ঠাঁই হয়েছিল কলকাতার এক লাল-আলো মার্কা পল্লিতে।

ততদিনে যা বোঝার বুঝে গেছে সরসতিয়া। সেখানেই কয়েকদিন পরে তার খদ্দের হয়ে এসেছিল রোহন। তারপর বেশ কয়েকদিন রোহন আসে তার মোহে পড়ে। একদিন হঠাৎ তাকে বলেছিল, আমাকে তুমি কি বিয়ে করতে রাজি আছ?

সরসতিয়া বিশ্বাস করেনি তার কথা, কিন্তু সে তখন মুক্তি চাইছিল সেই অন্ধকার সুড়ঙ্গ থেকে। একদিন দুজনে পালিয়ে চলে এসেছিল এই কলোনির ঘরে, আর এখান থেকে কোথাও যায়নি, যেতে চায়ওনি সে।

সরসতিয়ার আশ্চর্য জীবনকাহিনি শুনে চমৎকৃত সোনালিচাঁপা। রোহনকে যতটা নিষ্ঠুর প্রকৃতির ভেবেছিল ততটা বোধহয় নয়। হয়তো কিছু দুর্বৃত্তের পাল্লায় ও প্রলোভনে পড়ে এমনটি ঘটিয়ে ফেলেছে সেদিন। তার ঘরের ছিন্ন দশা দেখেই অনুমান করা যায় কী ভয়ংকর দৈন্যের মধ্যে তার দিনযাপন।

সরসতিয়া কাঁদছিল ফুঁপিয়ে। কাঁদতে কাঁদতে কথা বলছিল জড়ানো, অস্পষ্ট কণ্ঠস্বরে।

তাকে কিছুক্ষণ সময় দিয়ে সোনালিচাঁপা অপেক্ষা করছিল তাকে আর একটু কথা বলানোর জন্য। একটু পরে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, সরসতিয়া, রোহন কোথায় যেতে পারে তা কি তুমি একটুও অনুমান করতে পারো না? তোমার বেঁচে থাকার কারণেই তো তাকে খুঁজে পাওয়া প্রয়োজন।

সরসতিয়া এক চোখ জল নিয়ে ঘাড় নাড়তে শুরু করে অসহায়ের মতো।

—আচ্ছা, বহিনজি, রোহনের দেশ থেকে কখনও কোনও চিঠি আসেনি?

—চিট্‌ঠি?

—হ্যাঁ। ভালো করে মনে করে দেখো তো, এই ক-বছরের মধ্যে কখনও কোনও চিঠি এসেছিল কি না রোহনের নামে?

সরসতিয়া তখন তার মনের গভীরে ডুবুরি নামাচ্ছে তো নামাচ্ছেই কোথাও যদি তল খুঁজে পাওয়া যায়। তার হয়তো এই ক-মিনিটে মনে হয়েছে সোনালিচাঁপা পত্রকার হলেও তার ভালোই চাইছে এই মুহূর্তে।

অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে হঠাৎ ঘরের ভিতরে চলে গেল। গেল তো গেল, তার আর বারান্দায় বেরোনোর নাম নেই। সোনালিচাঁপা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে একটু গলা তুলে ডাকল, বহিনজি?

বহিনজি বেরোল আরও কিছুটা পরে, তার হাতে একটি পোস্টকার্ড। সেটি সোনালিচাঁপার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, ইয়ে চিট্‌ঠি আয়া দো-তিন সাল পহলে।

সোনালিচাঁপার বুকের কোথাও মেঘপুঞ্জের ঘর্ষণ ও বিজলির চমক। বোধহয় এতখানি উজিয়ে সে যা চাইছিল এই সেই আলোর ফুলকি। চিঠিটি উল্টেপাল্টে দেখে একবর্ণও বোধগম্য হয় না তার। হিন্দিতে জড়িয়েমড়িয়ে লেখা চিঠিটিতে কী লেখা আছে তা বহু চেষ্টা করেও উদ্ধার করা বোধহয় অসম্ভব। ইতস্তত করে বলল, চিঠিটা একদিনের জন্য নিয়ে যাব, বহিনজি?

সরসতিয়ার কাছে তখন চিঠিটা এক বেঁচে থাকার সলতে। কিন্তু সোনালিচাঁপার উপর তার খুব ভরসা তখন। ঘাড় নেড়ে সায় দিল এই ভেবে যে, হয়তো এই পত্রকার দিদি তার রোহনের খবর জোগাড় করে এনে দেবে।

কিছুক্ষণ পরে ঘরে ফিরে যাওয়ার সময় হয় সোনালিচাঁপার। ঘড়িতে তখন ন-টা বেজে দশ। গার্গীদি বলেছেন সে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন তিনি। ইতিমধ্যে মোবাইলে একবার খবরও নিয়েছেন ঘটনার গতিপ্রকৃতি বিষয়ে।

ফেরার পথে সোনালিচাঁপা তখন একঝলক ভেবে নিচ্ছে রোহনের সংসারের অবস্থান।

কসবার নতুন ফ্ল্যাটে পৌঁছে দেখল গার্গী তার জন্য প্রতীক্ষায়। গাড়িতে উঠে মোবাইলে চিঠির সংবাদটি দিয়েছিল আগেই। সেই সঙ্গে চিঠিটির দুর্বোধ্যতার কথাও। গার্গীও তার হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে কিছুক্ষণ ব্যর্থ চেষ্টার পর বললেন, দেখি, আমাদের অফিসের একজন বেয়ারার আছে যার দেশ মানভূম অঞ্চলে। তার সাহায্য নিলে যদি উদ্ধার করা যায় এই পুঁথি।

গার্গীদির অসাধারণ সেন্স অফ হিউমার।

—গার্গীদি, রোহন কিন্তু একটা কথা ঠিকই বলেছিল সরসতিয়া তার বিবাহিত স্ত্রী নয়—

—হ্যাঁ, রোহন সম্পর্কে সেরকমই তো বলেছিল তিতিক্ষা। রোহন বলেছিল এ বিয়েটা তো ঠিক সেই বিয়ে নয়।

—কথাটা মিথ্যে নয়। কিন্তু সেই সঙ্গে এও জেনে এলাম রোহন খুবই দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটায়।

গার্গীদি সায় দিয়ে বললেন, প্রাইভেট গাড়ি চালায় এমন একজন ড্রাইভার ক-টাকাই বা আর বেতন পায়! সেই বেতনে সংসার চালিয়ে বাচ্চা মানুষ করা আরও

কঠিন ব্যাপার। হয়তো দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ায় বাধ্য হয়ে প্রলোভন সামলাতে পারেনি রোহন।

সেদিনই দুপুরে অফিসে গিয়ে পোস্টকার্ডটির লিপি উদ্ধার করতে সমর্থ হয় তারা। বছরতিনেক আগে লেখা চিঠিটি লিখেছিল রোহনের বাবা বিজয়, তাতে লেখা আছে রোহনের বিয়ের কথা প্রায় পাকা। রোহন যেন পত্রপাঠ দেশে ফিরে আসে বিয়েটা সেরে ফেলতে।

রোহন সেই চিঠি পেয়ে দেশে গিয়েছিল কি যায়নি তা তো আর জানা গেল না। কিন্তু যা জানা গেল শিমুলতলা থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে লেবুপাহাড়ের কাছে সোনাঝুরি গ্রাম—সেখানেই রোহনের দেশের বাড়ি। বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম হতেই গার্গী টেলিফোনের বোতাম টেপে, ডি সি ডি ডি বলছেন? দেখুন—

১৪

মার্চের ঘোর দুপুরে রোদ্দুরের তাপ তুঙ্গে, সেই রোদ্দুরের পারদে আরও একটু চাপ বাড়িয়ে গার্গী ফোন করছে পুলিশ হেডকোয়ার্টারের এক ভারী গোয়েন্দাকর্তাকে।

ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি কমিশনার ওদিকে ফোন ধরে আছেন, আর গার্গী গড়গড় করে বলে চলেছে, মি. পুরকায়স্থ, বিবেক দ্বিবেদীর খুনিকে যদি ধরতেই হয় তবে তার ড্রাইভার রোহনকে খুঁজে বার করাই এই মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরি।

—আমরা তো যথাসাধ্য চেষ্টা করছি রোহনকে ট্রেস করতে। কিন্তু ম্যাডাম, লোকটি জলজ্যান্ত হাওয়া গেল কলকাতা থেকে খুব আশ্চর্য লাগছে আমাদের।

অরিজিৎ পুরকায়স্থ কলকাতা পুলিশের একজন নামকরা অফিসার, ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে আসার পর পুলিশের সুনাম অনেকটা বাড়িয়েছেন তাঁর উপস্থিতবুদ্ধি ও অসম্ভব তৎপরতার গুণে। নাকের নীচে মস্ত একজোড়া গোঁফ ও আপাতরুক্ষ চেহারার কারণে 'খুব টাফ' বিশেষণটি কী করে যেন আটকে গেছে তাঁর গুণাবলির সঙ্গে। তাঁর কিছু মুদ্রাদোষের অন্যতম হল প্রতি কথার উত্তরে 'আই সি', 'আই সি' বলা। কিছুদিন আগে একটি মাল্টি-স্টোরিড বিল্ডিংয়ের এগারো তলায় একা বসবাস করতে থাকা এক বৃদ্ধা খুন হয়ে যাওয়ায় সারা কলকাতা তোলপাড়। অরিজিৎ পুরকায়স্থ অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা দেখিয়ে তিনদিনের মধ্যে পাকড়াও করেছিলেন কালপ্রিটদের। সেই সঙ্গে নগদে ও গয়নায় মিলিয়ে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকার মতো। আজও গার্গীর ফোন পেয়ে বললেন, আই সি, তা হলে তো একটা টিম এই মুহূর্তে শিমুলতলা পাঠাতে হয়।

—শিমুলতলায় তাকে পাওয়া যাবেই তা বলছি না। কিন্তু শিমুলতলায় রোহনের বাড়িতে খবর নিলে তার সম্ভাব্য থাকার জায়গা কিংবা বর্তমান গতিবিধির একটা হদিশ পাওয়া যেতে পারে। আপনি বরং টিম না পাঠিয়ে ওখানকার এস পি-কে পাত্তা লাগাতে বলুন। রোহন এর মধ্যে শিমুলতলা এসেছিল কি না। যদি এসে না থাকে তার বাড়ির লোক কোনও খবর রাখে কি না।

—আই সি, আই সি।

—কিংবা তার আত্মীয়স্বজন কোথায় কে আছে।

—আই সি, আই সি। আমি দেখছি এখনই।

—এ সব ক্ষেত্রে অপরাধী মাল লুকোনোর জন্য নিজের দেশ-গাঁ-ই বেছে নেয় তা আপনি তো জানেনই।

—আই সি, আই সি। রাইট ইউ আর, ম্যাডাম। অপরাধীরা ভাবে কলকাতা থেকে পালিয়ে গণ্ডগাঁয়ে গিয়ে লুকিয়ে থাকলেই পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়া যাবে।

—মি. পুরকায়স্থ, আপনি কি জানেন গণ্ডগ্রাম মানে কিন্তু এলেবেলে গাঁ নয়? গণ্ডগ্রাম শব্দটির আক্ষরিক অর্থ বড়ো গ্রাম। বিশিষ্ট গ্রাম।

—আই সি, আই সি। ম্যাডাম, পুলিশের চাকরি করতে এসে আমরা এখন শুধু কোড আর অ্যাক্ট পড়ি।

গার্গী হেসে বলল, সে তো জানিই।

—না না পুরোটা জানেন না। পড়ি ইন্ডিয়ান পেনাল কোড, ক্রিমিনাল প্রোসিডিওর কোড আর ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট। পড়ি পুলিশ ম্যানুয়াল। আর—

—আর?

—আর কথাও বলি কোডে। মানে কোড ল্যাঙ্গুয়েজে।

গার্গী বলে ওঠে, হ্যাঁ, হ্যাঁ। কী সব কোড ল্যাঙ্গুয়েজ আছে আপনাদের লাইনে।

—সেই সঙ্গে অ্যাক্ট করি। অ্যাক্ট মানে আবার দু-রকম। কাজ করতে হয়, আবার অভিনয়ও করতে হয়।

—ভালো বলেছেন তো!

—তাই অ্যাক্ট আর কোডের বাইরে আমাদের পড়াশুনো করার বা ভাবার কোনও সময় নেই। আপনি হয়তো জানেন না পুলিশের চাকরিতে যারা ঢোকে নাইনটি পারসেন্ট সময় ক্রিমিনালদের সঙ্গে কথা বলতে হয় তাদের। সারাদিন ক্রিমিনালদের পিছনে ছুটতে হয়। তারপর ভালো লোকের সঙ্গে কথা বলতে গেলেও মনে হয় তারা ক্রিমিনাল।

গার্গী হেসে উঠে বলল, তা হলে কি আমাকেও আপনার ক্রিমিনাল মনে হচ্ছে?

—না, ম্যাডাম। আমরা এক মিনিট কারও সঙ্গে কথা বললেই বুঝে যাই লোকটার কী উদ্দেশ্য কী চায়। ওই যে বলে না, হা বললেই বুঝতে হবে লোকটা হাওড়া যেতে চাইছে।

—সে যাই হোক, অন্য কোনও খবর পেলেন এ বিষয়ে?

—হ্যাঁ। আই ও, মানে ইনভেস্টিগেটিং অফিসার দেবজ্যোতি নাগ রায় জানাল তিতিক্ষাকে মানে মিসেস দ্বিবেদীকে কে বা কারা নিয়মিত থ্রেট করছে টাকার জন্য।

—সে কী? গার্গী চমকে ওঠে, কখন জানা গেল ঘটনাটা?

—এই তো একটু আগে। কালপ্রিটদের ধারণা বিবেক দ্বিবেদীর বাড়িতে প্রচুর লিকুইড মানি আছে। সেই কারণেই তারা বিবেককে টার্গেট করেছিল, বিবেককে কিডন্যাপ করে টাকা চেয়েছিল, তার কাছে টাকা না-পাওয়ায় তারা অলীকশেখরের কাছে টাকা চেয়েছিল, কিন্তু সব রকম চেষ্টা করেও তারা টাকা পায়নি। বিবেককে হত্যা করে পেয়েছে কিছু চেক। তারা জেনে গেছে সেই চেক ভাঙানো অসম্ভব। ফলে এখন তাদের টার্গেট তিতিক্ষা। তারা জানে তিতিক্ষাকে কিডন্যাপ করলেই তিতিক্ষার বাবা বাধ্য হবেন টাকাটা দিতে।

—কী সর্বনাশ! গার্গী কিছুক্ষণের জন্য স্থাণু। এই তো তার সঙ্গে তিতিক্ষার সঙ্গে কাল সারা সকাল কাটিয়েছে, তখন তিতিক্ষাকে বেশ নিশ্চিন্ত দেখাচ্ছিল। তারপর হঠাৎ আবার এই অঘটন।

—মি. পুরকায়স্থ, তিতিক্ষাকে কি সিকিউরিটি দিচ্ছেন আপনারা?

—আমি মিসেস দ্বিবেদীর কাছে জানতে চেয়েছিলাম সিকিউরিটি চাইছেন কি না! তো বললেন, 'আমি এখন কোথাও বেরোচ্ছি না। ঘরে দরজা বন্ধ করে ক-দিন শুধু আঁকব। প্রচুর ছবি আঁকতে হবে এখন। তা ছাড়া আপনারা তো আমার গাড়িটিকে থানায় আটক করে রেখেছেন। বেরোব কী করে?' তো বললাম, 'কোর্টে তো আপনি লইয়ার লাগিয়ে রিলিজ অর্ডার বার করছেন, অর্ডার দেখালেই আপনার গাড়ি পৌঁছে দেব।' তখন বললেন,' ঘোড়া চালাতে গেলে যেমন জিন লাগে, গাড়ি চালাতে গেলে ড্রাইভার লাগে। আমার ড্রাইভার কোথায় যে গাড়ি নিয়ে বেরোব!'

গার্গী ভাবছিল তিতিক্ষাকে একবার ফোন করে জেনে নেয় কবে কে থ্রেট করেছিল, তাদের গলার স্বর তার চেনা মনে হয়েছে কি না। কিন্তু আপাতত সেই কৌতূহল বাটিচাপা দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আর কোনও খবর পেলেন এর মধ্যে?

—না, ম্যাডাম। দেবজ্যোতি নাগ রায় খুব চেষ্টা করছে। নাগ রায় ভালো অফিসার। ঘন ঘন আমাকে ফোন করে ইনস্ট্রাকশন্ চাইছে। কিন্তু এখনও কোনও কিনারা করতে পারেননি বিবেককে কারা কিডন্যাপ করেছিল বা কারা মার্ডার করেছে।

—শুনলাম কাল রাতে বিবেকের অফিস রেইড করেছেন আপনারা?

—হ্যাঁ, করতেই হল তার কোম্পানির বিজনেস সম্পর্কে আরও জানতে। রেইডের পর দেবজ্যোতি জানাল কিছু পাওয়া যায়নি। জানা যায়নি কাদের সে লক্ষ লক্ষ টাকার মাল সাপ্লাই করেছে। চারদিকে এত ঋণ করারই বা কী দরকার ছিল তার।

ঘটনাটা গার্গীর জানা বলে তা নিয়ে সময় নষ্ট করার প্রয়োজন মনে করল না।

—ম্যাডাম, আপনি কি জানেন ব্যাঙ্ক লোন ও পার্সোনাল লোন মিলিয়ে অন্তত আড়াই কোটি টাকা ঋণ করেছিল বিবেক। হয়তো অ্যামাউন্টটা বাড়তে পারে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, সেই টাকা বিবেক কীভাবে ইনভেস্ট করেছে তার কোনও হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না।

তথ্যগুলো সবই জানা বলে গার্গী প্রসঙ্গান্তরে যেতে চাইল, আর কিছু?

—না, তবে একটা খবর শুনে স্তম্ভিত হয়েছি।

অরিজিৎ পুরকায়স্থের স্বরে একরাশ আশ্চর্য।

—কী খবর? গার্গী ছটফট করে ওঠে নতুন কোনও অভাবিত খবরের প্রত্যাশায়।

—এত বড়ো একটা কাণ্ড ঘটে গেল অলীকবাবুর কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। যেন অকালকুষ্মাণ্ড জামাইয়ের হাত থেকে তাঁর মেয়ে রেহাই পেয়েছে দেখে তিনি নিশ্চিন্ত। এর মধ্যেই নাকি কাকে বলেছেন মেয়ের আবার বিয়ে দেবেন।

গার্গীও স্তম্ভিত। তিতিক্ষার বাড়ি থেকে ঘুরে এল সদ্য, কিন্তু তাতে একটুও আঁচ পায়নি এ বিষয়ে। তিতিক্ষাকেও দেখেছিল খুব রিল্যাক্সড মেজাজে। হয়তো ছবি বিক্রির আনন্দে, হয়তো ঋণমুক্ত হওয়ার স্বপ্নে।

তিতিক্ষা কি জানে তার বাবা তার বিয়ের ঠিক করে ফেলছেন এর মধ্যে?

গার্গীর ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না তিতিক্ষা ঘটনাটা জানে। সে যে বিবেককে ভালোবাসে, তার মৃত্যুতে ভয়ংকর আঘাত পেয়েছে তা তার কান্না, অসহায়তা, বিপন্নতা দেখে উপলব্ধি করতে পেরেছিল সেদিন। কয়েকদিন এতই মুহ্যমান ছিল যে ভালো করে কথাই বলতে পারছিল না সবার সঙ্গে। এখন হঠাৎ মোটা অঙ্কের টাকায় তার ছবি বিক্রি হওয়াতে কিছুটা ঋণমুক্ত হতে পারছে, হয়তো সে কারণেই তার মুখে কিছুটা তৃপ্তি ও স্বস্তি।

—আই সি, ম্যাডাম। অলীকশেখরের কাজেকর্মে আমি কিছু সন্দেহজনক এলিমেন্ট পাচ্ছি। তিনিই বিবেকের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে কাউকে সুপারি দিয়েছিলেন কি না সেটাই আমার সন্দেহ।

পুলিশের এই সন্দেহের কথা গার্গী আগেও শুনেছে, বিষয়টি তার মগজের গভীর কুলুঙ্গিতে ভরে নিয়ে বলল, শুধু আন্দাজ করলেই তো হবে না মি. পুরকায়স্থ। আপনাকে এভিডেন্স জোগাড় করতে হবে।

—ম্যাডাম, অনেক সময় গেস-এর উপর নির্ভর করে আমরা অ্যারেস্ট করেছি। তারপর জেরার উত্তরে এমন সব এভিডেন্স পেয়ে গেছি না শুনলে বিশ্বাস হবে না।

—কিছুই অসম্ভব নয়, মি. পুরকায়স্থ। কিন্তু এত বড়ো একজন বিজনেসম্যান। তাকে অ্যারেস্ট করার আগে আপনাকে তিনবার ভাবতে হবে।

—আই সি। আই সি। তিনবার কেন, ম্যাডাম, তেত্রিশবার ভাবতে হবে। কিন্তু আপনি কি জানেন অলীকশেখরের পাস্ট হিস্টরি?

—মি. পুরকায়স্থ, হিস্টরি সবসময়েই পাস্ট হয়।

—আই সি। কিন্তু আপনি কি জানেন ওঁর একটি কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর তিনদিনের জন্য নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে দেখেন তাঁর জায়গায় নতুন ম্যানেজিং ডিরেক্টর চার্জ নিয়েছেন বা বলা যায় চার্জ অ্যাসিউম করেছেন।

—তারপর?

—প্রাক্তন ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে নাকি হাপিস করে দিয়েছিলেন অলীকশেখর নিজেই!

—বলেন কি? গার্গীর ভুরুতে হিজিবিজি কাঁপ।

—আসলে যা শোনা গিয়েছিল ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে কিছুতেই সরাতে পারছিলেন না। তখন হিমালয়ের কোনও প্রত্যন্ত জায়গায় প্লেজার ট্রিপে পাঠিয়ে দিয়ে চেয়ারম্যান এই কাণ্ডটি করেছিলেন।

—কী আশ্চর্য!

—আশ্চর্যের নাকি অনেক কিছুই আছে অলীকশেখরকে জড়িয়ে। একবার তাঁর এক জেনারেল ম্যানেজারকে ধমকে ছিলেন এই বলে, আপনি যদি এরপরও ত্যান্ডাইম্যান্ডাই করেন তো চন্দ্রবিন্দু হয়ে যাবেন।

—কী আশ্চর্য, এরকম বলতে পারেন নাকি?

—বলেছেন বলেই খবর আমাদের কাছে। সেখানে কিন্তু ওঁর এমন দাপট যে মুখের উপর কেউ প্রতিবাদ করবেন সেরকম হিম্মত নেই কারও।

—বাহ্, তাই বলে আত্মসম্মানটুকুও তো রাখতে হবে!

—আত্মসম্মান রাখতে হলে চাকরি ছেড়ে তা বজায় রাখতে হবে। তা রেখেওছে কেউ কেউ। কিন্তু তাতেও বিপদ কম নয়।

গার্গী ভাবার চেষ্টা করছিল অলীকশেখরের দাপটের পরিসীমা।

—কীরকম বিপদ?

—একজন এম ডি ওঁর মুখের উপর রেজিনেশন লেটার লিখে ছুড়ে দিয়ে বলেছিল আপনার চাকরিতে আমি ইয়ে করে দি।

—ঠিকই তো করেছে।

—হ্যাঁ, কিন্তু তার পরিণাম হয়েছিল খুব ভয়ংকর।

—কী পরিণাম? গার্গীর বিস্ময় উত্তরোত্তর আকাশমুখো।

—সেই লোকটি কলকাতায় কোনও কোম্পানিতে আর চাকরি খুঁজে পায় না। অলীকশেখরকে খুশি করতে কোনও কোম্পানিই তাকে আর চাকরি দেয়নি বা দিতে পারেনি। শেষপর্যন্ত তিনি ব্যাঙ্গালোরে গিয়ে চাকরি পেলেন। তারপরেও নাকি অলীকশেখর চেষ্টা করেছিলেন তাঁর উপরঅলা কুনাল তলোয়ারকে ভড়কাতে। বলেছিলেন, মি. তলোয়ার, বি অয়ার অফ দিস জেন্টলম্যান। আপনার কোম্পানিকে লাটে তুলে দেবে।

—বাবাহ্, অলীকশেখর তো বেশ বর্ণাঢ্য চরিত্রের!

—এই তো শুনলেন হায়ার অফিসারদের কথা। এবার শুনুন কর্মীদের কথা। একবার কোনও একটি কোম্পানির এমপ্লয়িরা স্ট্রাইক করবে বলে হুমকি দিয়েছিল, তাদের বলেছিলেন, 'স্ট্রাইক করার অধিকার সবারই আছে। আপনারাও করতে পারেন, কিন্তু স্ট্রাইক শেষ করার পরে এসে হয়তো দেখলেন কম্পানির অফিস শিফট হয়ে চলে গেছে ব্যাঙ্গালোরে কিংবা পুনেয়। কিংবা এসে দেখলেন আপনাদের কোম্পানির অস্তিত্বই নেই। সেই সাইনবোর্ডে জ্বলজ্বল করছে অন্য একটি কোম্পানির নাম। ভিতরে অন্য ম্যানেজিং ডিরেক্টর, অন্য জি এম। আমার অনেকগুলো কোম্পানি, কোনটা কখন আছে বা নেই তাতে আমার কিছু যায় আসে না। কিন্তু আপনাদের যায় আসে। আসে কি না?'

গার্গী কিছুক্ষণ হতবাক। পরে বলল, লোকটির গাট্‌স্ আছে তাতে সন্দেহ নেই।

—আরও অনেক গল্প আছে তা পরে একদিন ফুরসত পেলে শোনাব। ভেরি ইন্টারেস্টিং ক্যারেকটার অ্যান্ড, ওই যা বললেন, কালারফুল।

—তা হলেও অলীকশেখর নিয়ে আরও একটু ভাবুন।

—সেই কারণেই তো গত কয়েকদিন ধরে কেবল ভাবছি আর ভাবছি।

গার্গী অতএব ডি সি ডি ডি-কে বিষয়টা আরও ভাবতে দিয়ে ফোন সমাপন করে দেয় তখনকার মতো। অলীকশেখর তাঁর নিষ্ঠুরতা ও দাপটের কারণে যদি বিখ্যাত হয়ে থাকেন তাঁর সম্পর্কে নানা গুজব রটতেই পারে। সেই রটনা কতটা সত্যি কতটা নয় তা নিয়ে চলতে পারে এক দীর্ঘ সেমিনার।

বড়ো বড়ো কম্পানির কর্ণধারদের নিয়ে এমন কত গল্প রটে, কত গল্প পল্লবিত হয় তার এক-আধটু খোঁজ গার্গীও রাখে সে নিজে একটি কম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করছে বলে। তবে অলীকশেখরের যে সামান্য পরিচয় এখনও পর্যন্ত পেয়েছে তা নিঃসন্দেহে ডায়েরিতে নোট করার মতো।

রাতে বাড়ি ফিরতে একটু দেরিই হয়ে গেল সেদিন। ঘরে ঢুকে দেখল তাদের তিন বছরের মেয়ে লুনা একমুখ অভিমান নিয়ে তার সঙ্গে লড়াইয়ে তৈরি।

সোনালিচাঁপাও তার সঙ্গে ছিল বলে লুনার দায়িত্ব তাদের কাজের মেয়েটির উপরই ন্যস্ত ছিল এতক্ষণ। সোনালিচাঁপা সময়মতো অফিস থেকে ফিরলে লুনাকে সে-ই সামলায় রোজ। আজ নেই বলে একটু অঘটন।

লুনাকে সন্তুষ্ট করতে কিছুক্ষণ সময়। ততক্ষণে সায়নও ঘরে ফিরেছে তার নিত্যিদিনের রোজনামচা সেরে। কিছুক্ষণের মধ্যে সন্ধের পরেরকার জলছবি আবার যথাস্থানে। সায়ন তার হেলানো চেয়ারটিতে সংবাদপত্রের গুচ্ছ নিয়ে বিলীন। গার্গী আর সোনলিচাঁপা ঘরের টুকিটাকি নিয়ে ব্যস্ত। লুনা মেঝেয় খেলনা ছড়িয়েবিছিয়ে খেলছে একা একা।

চলমান সংসার একটু থিতু হতে বিষয়টা নিয়ে গার্গী আলোচনা করে সায়নের সঙ্গে। মৃদু হেসে অলীকশেখরের দাপটের কথা তুলতে সায়ন খবরের কাগজে মুখ ডুবিয়ে ছিল, মুখ তুলে বলল, শুধু যে অলীকশেখরই দায়ী তা নয়, কোম্পানিতে অনেক অফিসার আছেন যাঁরা হাতে ক্ষমতা পেলে ধরাকে সরা জ্ঞান করেন। ইচ্ছেমতো সিদ্ধান্ত নিয়ে ঝামেলা বাধান বোর্ড মিটিংয়ে। তখন কম্পানির সর্বময় কর্তাকে বাধ্য হতে হয় তাকে স্যাক করতে কিংবা সরিয়ে দিতে।

—কিন্তু পুলিশ এখন টার্গেট করেছে অলীকশেখরকে। হয়তো তাঁকে অ্যারেস্ট করতেও পারে।

সায়ন নির্বিকারভাবে বলল, করলে করুক। কিন্তু তাদের হাতে যথেষ্ট প্রমাণ আছে তো? নইলে কিন্তু অলীকশেখর ছেড়ে কথা বলবেন না।

—কি জানি পুলিশের কাছে কী খবর আছে।

—তুমি বলছিলে পুলিশ বিবেকের কোম্পানির অফিস রেইড করেছে?

—রেইড করে পুলিশ তাদের কোম্পানির যা কাগজপত্র পেয়েছে সমস্ত সিজ করেছে, কিন্তু তেমন কিছুই পায়নি যা থেকে কোম্পানির প্রোডাকশন বা সাপ্লাই সম্পর্কে কিছু অবহিত হওয়া যায়। তিতিক্ষা পুলিশকে বলেছে বিবেক বলত তার মাথাটাই একটি কমপিউটার। সেখানে সমস্ত তথ্য ঠাসা থাকে। এমনকী সমস্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টও সিজ করেছে, সেখানেও কোনও সন্ধান নেই এত টাকার।

সায়ন কিছুক্ষণ বিষয়টা নিয়ে ভাবল একমনে, তারপর বলল, বিবেক দ্বিবেদীর সমস্ত কাজকর্মই কিন্তু অনেক গোপনীয়তায় ভরা। বিবেক খুব সহজ চরিত্রের মানুষ ছিল বলে আমার মনে হচ্ছে না। হয় সে নিজেই টাকাটা সাইফন করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তার প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি। না হয় তার কোনও লুপহোলস ছিল যাকে ক্যাশ করতে চেয়েছিল কিছু অসৎ চরিত্রের মানুষ।

গার্গী বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করছিল সায়নের বিশ্লেষণ। কী দুর্বলতা থাকতে পারে বিবেকের?

১৫

অলীকশেখরকে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে নিয়ে গেছে ও তাঁকে গ্রেফতার করা হতে পারে এই সংবাদ পেয়ে গার্গী কিছুটা উৎকণ্ঠিত। সামান্য ব্রেকফাস্ট খেয়ে দ্রুত পৌঁছে গেল তিতিক্ষার কাছে। তিতিক্ষা তখন তার ভিতরের ঘরে অন্তরিন। মার্চের সকাল, বাইরের পৃথিবী গরমে আইঢাই করছে, কিন্তু তিতিক্ষার ছবি আঁকার ঘরটি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত হওয়ায় বেশ ঠাণ্ডা। গায়ের ঘাম দ্রুত শুকোতে শুরু করতে গার্গী কিছুটা স্বস্তিতে, কিছুটা অস্বস্তিতেও। এভাবে গায়ের ঘাম বসাটা স্বাস্থ্যকর নয়।

ঘরের ঠাণ্ডা একটু বেশিই, তবু তিতিক্ষা একটা পাতলা ম্যাক্সি পরে ছবি আঁকছে বিশাল একটি ক্যানভাসের সামনে দাঁড়িয়ে। টিউবের আলোয় ঝকঝক করছে ঘরের বরফসাদা দেওয়াল। তার মাঝখানে তিতিক্ষা তুলি হাতে দাঁড়িয়ে মগ্ন। গার্গীকে দেখে মুখে আলতো হাসি দুলিয়ে বলল, ভালোই হয়েছে তুমি এসেছ।

তিতিক্ষার ছবি দেখবে, না তিতিক্ষাকে তা ধন্দে ফেলবে কোনও আগন্তুককে। স্লিভলেস ম্যাক্সির বাইরে তিতিক্ষার সোনারং শরীর চোখ ঝলসে দেয় কয়েক মুহূর্ত। সি-থ্রু পোশাকের ভিতর তার উদ্ধত শরীরেও আশ্চর্য চমক। গ্রীষ্মের সকাল বলেই হয়তো অর্ন্তবাস পরার প্রয়োজনীয়তা বোধে করেনি সুন্দরী তিতিক্ষা।

কিন্তু তার চেয়েও বড়ো চমক তার ক্যানভাসে। এর আগেও নগ্নিকা আঁকতে দেখেছে তিতিক্ষাকে, কিন্তু এবারের ছবির ক্যানভাস আরও বড়ো ও তার ছবির নগ্নতাও বড়ো তীব্র।

গার্গী তার ছবির দিকে বিস্ময়াহত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেখে তিতিক্ষা বলল, শ্রাবণকুমার বলেছেন লাক্ষাদ্বীপের হোটেলে এরকম একটা ন্যুড সিরিজের ছবি টাঙাতে চান যাতে দেশিবিদেশি ট্যুরিস্টরা ভিড় করেন হোটেলের বোর্ডার হতে।

গার্গী মুখে হাসি ফোটাতে চেষ্টা করল, তোমার হাতে ন্যুড ছবি আসেও ভালো।

—তুমি ইতালির শিল্পী আমেদো মদিলিয়ানির ছবি নিশ্চয় দেখেছ?

গার্গী ছবি সম্পর্কে তত বিশেষজ্ঞ নয়, তবু হাসি-হাসি মুখে তাকিয়ে থাকে তিতিক্ষার দিকে।

—মদিলিয়ানির বিশেষত্ব ছিল ন্যুড আঁকায়। আমি ওঁর ছবির খুব ভক্ত। তাই হয়তো তাঁর কিছু প্রভাব আমার ছবিতেও আছে। তাঁর ছবিতে ভেনিশীয় শিল্পীদের উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার ছিল, আমিও চেষ্টা করি খুব গাঢ় রং ব্যবহার করতে।

তিতিক্ষা ব্যস্ত হয়ে পড়ে তার ছবির গুণাগুণ ব্যাখ্যা করতে। সেই সঙ্গে তার তুলিও চলছে নগ্ন নারীর শরীরের এখানে ওখানে।

একটু পরে তিতিক্ষা তার তুলি থামিয়ে ক্যানভাসের সামনে থেকে সরে এল

অনেকখানি। দূর থেকে দেখতে থাকে ছবিটিকে। তারপর কী মনে হতে আবার কাছে এল ক্যানভাসের। তুলিতে ঘন লাল রং মাখিয়ে ছবির নারীর ঠোঁট রক্তরঞ্জিত করতে থাকে প্রবল নিবিষ্টতায়।

কিছুক্ষণ পরে তুলি থামিয়ে বলল, বাবাকে ফোন করেছিল পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স থেকে।

গার্গী এই প্রসঙ্গই উত্থাপন করতে চাইছিল এতক্ষণ, কিন্তু শিল্পীর মগ্নতায় বাধা দেয়নি বা দিতে পারেনি। এবার বলল, এর আগেও তো কয়েকবার ইন্টারোগেট করেছে তাঁকে। হঠাৎ আবার?

—কী জানি, বোধহয় অ্যারেস্ট করতে পারে এরকম একটি গুজব বাজারে রটনা।

খুব নির্বিকার ভঙ্গিতে কথাগুলো বলল তিতিক্ষা, তাতেই বেশ অবাক হল গার্গী। যেন অলীকশেখরকে অ্যারেস্ট করলে তার কিছু যায় আসে না।

পরক্ষণে পাশের ঘরে টেলিফোন বাজতে তিতিক্ষা বলল, বাড়িতে থাকাই এখন দায়, গার্গীদি।

গার্গী ঠিক বুঝে উঠতে পারল না কেন।

—সারাক্ষণ ফোন বাজছে, রিসিভার তুললেই বলছে, কবে আমার টাকাটা দিচ্ছ?

খুব স্বাভাবিক এই তাগাদা, কিন্তু গার্গী চুপ করে থাকে তিতিক্ষার পরবর্তী সংলাপ শুনতে।

—যা অবস্থা, হয়তো আমাকে পালাতে হবে কোথাও।

গার্গী খুব অবাক হল তা নয়, তবু বলল, তুমি বললে শ্রাবণকুমারের চেকটা ক্যাশ হলে কিছু পাওনাদার ঠেকাতে পারবে।

—তা হয়তো পারব। কিন্তু কাল নীলার্ণব এসেছিল, বলল, মিসেস দ্বিবেদী, চেকটা এ সপ্তাহে ব্যাঙ্কে প্রেজেন্ট করবেন না।

—সে কী? গার্গীর মুখ থেকে কিছু বিস্ময় প্রকাশ পেয়েই গেল তার অজান্তে।

—হ্যাঁ। বলল, ব্যাঙ্কে দু-লাখ টাকা কম আছে, শ্রাবণকুমার সামনের সপ্তাহে টাকাটা জমা দিয়ে দিলেই—

গার্গীর কাছে বিষয়টা ভালো ঠেকে না। বলল, তা হলে তোমার উত্তমর্ণদের বলো তারাও যেন আরও এক সপ্তাহ অপেক্ষা করে। তোমার চেকটা ক্যাশ হলেই—

—সেরকমই তো বলেছি, গার্গীদি, কিন্তু দু-একজন এমন বিশ্রী কণ্ঠস্বরে বলছে—

গার্গী জানে অনেকেই ভাবছে তিতিক্ষার পক্ষে কিছুতেই টাকাটা ফেরত দেওয়া সম্ভব হবে না। যতদিন বিবেক জীবিত ছিল ভেবেছিল হয়তো টাকাটা ফেরত পাওয়া যাবে। এখন হতাশ হয়ে চাপ সৃষ্টি করছে তিতিক্ষার উপর।

—শ্রাবণকুমারের সঙ্গে পরের ছবিগুলো নিয়ে কথা হয়েছে তা হলে?

তিতিক্ষা ততক্ষণে নিবিষ্ট হয়েছে ছবির নারীর চোখের উপর। গার্গী অবাক হয়ে দেখছিল কী নিবিড় তন্ময়তায় তিতিক্ষা সেই নারীর চক্ষুদান করছে। কী অপরিসীম বাঙময় হয়ে উঠছে সেই নারীর দুটি কাজলকালো নয়ন। একটু পরেই মনে হল সেই নারী বড়ো বড়ো চোখে তাকিয়ে আছে গার্গীর চোখের দিকে। যেন বলতে চাইছে কিছু।

গার্গী শিহরিত হচ্ছিল তিতিক্ষার তুলির কারুকাজ দেখে। কিন্তু এও ভাবছিল কোনও মডেল ছাড়াই কীভাবে একটি নগ্নিকার শরীরের বিভঙ্গ মূর্ত করে চলেছে অতিঅনায়াসে। না-পেরে জিজ্ঞাসা করল, ছবি আঁকতে তোমার মডেল লাগে না?

তিতিক্ষা হাসল, না। আমার মডেল আমি নিজেই।

—তার মানে?

তিতিক্ষা হেসে তার ক্যানভাসের নীচে রাখা একটি ফটোগ্রাফ তুলে এনে দেখাল গার্গীকে, এটা কিন্তু মন্ত্রগুপ্তি। কাউকে বলা চলবে না আমি আমার ফটো থেকে ছবি আঁকি।

গার্গী ততক্ষণে স্তব্ধ ফটোগ্রাফের তিতিক্ষাকে দেখে। নগ্ন তিতিক্ষার ফটোগ্রাফ দেখে গা শিরশির করতে থাকে তার। এভাবে ফটো তোলানো যায় তাও যেমন তার কাছে অবিশ্বাস্য, তেমনি আশ্চর্য লাগে তিতিক্ষার নিজের নগ্ন ফটোগ্রাফ অনায়াসে গার্গীর হাতে তুলে দিতে দেখে।

কিছুক্ষণ শ্বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল গার্গীর, একটা বড়ো শ্বাস টেনে বলল, কে তুলেছে তোমার এই ফটো?

—কে আবার, বিবেক!

গার্গীর বুকে সামান্য স্বস্তি। তিতিক্ষা তখনই বলল, বিবেক অনেকদিন ধরে আমাকে ফুসলোচ্ছিল একটা ন্যুড তুলবে বলে। আমি কিছুতেই রাজি হচ্ছিলাম না। শেষে এমন বায়না ধরল যে বাধ্য হয়ে একটা পোজ দিলাম। কিন্তু সেটি ওয়াশ করার পর নিজেই অবাক হয়ে গেলাম আমার শরীর এত সুন্দর দেখে। বিবেকই বলল, 'মডেল খুঁজতে তোমাকে অন্যের মুখাপেক্ষী হতে হবে না এর পর। তুমি নিজেই নিজের ছবির মডেল হতে পারো।' তারপর একটা গোটা রিল তুলল, সবই আমার ন্যুড। এখন সেগুলোই কাজে লাগিয়ে দিচ্ছি আমার ছবিতে। শুধু ফটোগ্রাফের মুখের আদল, চোখদুটো বদলে দিচ্ছি যাতে কেউ এগুলো আমার ন্যুড

বলে ধরতে না পারে। মানুষের চোখই হল আসল। চোখ বদলালেই ছবি বদলে যায়। তোমাকে একদিন আমার অ্যালবামটা দেখাব।

গার্গীর ইচ্ছে হল না অ্যালবামটি দেখতে। কথা ঘোরাতে বলল, তুমি কি আজকাল বাইরে বেরোচ্ছ?

—বেরোচ্ছি অন্যের গাড়িতে চড়ে। যতদিন না আমার নিজের ড্রাইভার অ্যাপয়েন্টেড না হয়, এভাবেই পরস্মৈপদী থাকতে হবে। কী আর করা! আমি আবার একা ট্যাক্সিতে চড়তে ভয় পাই। জানো গার্গীদি, নীলার্ণব কাল আমাকে নিয়ে গিয়েছিল ওদের কলকাতার অফিসে।

গার্গী শুনে খুব একটা অবাক হল তা নয়। শুধু বলল, তাই নাকি?

—হ্যাঁ। দেখাচ্ছিল ওদের মরিশাস আর লাক্ষাদ্বীপের হোটেলের মডেলদুটো। কী বিশাল মডেল তা না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। তার ভিতরের কারুকাজ দেখে আমি তাজ্জব। খুব বড়ো মাপের আর্কিটেক্ট না হলে এমন চমৎকার স্থাপত্য করা সম্ভব নয়।

গার্গী তাকে উৎসাহিত করতে বলল, যাক, একজন ভালো প্রোমোটারের সাক্ষাৎ পেয়েছ এটা তোমার লাক, তাই না?

—তা বলতে পারো। নইলে আমার মতো একজন জুনিয়রের ছবি কে কিনত এত টাকায়? নীলার্ণব বলছিল শ্রাবণকুমারের চোখে যদি কেউ পড়ে যায় তার ভবিষ্যৎ একেবারে সোনার সিঁড়ি।

—এখনও পর্যন্ত তাই তো মনে হচ্ছে।

—জানো গার্গীদি, এ ক-দিনে আমি আটখানা ছবি এঁকে ফেলেছি লাক্ষাদ্বীপের হোটেলের জন্য।

—কিন্তু লাক্ষাদ্বীপের হোটেল কি শুরু হয়েছে?

—নীলার্ণব বলল অনেকখানি এগিয়ে গেছে প্রোজেক্টটা। কিন্তু তার জন্য আমার পেমেন্ট আটকাবে না। আর এক কোটি টাকা পেলেই আপাতত আমি নিশ্চিন্ত। তারপর আমাকে আর ফিরে তাকাতে হবে না। শ্রাবণকুমার আমার সব ছবি কিনে নিয়েছেন শুনে অনেক কোয়্যারি আসছে আমার ই-মেলে। অনেকেই ইন্টারেস্টেড হচ্ছে আমার ছবি সম্পর্কে।

—বাহ্, তাই নাকি? খুব সুখবর তো!

—সুখবরই বটে। শুধু আমার একটা আপশোশ রয়ে গেল বিবেকের কথা ভেবে। বিবেক যদি জানত আমার ছবির এত কদর হবে তা হলে তার বিজনেস নিয়ে এত পাগল হত না। এত ধারও করতে হত না তাকে। তার সমস্ত ক্যাপিটাল আমিই জোগাতাম।

গার্গী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, দ্যাখো, তিতিক্ষা, কী হত তা ভেবে আর লাভ নেই। যা হতে পারত তা না ভেবে যা হয়েছে সেই কথা ভাবো। তোমার কাঁধে এখন অনেক টাকার ঋণ।

তিতিক্ষা কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে তুলি বোলাতে থাকে সেই নারীর শরীরে। হঠাৎ তার তুলি গিয়ে ঠেক খায় নারীর স্তনবৃন্তে। গার্গী ভাবছিল তিতিক্ষার দক্ষতার কথা। নিখুঁত গড়নের নারীশরীর আঁকায় তার আশ্চর্য এলেম। ছবিটি প্রায় শেষের পথে। প্রমাণ আকারের ছবিটি এখন নড়েচড়ে উঠতে চাইছে ক্যানভাসের উপর।

ঠিক সেই মুহূর্তে তিতিক্ষার গলায় ঝোলানো মোবাইলটি বেজে ওঠে এক অদ্ভুত রিংটোনে। কয়েকদিন আগেই তিতিক্ষার মোবাইলে এক অন্য রিংটোন ছিল, তাতে ছিল জলতরঙ্গের সুর, আজ বাজছে সরোদের ধ্রুপদী। গার্গীর মনে পড়ে তিতিক্ষার অন্যতম প্রিয় হবি মোবাইলের রিংটোন বদলানো। রাতে বিছানায় শুয়ে নানা ধ্বনির রিংটোন শোনা তার খুব পছন্দের।

তিতিক্ষা ততক্ষণে উত্তর দিচ্ছে কারও উৎকণ্ঠিত প্রশ্নের, বলছে, অলিনদা, বাবা নিশ্চয় একটু পরেই বাড়ি ফিরবে। না না, বাবাকে কি পুলিশ অ্যারেস্ট করতে পারে? বাবার কত প্রভাব। আর একটু ওয়েট করো।

রিসিভার রেখে তিতিক্ষাকে ভারি নির্বিকার দেখায়, গার্গীকে বলে, অলিনদাকে নাকি কেউ বলেছে বাবাকে অ্যারেস্ট করতে পারে পুলিশ।

গার্গী অবাক হচ্ছিল তিতিক্ষার এই বিরল ঔদাসীন্যে। বলল, কিন্তু পুলিশের ভাবগতিক খারাপ। তারা এখন এমন কাউকে খুঁজছে যাকে বিবেকের মার্ডারার হিসেবে খাড়া করা যায়।

—কিন্তু পুলিশ বাবাকে অ্যারেস্ট করতে পারবে না। আমি শুনেছিলাম বাবা এর মধ্যে আদালতে আগাম জামিন নিয়ে রেখেছেন।

গার্গী ঘটনাটা জানত না, অবাক হয়ে বলল, তাই নাকি?

—হ্যাঁ। আপনি নিশ্চয় শুনেছেন পুলিশ বাবার অফিসে গিয়েছিল রেইড করতে?

গার্গী এই খবরটাও জানে না, তার আরও অবাক হওয়ার পালা, বলল, কিছু পেয়েছে পুলিশ?

—কী আবার পাবে? বাবা অনেক বেশি ধুরন্ধর।

ধুরন্ধর শব্দটা কানে বাজল গার্গীর। কোনও মেয়ে কি তার বাবা সম্পর্কে এরকম বিশেষণ উচ্চারণ করতে পারে! গার্গী একটু আগেই দেখেছিল অলীকশেখরকে পুলিশ ইন্টারোগেট করতে ডেকে নিয়ে গেছে শুনেও কোনও

ভাবান্তর হয়নি তিতিক্ষার। তা হলে কি বাবা-মেয়ের সম্পর্ক এমনই জটিল হয়ে উঠেছিল কিছুদিন যাবৎ!

গার্গী বিস্মিত হচ্ছিল ক্রমশ। আজ তিতিক্ষার কাছে এসে এমন কিছু তথ্য আহরণ করে ফেলল যা তার কাছে বেশ অভিনব। কিন্তু অলীকশেখর যে আগাম জামিন নিয়ে রাখতে পারেন তা গার্গী ভাবেনি। তা হলে কি অলীকশেখর আন্দাজ করেছিলেন পুলিশ তাকে গ্রেফতার করতে পারে? না কি বিবেকের হত্যার ব্যাপারে অলীকশেখরের কোনও হাত আছে, সে কারণেই এই আগাম জামিন!

তিতিক্ষা একটু আগেই বলল অলীকশেখর ভারি ধুরন্ধর মানুষ। সেদিন পুলিশ অফিসারটিও তাই বলেছিলেন। অতএব বিবেক হত্যার বিষয়টি নিশ্চয়ই এক জটিল অঙ্ক।

অলিনের ফোন রেখে তিতিক্ষা আবারও ব্যস্ত হয়ে পড়েছে তার ছবি নিয়ে। গার্গী অবাক হচ্ছিল একটি জটিল বিষয় নিয়ে আলোচনা করার ফুরসতে তিতিক্ষা কী অবলীলায় ক্যানভাসে তুলি চালাচ্ছে, আঁকছে, আবার পিছিয়ে এসে দেখছে ছবিটিকে। গার্গী এও খেয়াল করছিল একটি নগ্ন নারীশরীর আঁকার পর তিতিক্ষা সেই ছবিটিকে এমন একটি আড়াল করে দিচ্ছে ধূসর ও সাদা রঙের ব্যবহার করে যাতে ছবিটি কিছুতেই না মনে হয় অশ্লীল।

তিতিক্ষার ছবি আঁকার প্রশংসা না করে পারল না গার্গী, বলল, এতক্ষণে ছবিটি অন্য মাত্রায় পৌঁছোল।

তিতিক্ষা খুশি হয়ে বলল, হোটেলের দেওয়ালে একটার পর একটা শুধু ন্যুড টাঙানো থাকলে হয়তো অশোভন দেখাবে তাই শ্রাবণকুমারকে বলেছি প্রতিটি ছবিতে এমন একটি আড়াল রাখতে চাই যাতে ছবিটি হয়ে ওঠে শিল্পসম্মত।

তার কথা শেষ না হতে অমনি বেজে ওঠে সরোদের মূর্ছনা, তিতিক্ষা দ্রুত তুলি রেখে সুইচ অন করে মোবাইলের, পরক্ষণে তার কণ্ঠে উচ্ছ্বাস, হাই নীলার্ণব, একটা দারুণ ছবি এঁকেছি আজ।

ওপাশ থেকে কী সংলাপ ভেসে এল তা জানে না গার্গী, কিন্তু পরের সংলাপটিই স্পষ্ট করে কথাগুলি, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি নিশ্চয়ই যাব তোমার আমন্ত্রণ রাখতে। টুনাইট অ্যাট এইট থার্টি? বাট ইউ নো আই হ্যাভ নো ড্রাইভার। তোমাকে গাড়ি পাঠাতে হবে কিন্তু। কী বললে, তুমি নিজেই ড্রাইভ করে আসবে আমাকে নিতে! ওহ্, আই অ্যাম লাকি এনাফ!

রিসিভার রেখে তিতিক্ষা উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ল, জানো গার্গীদি, নীলার্ণবের জন্মদিন আজ। আমাকে তার জন্মদিনে স্পেশাল গেস্ট হিসেবে রেখেছে।

গার্গী ভারি অবাক হচ্ছিল তিতিক্ষার উল্লসিত চেহারা দেখে। ক-দিন আগেই তিতিক্ষা ভেঙে পড়েছিল বিবেকের মৃত্যুতে। অল্প সময়ের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়েছে বেশ, তার জন্য অবশ্য শ্রাবণকুমারের অবদান অনেক। শ্রাবণকুমার তার জহুরি আবিষ্কারের চোখ দিয়ে একজন অখ্যাত নবীন শিল্পীকে যেভাবে পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে এলেন, তার হাতে তুলে দিয়েছেন এক কোটি টাকার চেক, তাতেই বোধহয় তিতিক্ষা ভুলতে পেরেছে তার শোকতাপ।

তা ছাড়া— তা ছাড়া গার্গীর মনে পড়ল বিবেকের ব্যবসার পরিণতি পছন্দ করেনি তিতিক্ষা, তখন তাকে বলেনি কেন না সে ভেবেছিল বিবেকের বিজনেস হয়তো দাঁড়িয়ে যাবে কোনও দিন। কিন্তু যখন আবিষ্কার করেছে বিবেক তার কাছে অনেক মিথ্যেও বলেছে ব্যবসার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে তখনই ভ্রান্তি ভেঙেছে তিতিক্ষার। অতঃপর নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে তার নিজস্ব পৃথিবীর কাজে।

গার্গী প্রথমদিকে বিস্মিত হলেও পরে বুঝেছে তিতিক্ষাকে বেঁচে থাকতে গেলে তার অবলম্বন এখন ছবি আঁকা। যে-সুযোগ সে পেয়েছে তা কাজে লাগাতে পারলে তার সুখ্যাতি অবশ্যম্ভাবী।

তিতিক্ষা তখন সরে এসেছে তার ক্যানভাস থেকে অনেকটা দূরত্বে, দেখছে তার ছবির মহিমা। কিছুক্ষণ নিরিখ করল ছবিটি, তারপর হাঁপ ছেড়ে বলল, যাক, এতক্ষণে দেওয়ালে টাঙানোর মতো হয়েছে।

গার্গী বলল, তোমাকে কত ছবি আঁকার অর্ডার দিয়েছে শ্রাবণকুমার?

তিতিক্ষার মুখে হাসির উদ্ভাস, বলল, বলেছে শুধু এঁকে যাও। এখন পর পর অনেক হোটেল হবে। সামনের মাস থেকেই কাগজে বিজ্ঞাপন বেরোবে হোটেল সম্পর্কে, তাতে অন্য সমস্ত সুযোগসুবিধার সঙ্গে লেখা থাকবে হোটেলের অন্যতম আকর্ষণ তিতিক্ষা দ্বিবেদীর মিস্টিক পেইন্টিং। যে-ছবি দেখতে বোর্ডারদের বারবার ফিরে আসতে হবে 'হোটেল দি অ্যাবোড'এ।

—বাহ্, গার্গী প্রশংসা করল হোটেলের নামটি।

তিতিক্ষাও বলল, শ্রাবণকুমার বলেছেন স্বর্গে গেলে যা-যা সুবিধে পাওয়া যেতে পারে বলে মানুষ ভাবে তারও অতিরিক্ত কিছু সুবিধা দেবে হোটেল দি অ্যাবোড।

গার্গী হেসে বলল, স্বর্গে গেলে কী কী সুবিধা পাওয়া যায় তা কি শ্রাবণকুমার জানেন?

তিতিক্ষাও হেসে ফেলল, তা অবশ্য আমিও জানি না শ্রাবণকুমার কী ভেবে কথাটা বলেছেন! তবে বিজ্ঞাপনটা নাকি দারুণ ক্যাচি হবে।

—তা অবশ্যই হবে। কিন্তু তা হলে শ্রাবণকুমারকে বোলো যেন একটি সোনার রথের ব্যবস্থাও রাখেন যাওয়া-আসার জন্য।

সেই মুহূর্তে আবার সরোদের মূর্ছনা, তিতিক্ষা তার গলায় ঝোলানো মোবাইলের সুইচ অন করতেই কী যেন শুনল ওদিক থেকে, আর তিতিক্ষার মুখটা কালো হয়ে গেল আতঙ্কে।

—শেষাদ্রিদা, আপনি কোথায়?

টেলিফোনের ওপাশে শেষাদ্রি হাওলাদারের গম্ভীর কণ্ঠস্বর, কলকাতা থেকেই বলছি।

তিতিক্ষার গলায় ঝরে পড়ে কিছু আশ্চর্য হওয়ার টুকরো, শেষাদ্রিদা, ক-দিন আগে আপনি টেলিফোনে বললেন না আপনি আমেরিকা থেকে বলছেন?

শেষাদ্রিদার কণ্ঠে হা হা হাসি, তিতি, তখন আমেরিকাতেই ছিলাম। কিন্তু তারপর মহাকাশে ঘটে গেছে অনেক গ্রহ-নক্ষত্রের পরিবর্তন। আমেরিকা থেকে কলকাতার দূরত্ব মাত্র কয়েক ঘন্টার। সেদিন বিকেলেই ফ্লাইট ছিল আমার।

—শেষাদ্রিদা, আমি কয়েকদিনের মধ্যেই আপনার টাকা ফেরত দিয়ে দেব। আমার একটা চেক এনক্যাশ হয়ে যাবে সামনের সপ্তাহে। তিতিক্ষার গলাটা কাঁপছিল এক অজানা আশঙ্কায়।

—আরে না না, টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য আমি ফোন করিনি। ফেরার আগে একে-ওকে টেলিফোন করে খবর নিচ্ছিলাম কলকাতার। বিবেকের মৃত্যুসংবাদ শুনে এতটাই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম যে কিছুক্ষণ বসে ছিলাম মুহ্যমান হয়ে। তারপর কলকাতায় পা দিয়ে মনে হল প্রথমে তোমারই খবর নেওয়া উচিত। বিপদের দিনে তোমার পাশে দাঁড়ানো উচিত আমার। মনে আছে তখন তোমার একটি টেলিফোনেই পনেরো লাখ টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম?

তিতিক্ষার বুকের ভিতর তোলাপাড়া চলতে থাকে শেষাদ্রি হাওলাদারের কথায়। কিছুক্ষণ অনড় হয়ে থাক তার অনুভূতির কেন্দ্রগুলি। পনেরো লাখ শব্দদুটি পিন ফোটাতে থাকে তার কানে।

শেষাদ্রিদা পরক্ষণে বললেন, না, তিতি, তোমাকে পাওনার কথা বলে বিব্রত করতে চাই না। পনেরো লাখ টাকা আমার কাছে ইন্ডিয়ান টাকায় পনেরো টাকার মতো। বলতে পারো নস্যি। বরং এখন তোমার পাশে দাঁড়ানো আমার কর্তব্য। তুমি র‍্যাম্পে দাঁড়ালে মিস ইউনিভার্স হওয়াও কোনও বিস্ময় ছিল না আমাদের কাছে। তুমি কতটা সুন্দরী তা বোধহয় তুমি নিজেও জানো না। পাওনাদাররা তোমাকে বিরক্ত করছে এ খবর পৌঁছেছে আমার কানে। তোমার মতো একজন সুন্দরী নারী ন্যাস্টি পাওনাদারদের তাগাদায় রাতে ঘুমোতে পারছে না এই ভাবনাটা আমাকে খুব হন্ট করছে। ডোন্ট ওরি, তিতি, আমি সারাক্ষণ তোমার পাশে সেঁটে থাকব যাতে কেউ বিরক্ত করতে না পারে তোমাকে।

—শেষাদ্রিদা, আমি ঠিক আছি। বিবেক না থাকায় প্রথমে একটু ভয় পেয়েছিলাম ঠিকই। ভেবেছিলাম এত টাকার লোন মেটাব কী করে। কিন্তু আমার টাকার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে খুব শিগগির।

—ঠিক আছে, ধৈর্য ধরলে সব সমস্যার সমাধান ঠিকই হয়। তবে টাকার সমস্যার সমাধান যদিও বা করা যায়, একা থাকার সমস্যা কিন্তু ঢের বেশি। তুমি এখন একা হয়ে গিয়েছ, তোমার এখন এমন কাউকে চাই যে তোমার পাশে সারাক্ষণ থাকবে। তুমি বোধহয় খবর জেনেছ এষণার সঙ্গে আমার ডিভোর্স হয়ে গেছে। তাই আমেরিকার পাট চুকিয়ে দিয়ে চলে এসেছি এ দেশে। আই নাউ নিড ইয়োর কম্পানি।

শেষাদ্রি হাওয়ালাদারের কথায় এমন একটা জোর ছিল যে, রীতিমতো কাঁপিয়ে দিল তিতিক্ষাকে।

—হাউএভার, আজ সন্ধেয় তুমি ফ্রি আছ? তোমার কাছে কিছু দরকার আছে আমার। ফ্রি না থাকলেও ফ্রি করে নিও। তোমার লোন নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি একাই সব লোন শোধ দিয়ে দিতে পারি।

তিতিক্ষা বলতে যাচ্ছিল, শেষাদ্রিদা, আমি আজ ফ্রি নেই।

কিন্তু তার আগেই ওদিকে টেলিফোন রেখে দেওয়ার শব্দ।

গার্গী তার ভযার্ত মুখের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতেই তিতিক্ষা বলল, শেষাদ্রি হাওলাদার একজন নামজাদা উয়োম্যানাইজার। এষণাদির জীবনটা শেষ করে দিয়ে এখন হাত বাড়াতে চাইছে আমার দিকে। কী ডেঞ্জারাস লোক তুমি ভাবতে পারবে না!

১৬

পুলিশ হেডকোয়ার্টারের দোতলার কোণের ঘরটিতে তখন চলছিল এক সাপলুডো খেলা। মস্ত শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত ঘরের নরম আবহে বসে বারবার চোখের সানগ্লাসটিকে ঠিক করে নিচ্ছিলেন অলীকশেখর। এখন চোখের কালো আবরণটিকে না রাখলেও হয়, তবু কেন যে অলীকশেখর সানগ্লাসটিকে খোলেননি চোখ থেকে তা বিস্মিত করছিল ইনস্পেক্টর দেবজ্যোতি নাগ রায়কে। তাঁর সামনে কেউ এরকম বেয়াদপি করলে তিনি হয়তো জিজ্ঞাসা করে বসতেন, 'আপনার চোখে কি কোনও ডিফেক্ট আছে যে, ঘরের মধ্যে বসেও রোদচশমা খুলছেন না?' কিন্তু বলতে পারছেন না কেন না তিনি এখন নিজের চেম্বারে নেই, বসে আছেন তাঁর বস ডি সি ডি ডি অরিজিৎ পুরকায়স্থের চেম্বারে।

অরিজিৎ পুরকায়স্থ তখন সময় নিচ্ছেন অলীকশেখরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন বলে। এরকম ধুরন্ধর চরিত্র তাঁর চাকরিজীবনে কম পাননি, কিন্তু ধুরন্ধর লোকগুলো এক-একজন এক-এক প্রকৃতির হয়। আন্ডারওয়ার্ল্ডের ধুরন্ধর ব্যক্তিরা—তারা একরকম বিপজ্জনক, কিন্তু যারা সমাজে ভদ্রলোকের মুখোশ পরে ঘোরে তাদের নিয়ে হয় গভীরতর সমস্যা। অলীকশেখর এমনই একজন সমাজের উঁচুদরের ও উঁচুতলার ব্যক্তি যার গায়ে হাত দেওয়া খুব কঠিন। অথচ সারকামস্ট্যান্সেস বলছে বিবেক দ্বিবেদীর হত্যাকাণ্ডের পিছনে অলীকশেখরের হাত থাকলেও থাকতে পারে।

তাঁদের ধারণা যে একেবারে অমূলক নয় তার প্রমাণ একটু আগেই পেয়েছেন যখন অলীকশেখর তাঁর চকোলেট রঙের স্যুটের পকেট থেকে বার করলেন একটি আগাম জামিনের কোর্ট-অর্ডার, তারপর মূল কপিটি তাঁকে দেখতে দিয়ে একই সঙ্গে একটি প্রত্যয়িত কপিও তুলে দিলেন তাঁর হাতে। বললেন, আমার জানা ছিল আপনারা আমাকে অ্যারেস্ট করলেও করতে পারেন। মোটা মাথার অফিসারদের দৌড় তো আমি জানি। যখন আসল কালপ্রিটকে ধরতে না পারে, নিজেদের সম্মান বাঁচাতে কাউকে না কাউকে একজন স্কেপগোট বানাতেই হয় তাদের।

দেবজ্যোতি নাগ রায় দেখছিলেন ডেপুটি কমিশনার অরিজিৎ পুরকায়স্থর শ্যামলবরণ মুখখানি কিছুক্ষণের জন্য তামাটেবর্ণ। অলীকশেখর অনেকগুলি কোম্পানির মালিক বা ম্যানেজিং ডিরেক্টরই শুধু নয়, অনেক নামী কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরস্‌দের একজন। তাঁর অঙ্গুলিহেলনে অনেক কোম্পানির ভাগ্যে ঘটতে পারে নয়ছয়। হয়তো এতখানি ক্ষমতা ভোগ করেন বলে পুলিশ হেডকোয়ার্টারের এক নামী কর্তাব্যক্তিকেও অপমান করতে তাঁর চোয়াল কাঁপে না।

অরিজিৎ পুরকায়স্থ ঠোঁটের কোণে সামান্য মুচকি হাসি ভাসিয়ে দিয়ে বললেন, আমাদের মাথা মোটা নয় বলেই আপনাকে কোর্টে ছুটতে হয়েছে যাতে আপনাকে আমরা অ্যারেস্ট করতে না পারি। তার মানে আপনার দুর্বলতা আছে বলেই আপনাকে আগাম জামিনের জন্য কোর্টের মুখাপেক্ষী হতে হয়েছে । এতেই আপনি ধরা পড়ে গেছেন মি: শেখর।

অলীকশেখরের পদবী ঠিক কী তা তিনি কখনও জানাতে চান না, নিজের নাম অলীকশেখর বলতেই পছন্দ করেন। বিভিন্ন কম্পানির কাগজপত্রে সেরকমই লেখা আছে দেখেছেন দেবজ্যোতি নাগ রায়। কিন্তু তিতিক্ষাকে জেরা করতে গিয়ে ও তার আর্ট কলেজের সার্টিফিকেট দেখতে গিয়ে আবিষ্কার করেছেন তাদের পদবি ধাড়া। কোনও কারণে তিনি ধাড়া পদবীটি ব্যবহার করেন না। এখন ভারি কণ্ঠস্বরে বললেন, দেখুন ডি সি ডি ডি সাহেব, এখনও পর্যন্ত আপনারা বুঝে উঠতে

পারেননি বিবেক কী ধরনের ব্যবসা করত, কাদের সঙ্গে তার ঘোরাফেরা ছিল, কেন ঘন ঘন দিল্লি যেত! একজন ব্যবসায়ী তো শূন্যে দাঁড়িয়ে ব্যবসা করতে পারে না!

অরিজিৎ পুরকায়স্থ কণ্ঠে উষ্মা মিশিয়ে বললেন, আই সি, বিবেক দ্বিবেদী আসলে কোনও ব্যবসা করতেন বলে আমরা এখনও প্রমাণ পাইনি।

—দেখলেন তো, আমি কি সাধে বলেছি পুলিশের মোটা মাথা! একজন ব্যবসায়ী এত টাকা লোন নিয়েছে ব্যাঙ্ক থেকে, পার্সোনাল লোন নিয়েছে সেও নাকি দেড় কি দু কোটি টাকার মতো। সেই টাকা কোথায় ইনভেস্ট করেছে, কারা তাকে মাল সাপ্লাই করত, কাদের পাল্লায় পড়েছিল যার ফলে তার এত টাকার পেমেন্ট আটকে গেল, কেন তাকে খুন হতে হল এর কোনও কিছুই এখনও আপনারা বার করতে পারেননি। তা হলে আর পুলিশের তদন্তের উপর পাবলিকের আস্থা থাকবেই বা কী করে!

ডি সি ডি ডি একবার বেশ কঠিন চোখে তাকালেন তাঁর কাছেই বসে থাকা পুলিশ ইনস্পেক্টর দেবজ্যোতি নাগ রায়ের দিকে। কেসটার কিছুই যে এখনও তাঁদের করায়ত্ত নয় তা নীল আকাশের মতোই সত্য।

ডি সি ডি ডি অবশ্য মচকানোর পাত্র নন, বললেন, দেখুন, কেসটায় একটা মিস্ট্রি আছে ঠিকই, কিন্তু পুলিশ যখন কোনও তদন্ত হোলহার্টেডলি করার চেষ্টা করে, তখন একটা ব্রেকথ্রু হবেই।

অলীকশেখর হো হো করে হাসলেন, চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, লেট আস হোপ সো।

—কিন্তু মি. শেখর, আপনার কাছ থেকে কয়েকটা কথার উত্তর জানতে আপনাকে এখানে ডাকা হয়েছে।

—হুঁ, বলুন। আপনাদের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য আমি তৈরি। কিন্তু প্লিজ, বোকা-বোকা প্রশ্ন করে আমার সময় নষ্ট করবেন না। আমার সময়ের দাম আছে। আমার ডায়েরি খুলে দেখতে পারেন এর পর আমার পর পর পাঁচটা মিটিং আছে। প্রত্যেকটি মিটিংই ভেরি ভেরি আর্জেন্ট।

অরিজিৎ পুরকায়স্থ একবার তাকালেন দেবজ্যোতি নাগ রায়ের মুখের দিকে, তারপর জিজ্ঞাসা করতে শুরু করলেন, আচ্ছা, মি. শেখর বলুন তো, আপনি বিবেক দ্বিবেদীর হয়ে শেষ যে-ব্যাঙ্কটিতে গ্যারান্টার হয়েছিলেন, গ্যারান্টার হওয়ার কাগজে সই করার সময় ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে ঠিক কী বলেছিলেন?

অলীকশেখরের অভিব্যক্তি কী হল তা বোঝা গেল না কালো চশমার আড়ালে। বললেন, তখন কী বলেছিলাম তা কি এতদিন পরে মনে থাকার কথা?

—তবু মনে করে দেখুন। কারণ কথাটা বলেছিলেন কোনও এক বিশেষ মোটিভ নিয়ে।

—আমার কিছুই মনে পড়ছে না।

—মি. শেখর, আপনি অনেকগুলি কোম্পানির কর্ণধার। একই দিনে চার বা পাঁচটি কোম্পানির বোর্ড মিটিং করেন, তার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করেন, শুনেছি আপনার মনে থাকে পাঁচ বছর আগে কোন কোম্পানির কোন বোর্ড মিটিংয়ে কী সিদ্ধান্ত হয়েছিল?

—বোর্ডের মিটিংয়ের প্রতিটি সিদ্ধান্ত ইমপর্ট্যান্ট তাই মনে রাখতে হয়, তার জন্য ডায়েরিতে লিখেও রাখি কখনও। কিন্তু ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে কবে কী বলেছিলাম তা আমার কাছে মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়।

—কিন্তু বিবেক দ্বিবেদীর কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল সেসময়।

—বিবেক তা কী করেই বা জানবে, আর আপনিই বা জানলেন কী করে?

—বিবেক জেনেছিল কথাটা। আমিও একইভাবে জেনেছি আপনি কী বলেছিলেন?

—ব্যাঙ্কের ম্যানেজার আপনাদের বলেছে কথাটা?

—একজ্যাক্টলি।

—ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ঠিক করেননি কথাটা পাঁচকান করে। ব্যাঙ্কের নিয়ম অনুযায়ী কাস্টমারদের স্বার্থ দেখা তাদের কর্তব্য। হাউএভার, ব্যাঙ্কের ম্যানেজার কী বলেছেন আপনাকে? কেনই বা বলতে গেলেন?

দেবজ্যোতি নাগ রায় দেখছিলেন অলীকশেখরের চোয়ালদুটো কী সাংঘাতিক কঠিন হয়ে উঠছে আস্তে আস্তে। কালো চশমা পরা না-থাকায় বোঝা যাচ্ছে না চোখের ক্রূরতা, কিন্তু না দেখা গেলেও বোঝা অসম্ভব নয়। অরিজিৎ পুরকায়স্থও লক্ষ করছিলেন অলীকশেখরের নড়েচড়ে বসা। বললেন, আপনি ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে বলেছিলেন মেয়ের চাপে পড়ে আমি গ্যারান্টার হচ্ছি ঠিকই, কিন্তু আপনি চেষ্টা করবেন যাতে লোনটা স্যাংশন না হয়।

অলীকশেখর কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, শুধু এটুকুই বলেছিলাম? সঙ্গে আর কিছু বলিনি? ব্যাঙ্কের ম্যানেজার বুঝি তাই বলেছে?

—আর কিছু বলেছিলেন বুঝি? অরিজিৎ পরখ করছিলেন অলীকশেখরের অভিব্যক্তি।

—বলেছিলাম বিবেক দ্বিবেদীর কোম্পানির কাগজপত্র যেন দেখে নেয় ভালো করে। শুধু আমার মুখ দেখেই যেন লোন না দেয়।

—আই সি, তার মানে আপনি বলতে চাইছেন বিবেক দ্বিবেদীর কম্পানির কাগজপত্র ঠিক ছিল না?

—না, তার মানে এরকম দাঁড়ায় না। ব্যাঙ্কের উচিত গ্যারান্টার যেই হোক, যাকে লোন দিচ্ছে তার কম্পানির কাগজপত্রও যেন ঠিকঠাক থাকে। গ্যারান্টার নামীদামি মানুষ হলে আর তার প্রচুর টাকা থাকলেই চোখ বুজে লোন স্যাংশন করা উচিত নয়। গ্যারান্টারকে ধরবে সবার শেষে। তার আগে ব্যাঙ্ক চেষ্টা করবে কোম্পানির অ্যাসেট থেকে লোন রিকভারি করতে।

—কিন্তু এখন জানা গেছে কোম্পানির কাগজপত্র কিছুই ঠিক ছিল না। তা সত্ত্বেও ব্যাঙ্ক শুধু আপনি গ্যারান্টার বলে তাকে কোটি টাকার উপর লোন দিয়েছিল সেদিনই।

—হ্যাঁ, ব্যাঙ্কের ম্যানেজার খুবই চতুর প্রকৃতির ছিলেন, তিনি ভেবেছিলেন বিবেক যদি লোন শোধ করতে না পারে তা হলে আমার কাছ থেকে টাকা আদায় করবে।

—ঠিক তাই। বিবেক দ্বিবেদীর মৃত্যু হওয়ায় এখন ব্যাঙ্কের ম্যানেজার জেনে গেছে এই লোন আর শোধ হওয়ার নয়। তাই গ্যারান্টার হিসেবে আপনার বিরুদ্ধে মামলা করবেন ঠিক করেছেন।

অলীকশেখরের চোয়াল শক্ত হল আরও। কথা বলতে বলতে চেয়ারের ভিতর সেঁটে বসেছিলেন, হঠাৎ সোজা হয়ে বসে বললেন, আমার কাছ থেকে টাকা আদায় করা এত সহজ হবে না তা বোধহয় ব্যাঙ্ক ম্যানেজার বুঝতে পারছে না। আমার বিরুদ্ধে মামলা করলে আমি কোর্টে জানিয়ে দেব ব্যাঙ্ক ম্যানেজার লোন স্যাংশন করার আগে যে ন্যূনতম সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত তা তিনি করেননি। সেই স্টেটমেন্টের একটা কপি পাঠিয়ে দেব ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের হেড অফিসে। দেখবেন তার চাকরি নিয়ে কীরকম টানাটানি পড়ে যায়।

অরিজিৎ পুরকায়স্থ বুঝলেন ম্যানেজার যে মন্ত্রগুপ্তি ফাঁস করে দিয়েছেন তার জন্য তাকে চরম শাস্তি দিতে চান অলীকশেখর। তারই একটা আন্দাজ দিয়ে রাখলেন ছোট্ট করে। তৎক্ষণাৎ তিনি সরে এলেন অন্য প্রসঙ্গে, হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, মি. শেখর, বৈষ্ণবঘাটা পাটুলির কাছে আপনার একটা ছোট্ট ফ্ল্যাট আছে তাই না?

মহাকাশ থেকে পড়লেন অলীকশেখর, আমার ফ্ল্যাট? ওরকম জায়গায়? ইমপসিবল।

—সেই ফ্ল্যাটে আপনি সন্ধের পর মাঝেমধ্যে ঢুঁ দেন, ঠিক কি না?

অলীকশেখর সামান্য দু-তিন সেকেন্ড সময় নিলেন উত্তর দেওয়ার জন্য। বললেন, আমি এরকম কত জায়গায় যাই আমার বিজনেসের কাজে।

—কিন্তু এখানে ঠিক বিজনেস বলতে যা বোঝায় সেরকম কোনও কাজে যান না বোধহয়।

অরিজিৎ পুরকায়স্থের গলায় কাঠিন্য প্রবেশ করছে খুব ধীরে হলেও।

—দেখুন, মি. পুরকায়স্থ, আমার সারাদিনের শিডিউলে বিজনেস ছাড়া অন্য কিছু থাকে না। যার সঙ্গেই দেখা করতে যাই, কিছু না কিছু বিজনেস পারপাজ থাকেই।

—বৈষ্ণবঘাটা পাটুলির ওই ফ্ল্যাটে যিনি থাকেন তাঁর নাম অনামিকা রায়। খুব সুন্দরী মহিলা। তাঁর সঙ্গে আপনার কী ধরনের বিজনেস রিলেশন তা আপনিই জানেন। কিন্তু প্রায়ই আপনি সেখানে যান, অনেক রাত পর্যন্ত কাটান।

অলীকশেখর হঠাৎ তীব্রকণ্ঠে বললেন, আপনারা কি আমার পিছনে গোয়েন্দা লাগিয়েছেন?

অরিজিৎ হেসে উঠলেন শব্দ করে, বললেন, আপনি যে চেম্বারটিতে এসে বসেছেন সেটি এক গোয়েন্দাবাহিনির অফিসারের চেয়ার। তথ্যটা ভুলে গেলে কী করে চলবে?

—কিন্তু তাই বলে একজন সাধারণ নাগরিকের চলাফেরার উপর আপনি নজরদারি করতে পারেন না! দিসি ইজ সিরিয়াস ম্যাটার।

—কিন্তু আপনি কিছুতেই প্রমাণ করতে পারবেন না আপনার পিছনে আমরা নজরদারি করছি। আমরা শুধু কিছু ফ্যাক্ট তুলে ধরব কোর্টের কাছে। কী করে সেই তথ্য সংগ্রহ করলাম তা বলতে বাধ্য নই আমরা। কিন্তু এটাও মনে রাখবেন আপনি একেবারেই সাধারণ নাগরিক কেউ নন। আপনি একজন অভিযুক্ত। আমরা জাল গুটিয়ে আনছি ক্রমশ।

১৭

অলীকশেখরের মতো একজন দুর্দান্ত ব্যবসায়ীকে জালে জড়াতে গেলে যে কত তৈরি হয়ে নামতে হয় তা হাড়ে হাড়ে অনুভব করছিলেন অরিজিৎ পুরকায়স্থ। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলে কী ভীষণ আর ভয়ংকর হয়ে ওঠে তাঁর মুখভঙ্গি, কতটা প্রতিশোধপরায়ণ হতে পারেন তা দেখে স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছিলেন মাঝেমধ্যে। অথচ গত কয়েকদিনে অলীকশেখরের পিছনে সত্যিই গোয়েন্দা লাগিয়ে যে সব তথ্য উদ্ধার করেছেন অরিজিৎ তা যেমন চমকপ্রদ, তেমনি গা ছমছম করা।

ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে তিনি যে গোপন কথাগুলো বলেছিলেন তা গোয়েন্দাদের

কাছে বলে দেওয়ায় ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে কী শাস্তি দিতে পারেন তার নমুনা ইতিমধ্যে প্রকাশ করে চমকে দিয়েছেন ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি কমিশনারকে। এখন তাঁর পিছনে গোয়েন্দা লাগানো হয়েছে জেনে অলীকশেখর ক্রুদ্ধ হয়ে জানালেন, দেখুন, মি. পুরকায়স্থ, আমি কিন্তু হিউম্যান রাইটস কমিশনে আপনাদের নামে কমপ্লেইন করব আপনারা এ শহরের একজন ওজনদার সিটিজেনকে স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করতে দেন না। তার পিছনে চর লাগিয়ে রাখেন সারাক্ষণ।

অরিজিৎ পুরকায়স্থ লক্ষ করছিলেন একজন ধুরন্ধর ব্যবসায়ী কী সাংঘাতিকভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন যখন তিনি ক্রমশ জড়িয়ে পড়তে থাকেন গোয়েন্দাদের জালে। তিনিও ঠোঁটের কোণে সামান্য হাসি ঝুলিয়ে রেখে বললেন, মি. শেখর, আপনি এই অভিযোগ কিছুতেই প্রমাণ করতে পারবেন না। কারণ আপনার পিছনে কে কখন অনুসরণ করেছে, কোন ছদ্মবেশে তা আপনি তো ননই, আমিও জানি না। শুধু শুধু আপনার পয়সা ও শ্রম ব্যয়িত হবে। আমার কাছে শুধু টাইম টাইম খবর চলে অসে আপনার জীবনবৃত্তান্তের কিছু অধ্যায়। যেমন আরও অনেক ঘটনা আমরা জানতে পেরেছি যা এখন বললে আপনি চেয়ার থেকে পড়ে যাবেন।

অলীকশেখরের গলায় তখনও অকুতোভয় সংলাপ, কী জানতে পেরেছেন?

অতঃপর অরিজিৎ এমন কিছু শব্দ উচ্চারণ করলেন যা শুনে অলীকশেখর সত্যিই চেপে ধরেলন চেয়ারের হাতল।

অরিজিৎ তখন বলছেন, মি. শেখর, আপনি আইলিন দাশগুপ্ত নামে কোনও মহিলাকে চেনেন?

অলীকশেখর না-জানার ভঙ্গি করে জানতে চাইলেন, তিনি আবার কে?

—আই সি, এমন স্বরে কথা বললেন যেন নামটা কখনও শোনেনইনি আপনি?

—এমন কত আইলিন দাশগুপ্ত আছেন পৃথিবীতে। আপনি কোন আইলিন দাশগুপ্তের কথা বলছেন, মি. পুরকায়স্থ?

—দেখুন, মি. শেখর, আইলিন দাশগুপ্ত এমনই একটি নাম যা খুব বেশি শোনা যায় না। হত যদি রমা কি রীণা কি সুমনা কি শীলা তা হলে তবু কথা ছিল কেন না এই নামগুলো খুবই কমন নাম। কিন্তু আইলিন নামটির মধ্যে কিছু বিদেশি গন্ধ মেশানো আছে যা সচরাচর দুর্লভ, তাই না, মি. শেখর?

—আপনি কী বলতে চাইছেন খোলসা করে বলুন তো, মি. পুরকায়স্থ?

—আপনি শেখর টি এস্টেটের নাম শুনেছেন তো?

—শেখর টি এস্টেট? হ্যাঁ, মকাইবাড়ির একটি চা-বাগান।

—ওই চা-বাগানটা আপনারই, তাই তো? আপনারই নামে চা-বাগানের নামকরণ।

—হ্যাঁ। তাতে কী হয়েছে? আমার ওরকম দশটা চা-বাগান আছে।

—হ্যাঁ, কিন্তু এই চা-বাগানটি আপনার কাছে কোনও বিশেষ অর্থ বহন করে, তাই না?

—কী বলতে চাইছেন আপনি?

—আইলিন দাশগুপ্ত ওই টি এস্টেটেরই একটি স্কুলের শিক্ষয়িত্রী হিসেবে কাজ করতেন।

—হতে পারে। তাতে কী হয়েছে?

—ওই অসাধারণ সুন্দরী অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মহিলার স্বামীর নাম সোমজিৎ দাশগুপ্ত। তিনি ওই শেখর টি-এস্টেটের ডেপুটি ম্যানেজার হিসেবে কাজ করতেন বছর দুয়েক আগে।

—হতে পারে। আমার সব কোম্পানির অফিসার আর কর্মীদের নাম মুখস্থ রাখা তো সম্ভব নয়।

—আই সি, কিন্তু আপনার স্মৃতিশক্তি নাকি অসাধারণ। বহু টি-এস্টেটের ম্যানেজার থেকে শুরু করে বাগানের মালির নাম পর্যন্ত মুখস্থ এমনই খ্যাতি আপনার। অনেকের স্ত্রী বা কন্যাদের নামও আপনার মুখস্থ। এমনকী বহু পরিবারের দৈনন্দিন জীবনযাপনের খবরও আপনার ঠোঁটের ডগায় থাকে।

অলীকশেখর এবার ব্যস্ত হয়ে কব্জির উপর নজর বুলিয়ে চমকে উঠলেন, দেখুন, মি. পুরকায়স্থ, আমার একটা মিটিং এর মধ্যেই মিস হয়েছে আপনার অদ্ভুত সব প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে। কিন্তু আমার নেক্সট মিটিং আর আধঘন্টার মধ্যে। পরের মিটিংটা অ্যাটেন্ড করতেই হবে আমাকে, আমি বরং আর একদিন ডেট করে আসব। আজ উঠতেই হবে আমাকে। স্যরি—

—মি. শেখর, কিন্তু অন্তত আইলিন দাশগুপ্তর গল্পটা শুনে যান। বেশি নয়, মিনিট পাঁচেক সময় লাগবে।

—প্লিজ—

—কোনও প্লিজ নয়, মি. শেখর। আপনি এসেছেন পুলিশ হেডকোয়ার্টারের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে। আপনার কাছে অ্যান্টিসিপেটরি বেলের অর্ডার আছে ঠিকই, কিন্তু তার মানে এই নয় যে আপনাকে ইন্টারোগেট করা যাবে না। ইচ্ছে করলে আপনাকে আজ সারা দিন সারা রাত ইন্টারোগেট করতে পারি।

—মি. পুরকায়স্থ, আপনি কিন্তু জেরা করার নামে আমাকে আসলে হ্যারাস করছেন। সব মানুষেরই কিছু পার্সোনাল লাইফ থাকতে পারে। আপনি চর লাগিয়ে

সেই পার্সোনাল লাইফের হদিশ নিয়ে এখন আপনি আমাকে তার গপ্পো শোনাতে বসেছেন।

· —আপনাকে নিয়ে অনেক গপ্পো প্রচলিত আছে বিজনেস ওয়ার্ল্ডে। কিন্তু অন্তত এই গপ্পোটা আপনাকে শুনে যেতেই হবে।

অরিজিৎ পুরকায়স্থের শেষ কথাটায় আদেশের একটা সূক্ষ্ম ছোঁয়া থাকায় উঠি-উঠি করেও যেন উঠতে পারলেন না অলীকশেখর। তাঁর অভিব্যক্তিতে বেশ বিরক্তির প্রলেপ।

—মি. শেখর, আপনি শেখর টি-এস্টেটে বছর দুয়েক আগে ইনস্পেকশনে গিয়েছিলেন। সেখানেই আলাপ হয় আইলিন দাশগুপ্তের সঙ্গে। আপনি তাকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন আপনার কলকাতার একটি স্কুলে তিনি পড়াতে রাজি আছেন কি না। তা হলে তিনি সোমজিৎ দাশগুপ্তকে কলকাতার অফিসে ট্রান্সফার করে নিয়ে আসবেন।

অলীকশেখর ছটফট করে উঠে বললেন, প্লিজ, মি. পুরকায়স্থ, দু বছর আগের একটি ঘটনার কথা এত ডিটেইলসে আমার মনে থাকার কথা নয়।

—কিন্তু এই ঘটনার কথা আপনি আপনার সারা জীবনেও ভুলতে পারবেন না। আইলিন দাশগুপ্ত আপনাকে বলেছিলেন আপনার এই অফার তিনি গ্রহণ করতে অক্ষম। তাতে আপনি কয়েকদিনের মধ্যে সোমজিৎ দাশগুপ্তকে বদলি করে দেন আসামের কোনও এক দূরবর্তী টি-এস্টেটে। সেটিও আপনার আর একটি চা-বাগান। বদলির অর্ডার বেরোনার পর আপনি সোমজিৎ-আইলিনকে পুনর্বার অফার দিয়েছিলেন ইচ্ছে করলে তাঁরা কলকাতায় বদলি নিয়ে আসতে পারেন। সম্ভবত সোমজিৎ-আইলিন আপনার দূরভিসন্ধি বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাই আইলিন তাঁর মোটা মাইনের চাকরি ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন সোমজিতের সঙ্গে আসামের সেই প্রত্যন্ত চা-বাগানে।

—দেখুন, মি. পুরকায়স্থ, এরকম বদলির ঘটনা টি এস্টেটে প্রায়শ ঘটে থাকে, তার এত সব খুঁটিনাটি মনে থাকার কথা নয়। কিন্তু এর মধ্যে নতুন কী গপ্পো আপনি খুঁজে পেয়েছেন?

—খুঁজে পেয়েছি এক ভয়ংকর গপ্পো। সেই প্রত্যন্ত চা-বাগানে বদলি করেও আপনি সেই সুখী পরিবারকে নিশ্চিন্ত থাকতে দেননি। হঠাৎ একদিন গৌহাটি থেকে জিপে ফেরার পথে সোমজিৎ নিহত হন পথদুর্ঘটনায়।

—তার জন্যও কি আমি দায়ী?

—আপনাকে দায়ী তো আমি করিনি, মি. শেখর, আপনার অফিসের অনেকেই আপনার আড়ালে বলে থাকে আপনিই লোক লাগিয়ে—

অলীকশেখর বিস্মিত হয়ে বলে উঠলেন, বলে নাকি? কী আশ্চর্য! আসামের কোনও পথদুর্ঘটনায় কেউ মারা গেলেও তা আমার কারণেই হতে পারে নাকি, মি. পুরকায়স্থ?

—ব্যাপারটা কাকতালীয় হলেও তার পরের ঘটনা কিন্তু আরও বিস্ময়কর।

—তারও আবার পর আছে?

—আছে, মি. শেখর। সেই সুন্দরী অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মহিলা আইলিন দাশগুপ্তকে কিন্তু আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

—কী আশ্চর্য, আপনি যে মশাই অবাক করা সব কথা বলছেন। আমি কলকাতায় বসে আছি, আর আসামের এক রিমোট টি-এস্টেটে কী ঘটছে না ঘটেছে তাতেও আমার হাত!

অলীকশেখর কিছুক্ষণ দম নিলেন তাঁর বক্তব্য পেশ করার পূর্বমুহূর্তে, তারপর বললেন, আসলে কি জানেন, মি. পুরকায়স্থ, অনেক কোম্পানির মালিক হওয়ার বিপদ অনেক। যে কোনও কোম্পানির বস হওয়া মানে কর্মীদের কাছে একধরনের অপরাধ। কোনও কর্মীই তাদের বসকে মনে মনে গ্রহণ করতে পারেন না। মাইনে যা-ই দিই তাদের মনে হয় কম্পানি অনেক প্রফিট করছে, তাদের আরও মাইনে দিতে পারে, আরও ডি এ বাড়াতে পারে। বোনাস বাড়াতে পারে প্রতি বছর। উপরের লেভেলের লোক, মানে অফিসাররা মনে করে আরও পার্কস দেওয়া উচিত তাদের। মোট কথা বসের উপর কেউ কোনও দিন খুশি থাকতে পেরেছে তা বোধহয় হয় না। যেই ডি এ বাড়ালাম, কিছুদিন সন্তুষ্ট হয়ে কম্পানির গুণগান করল। তারপর ক-মাস পরেই আবার গজিয়ে ওঠে নতুন ডি এ বা পার্কসের গপ্পো। আর—

পরক্ষণে গলার স্বর চড়িয়ে অলীকশেখর বললেন, প্রাইভেট কম্পানিগুলোতে খবর নিলে আপনি জানবেন সেখানে কর্মীদের মধ্যে একটা অদ্ভুত মানসিকতা কাজ করে। সেখানে বস মানেই এক আজব জীব। বস সাধারণভাবে তাদের কাছে খুব নিষ্ঠুর, অমানবিক, সমাজবহির্ভূত একজন কেউ যাদের হৃদয় বলে কিছু থাকে না।

অরিজিৎ পুরকায়স্থ লক্ষ করছিলেন অলীকশেখরের কালো চশমা পরা মুখাবয়বের অভিব্যক্তি।

—প্রাইভেট কম্পানিতে একদল লোক থাকে যারা বসের খুব বশংবদ। কিন্তু অপর শ্রেণির মানুষের সংখ্যাই বেশি যারা বসকে গালাগাল দিয়ে একধরনের সুখ অনুভব করে ও প্রথম শ্রেণির মানুষদের দালাল আখ্যা দিয়ে তাদের দুর্বল করে তোলার চেষ্টা করে। আর প্রাইভেট কোম্পানিতে যা কিছু অঘটন ঘটে তার জন্য তারা মালিককেই দায়ী করতে চেষ্টা করে। এ ধরনের অভিযোগ আপনি যে কোনও

কম্পানিতে অজস্র শুনতে পাবেন। আমাদের শুনতে শুনতে অভ্যাস হয়ে গেছে। আপনি চর পাঠিয়ে আমার পার্সোনাল লাইফ নিয়ে যতই স্ক্যান্ডাল ছড়াতে চেষ্টা করুন, আমার তাতে কিছু যায় আসে না। আপনি আমার কোম্পানিগুলোয় একদিন ভিজিট করবেন। দেখবেন এখানে ওখানে কত রকমের পোস্টার লেখা আছে তাতে আমাকে কতভাবে কালিমালিপ্ত করা আছে, ডিকশনারিতে হেন কোনও খারাপ বিশেষণ নেই যা লেখা হয়নি আমার নামে। সেগুলো যদি কাউন্ট করতে হয় তা হলে এখনই সব কোম্পানি লক আউট করে বাড়ি বসে থাকতে হয়। আপনারা যারা পুলিস যাদের নামেও তো প্রতিদিন লক্ষ অভিযোগ ওঠে, সেগুলো আপনি যদি সব সত্যি মনে করেন তা হলে আপনাদেরও তো চাকরি ছেড়ে দিতে হয়। হয় কি না বলুন? পুলিশকে গালাগাল না দিয়ে অনেক মানুষ আছে যারা জল খায় না, তা নিশ্চয় জানেন?

১৮

অরিজিৎ খেয়াল করছিলেন কথার মারপ্যাঁচ ও যুক্তিজালে বাঘা পুলিশ অফিসারকে ঘায়েল করার চেষ্টা করছেন ঝানু ব্যবসায়ী। বললেন, মি. শেখর, আপনি কিন্তু আসল গপ্পো ছেড়ে অন্যদিকে লাট খাওয়াতে চাইছেন আমাকে। আইলিন দাশগুপ্তের কেসটা আপনি যত সহজে গা থেকে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করছেন তেমনটি পারবেন না। আমরা আইলিন দাশগুপ্তের খোঁজে চারদিকে হুলিয়া জারি করে দিয়েছি। তাঁকে শেষবার দেখা গিয়েছে গৌহাটি স্টেশন থেকে কলকাতাগামী এক ট্রেনে উঠতে। সঙ্গে কেউ একজন ছিলেন, তিনি হয়তো আপনারই কোনও বশংবদ লোক। আর আইলিন হয়তো অনামিকার মতোই আপনার রক্ষিতা হয়ে বসবাস করছেন কলকাতারই কোথাও।

পুলিশের এক বড়ো কর্তার এ হেন ভয়ংকর অভিযোগ শুনে টেবিলের ওপাশে বসে থাকা বহু বিগ হাউসের কর্ণধার অলীকশেখরের অভিব্যক্তি যেন অবিকল স্টিল ফটোগ্রাফি। সানগ্লাস পরা থাকায় তাঁর জ্বলে ওঠা চোখ পড়া যাচ্ছে না এই মুহূর্তে। কিন্তু তাঁর চোয়ালের স্টিলায়িত হওয়ার দৃশ্য গভীরভাবে নিরীক্ষণ করলেন পোড়-খাওয়া ডি সি ডি ডি। পরক্ষণে শুনলেন অলীকশেখরের চেবানো উক্তি, ইচ্ছে করলে আপনি খুব রসালো কাহিনির সম্ভার লিখতে পারতেন, মি. পুরকায়স্থ।

—আপনার বিরুদ্ধে আরও বহু কাহিনি এই মুহূর্তে আমাদের ফাইলে লিপিবদ্ধ আছে, যদি আপনি চান আরও বলে যাই একের পর এক। বললে আপনি চমকে-চমকে উঠবেন।

—হ্যাঁ। তা চমকাতেও পারি কেন না আমার নিজের জীবনের কোনও ঘটনা বললে আমি নিশ্চয় চমকে উঠব না। কেন না সেই গল্পটা আমার জানা। কিন্তু অন্যের জীবনের গল্প আমার নামে চালাতে চেষ্টা করলে অবশ্যই চমকে উঠব।

অলীকশেখর কিছু বলার আগেই হঠাৎ তাঁর টেবিলে বেজে উঠল টেলিফোন. একটু অবাকই হলেন কেন না অপারেটরকে বলাই ছিল খুব জরুরি কল না হলে তাঁকে যেন বিরক্ত না করা হয়, তা সত্ত্বেও যখন লাইন দিয়েছে নিশ্চয় খুবই অপরিহার্য কল। রিসিভার তুলতেই ওপাশে যাঁর স্বর শুনলেন তাতে সোজা হয়ে বসলেন দ্রুত, স্যার—

কিছু জরুরি কথা শুনলেন প্রবল মনোযোগ দিয়ে ও প্রতি তিন সেকেন্ডে একবার করে স্যার শব্দটি উচ্চারণ করলেন যাতে বোঝা গেল ওপাশের ব্যক্তিটি উচ্চপদস্থ কেউ। কথা বলার মাঝখানে একবার চোখ তুলে দেখলেনও অলীকশেখরের দিকে যার অর্থ অলীকশেখর সম্পর্কিত কোনও খবর। 'হ্যাঁ, স্যার, হয়ে এসেছে প্রায়' বলে রিসিভার রেখে তাকালেন অলীকশেখরের দিকে, বললেন, যদি সব কাহিনি সত্যিই লিখি কোনওদিন তবে তা হবে এ যুগের কোনও বেস্ট-সেলার থ্রিলার। যাই হোক বিষয়টা ভালো বললেন, আমি সব রিপোর্টের একটি করে ফটোকপি করে তুলে রাখব আমার ব্যক্তিগত ফাইলে, অবসর নেওয়ার পর হয়তো কোনও দিন লিখতেও পারি এত সব অকথিত কাহিনি।

—দেখুন, মি. পুরকায়স্থ, ইউ আর গোয়িং টু ফার। আপনি ঠিক জানেন না আপনি যার সঙ্গে কথা বলছেন তিনি কোন লেভেলের পার্সোনালিটি। আমার ব্যস্ত সময় এভাবে নষ্ট করার কারণে প্রয়োজন হলে আপনার কেরিয়ার শেষ করে দিতে পারি তা বোধহয় আপনি জানেন না।

—তা জানি মি. শেখর। এও জানি আমার বড়ো সাহেবের বড়ো সাহেবের সঙ্গে আপনার খুবই দরহম মহরম। একটু আগে তিনি আমাকে ফোন করলেন কেন না আপনার অনুপস্থিতির কারণে কোনও একটি বোর্ড মিটিং আটকে আছে। বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সএর মাননীয় সদস্যরা আপনার অপেক্ষায় আছেন, আপনি গেলে তবে সেই মিটিং শুরু হবে।

অলীকশেখর প্রায় গর্জে উঠে বললেন, সেই কথাই তো তখন থেকে আপনাকে আমি বলছি। কলকাতা শহর ছেড়ে আমি পালিয়ে যাচ্ছি না। আপনি আমাকে পরেও ডেকে হাজারবার ইন্টারোগেট করার সময় পাবেন। কিন্তু কোম্পানির বোর্ড মিটিং ডাকা থাকে বহু আগে থেকে নোটিস দিয়ে। সেখানে মিটিং না হতে পারলে কোম্পানির বহু সময় বহু টাকা নষ্ট। বহু সিদ্ধান্তও স্থগিত রাখতে হয়। তাতে এমপ্লয়িজদের তরফ থেকে এজিটেশন হওয়ার আশঙ্কা থাকে। অফিস ভাঙচুর হতে

পারে। আমি ইচ্ছে করলে আপনার নোটিস ইগনোর করতে পারতাম। টাইম নিতে পারতাম পরে আসব বলে, কিন্তু আমি ল আবাইডিং সিটিজেন। আমার সারাদিনে বহু অ্যাসাইনমেন্ট থাকে। তা সত্ত্বেও আপনি ডাকতেই হাজির হয়েছি। আপনি কিছু ফলস অ্যালিগেশন এনে আমাকে হ্যারাজ করছেন সেই সকাল থেকে। দি জ আর অল কনকক্টেড স্টোরিজ। অফিসে বড়ো সাহেবদের নামে এরকম একশো এক কেন, থাউজ্যান্ডস অ্যান্ড ওয়ান গসিপ চালু থাকে। আমি আপনাকে আগেও এ কথা বলেছি—

—কিন্তু মি. শেখর, আমি একটি সরাকরি দায়িত্ব পালন করছি। বিবেক হত্যারহস্যে আপনার ভূমিকা নিয়ে বড়ো প্রশ্ন উঠেছে, সেই অভিযোগ একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। সুতরাং আপনার যত কাজই থাকুক, ইন্টারোগেশনে আপনাকে সময় দিতেই হবে। ঠিক আছে, আপনি এখনকার মতো যেতে পারেন।

অলীকশেখর এতক্ষণে তাঁর চোখের কালো আবরণ সরালেন, অরিজিৎ পুরকায়স্থ দেখলেন প্রায় বাঘের মতো জ্বলছে তাঁর চোখের ধূসর মণিদুটো। পারলে অরিজিতের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে তাঁর বিশাল থাবাটি বসাতেন সজোরে। পারছেন না বলেই ধকধক করছে তাঁর শাণিত দৃষ্টিপাত।

পরক্ষণে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন বেশ লম্বা-চওড়া চেহারার অলীকশেখর। কোনওদিকে দৃকপাত না করে বুটে মসমস শব্দ তুলে বেরিয়ে গেলেন চেম্বারের বাইরে।

তিনি চলে যাওয়ামাত্র অরিজিৎ তাকালেন এতক্ষণ তাঁর চেম্বারে স্থাণুবৎ বসে থাকা পুলিশ ইনস্পেক্টর দেবজ্যোতি নাগ রায়ের দিকে। ভুরুতে ঢেউ তুলে বললেন, কী বুঝলেন?

—স্যার, খাস রয়েল বেঙ্গল।

—হ্যাঁ, একটু আগে খোদ বড়ো সাহেবের বড়ো সাহেব ফোন করে বললেন, আপনি একজন ভি ভি আই লেভেলের পার্সোনালিটিকে নাকি ধরে রেখেছেন ইন্টারেগেশন করতে গিয়ে। এখনই ছেড়ে দিন। নইলে নাকি হাই কোর্টে মুভ করবে আপনার বিরুদ্ধে কনটেম্পট কোর্টএর অভিযোগ এনে।

দেবজ্যোতি নাগ রায় সামান্য বিস্মিত হলেন, কনটেম্পট অফ কোর্ট! কেন স্যার, আমরা তো আদালতের আদেশের কোনও অবমাননা করিনি!

—করিনি ঠিকই। কিন্তু হাইকোর্টে গিয়ে অলীকশেখরের মাননীয় উকিলবাবু যদি বোঝান যে, হুজুর, আপনি আগাম জামিন মঞ্জুর করেছেন, অথচ ডি সি ডি ডি তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করার অজুহাতে অনাবশ্যকভাবে ডিটেইন্‌ড্‌ করে রেখেছেন সকাল থেকে, তাতে তাঁর এতগুলি জরুরি মিটিং বাতিল করতে হয়েছে, তাতে

কম্পানির ডাহা লস এত লক্ষ টাকা। বা কোটি টাকা বললেও বিস্ময়ের কিছু নেই। তখন—

—খুব সাংঘাতিক ব্যাপার, স্যার।

—সাংঘতিকই বটে। 'গভীর জলের মাছ' শব্দগুলিও অলীকশেখরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আরও নতুন প্রবচনের সৃষ্টি করতে হবে। এতটাই ঘ্যামা লোক যে, বিবেক দ্বিবেদীর মতো দু-চারটে লোকের লাশও হজম করে ফেলতে পারে মুহূর্তে।

—স্যার, মনে হচ্ছে খুব সহজে ছেড়ে দেবে না লোকটা। বেশ লড়বে।

—হ্যাঁ, লড়বে। কিন্তু আমাদেরও এগোতে হবে অনেক মাথা ঘামিয়ে। এসব লোকের অপরাধ প্রমাণ করা প্রায় দুঃসাধ্য। দেখছেন না, এতগুলো দিন পার হয়ে গেল, এখনও একটুও এগোতে পারিনি ইনভেস্টিগেশন করে। বিবেক দ্বিবেদীর ব্যবসার গতিপ্রকৃতিও যেমন দুর্বোধ্য, তেমনই তার হত্যাকারীও ধরাছোঁয়ার বাইরে।

—কিছু বুঝতে পারলেন, স্যার?

—ঠিক বোঝা যাচ্ছে না এখনও। দারুণ ধুরন্ধর ব্যক্তি। হয়তো কাউকে সুপারি দিয়েছিল, তারাই নিকেশ করে দিয়েছে বিবেককে। হয়তো বাইরে থেকে এসেছিল, কাজ শেষ করে বেরিয়ে গেছে সবার অজান্তে।

—স্যার, বিবেক দ্বিবেদীর ড্রাইভারের খবর এসেছে শিমুলতলা থেকে।

অরিজিৎ আগ্রহী হলেন, কী খবর এল? ঘটনার পর সে গিয়েছিল বাড়িতে ?

—না, স্যার, পুলিশের লোক গিয়েছিল তার গ্রামের বাড়িতে। বাড়ির লোক বেমালুম অস্বীকার করেছে, বলেছে তার সম্পর্কে কোনও খবরই তারা রাখে না।

অরিজিৎ চিন্তিত হলেন, বললেন, আপনি আরও খোঁজ নিতে থাকুন। ওখানকার এমন কাউকে কি পায়নি যাকে ধরে একটু রগড়ালেই বেরিয়ে আসত কথাটা?

—না, স্যার। ওখানকার এস পি-র লোক ড্রাইভার রোহন সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য রেখে এসেছে যাতে সে বাড়ি ফেরামাত্র কলকাতায় জানিয়ে দেয়।

অরিজিৎ চিন্তায় পড়লেন, বুঝলেন, এই মামলায় ড্রাইভারই হচ্ছে ভাইটাল উইটনেস। ড্রাইভার ধরা পড়লেই বেরিয়ে আসত আসল খবর। লোকটা যে এভাবে জলজ্যান্ত উবে গেল সেইটেই অদ্ভুত লাগছে।

—স্যার, আপনাকে বলেছি, বিষয়টা খুবই জটিল। যারা করেছে তারা এত প্ল্যানমাফিক করেছে যে, বিন্দুমাত্র ক্লুও রেখে যায়নি। ড্রাইভারই ছিল লিঙ্কম্যান। তাকেই হয়তো পাঠিয়ে দিয়েছে দেশের বাইরে যাতে পুলিশ তার কোনও চিহ্ন খুঁজে না পায়।

—কিন্তু দিল্লির কোনও রিপোর্টও তো নেই। দিল্লিতে কারা বিবেককে ফলো করেছিল সে তথ্যও যেমন জানা প্রয়োজন, তেমনই জানতে হবে তাদের কোন লোকজন কলকাতায় থেকে ফলো আপ করছিল বিবেকের গতিবিধি। বিবেক ফেরামাত্র তাকে কিডন্যাপ করে মার্ডার করে দিল, অথচ একটিও ক্লু রেখে গেল না এটা খুবই আশ্চর্য ব্যাপার।

দুই অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসার আশ্চর্য হয়ে বসে রইলেন মাঝে মস্ত একটি জিজ্ঞাসাচিহ্ন ঝুলিয়ে।

দেবজ্যোতি নাগ রায় হঠাৎ বললেন, সার, মিসেস গার্গী চৌধুরি কাল ফোন করেছিলেন কয়েকটি ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চান। কিছু তথ্য নাকি পেয়েছেন এ বিষয়ে? খুব জরুরি নাকি!

১৯

গার্গীদের ডেকার্স লেনের অফিস থেকে পুলিশ হেডকোয়ার্টার প্রায় পাথর-ছোঁড়া দূরত্বে। ট্রাফিক সিগন্যাল ও জ্যামের দৌরাত্ম্যে গার্গীর পেরোতে লাগল দশ মিনিটের মতো। মার্চের দুপুরে রোদের তাত জ্বলন্ত তুবড়ির মতো ফুলকি ছড়াচ্ছে রাজপথে। সেই সঙ্গে বাতাসে যেন ইঁটভাটার চাপা আগুনের হলকা। কোনও ক্রমে পথটা পেরিয়ে ডি সি ডি ডি-র শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত চেম্বারে ঢুকতে একটু স্বস্তি। তখনও গার্গীর কপাল-গাল বেয়ে ঘাম গড়াচ্ছে গলার দিকে।

তাকে দেখে অরিজিৎ পুরকায়স্থ বললেন, স্যরি টু ডিসটার্ব ইউ, ম্যাডাম। এই গরমে আপনাকে আসতে হল!

গার্গী হেসে বলল, না, না, দুঃখিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। আপনি তো ইচ্ছে করলে গোটা কলকাতা এ সি করে দিতে পারবেন না!

অরিজিৎ বেল বাজিয়ে আর্দালি ডেকে দু-কাপ কফির অর্ডার দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁ, বলুন, খুব জরুরি কারণ যখন বলেছেন নিশ্চয় এমন কোনও ঘটনা যা আমাদের ইনভেস্টিগেশনে সাহায্য করবে!

—বুঝতে পারছি না সাহায্য করবে কি না। কিন্তু তিতিক্ষা খুব বিপন্ন, তাকে প্রোটেকশন দেওয়াটা খুব জরুরি।

অরিজিৎ টানটান হয়ে বসলেন, গার্গীর দিকে ন্যস্ত করলেন পোড়-খাওয়া চোখ, কীরকম?

—তিতিক্ষাদের এক পারিবারিক বন্ধু আছেন যিনি এতকাল আমেরিকায় থাকতেন। শেষাদ্রি হাওলাদার। তাঁর পারিবারিক জীবন খুব জটিল। তাঁর স্ত্রী

এষণার সঙ্গে বোধহয় ডিভোর্স হয়ে গেছে, বিবেকের বিপদের সময় তিনি এক কথায় বহু টাকা ঋণ হিসেবে দিয়েছিলেন ওদের হাতে। ডিভোর্সের পর তিনি এখন সিঙ্গলম্যান। কী কারণে যেন ফিরে এসেছেন কলকাতায়। তিতিক্ষাও যেহেতু উইডো, তিনি এখন হাত বাড়াতে চাইছেন তিতিক্ষার দিকে।

—কীরকম হাত বাড়িয়েছেন? মানে শয্যাসঙ্গিনী হওয়াব প্রস্তাব দিয়েছেন?

গার্গী অস্বস্তিতে পুলিশ অফিসার এমন সরাসরি ইঙ্গিত দেওয়ায়। কফির ট্রেও পৌঁছে গেল সে সময়। গরম কফিতে চুমুক দিয়ে বলল, প্রায় সেরকমই। তিতিক্ষা যতবারই এড়াতে চাইছে, শেষাদ্রি বলছেন, তিতি, নো ওয়ে আউট। তোমাকে আমার প্রস্তাবে সম্মত হতেই হবে। বিবেকের সই করা অনেকগুলি কাগজ আমার জিম্মায়। সব সই স্ট্যাম্প পেপারের উপর।

—তা হলে খুব ফেঁসেছেন তিতিক্ষা দ্বিবেদী!

—হ্যাঁ, শেষাদ্রি নাকি এও হুমকি দিয়েছেন, তিতিক্ষা যদি তাঁর প্রস্তাবে রাজি না হয়, শেষাদ্রি মামলা করবেন তিতিক্ষার নামে। চিটিং কেস। তাতে তিতিক্ষার জেল অনিবার্য।

অরিজিৎ বললেন, তা হলে আইনের বই ঘাঁটতে হবে। স্ট্যাম্প পেপারে বিবেকের সই থাকলে তিতিক্ষার জেল হতে পারে কি না!

—শেষাদ্রি খুব ঘোড়েল টাইপের লোক। বিবেকের সমস্ত সই নাকি ব্ল্যাঙ্ক স্ট্যাম্প পেপারের উপর করা। শেষাদ্রি এখন যা-খুশি লিখতে পারেন তাতে। তিনি বলেছেন, বিবেক যদি লোন শোধ করতে না পারে তা হলে তিতিক্ষাই তার বাবার কাছ থেকে যাবতীয় টাকা জোগাড় দেবে এরকম অঙ্গীকার করা থাকবে সেই স্ট্যাম্প পেপারে।

অরিজিৎ ভাবনায় পড়লেন মনে হল, তিতিক্ষা কি কোনও লইয়ারের সঙ্গে কথা বলেছেন?

—নিশ্চয় বলছে। কিন্তু এদিকে শেষাদ্রি তিতিক্ষাকে পাওয়ার জন্য প্রায় পাগল হয়ে উঠেছেন। তিতিক্ষাকে আলটিমেটাম দিয়ে বলেছেন 'দুদিন সময় দিলাম।' ইয়েস অর নো বলতে হবে তাকে। তারপর উনি পরবর্তী রণকৌশল ঠিক করবেন।

—ইন্টারেস্টিং! কিন্তু মি. হাওলাদার বোধহয় অঙ্কের জন্য ট্রেন মিস করছেন, ম্যাডাম।

—মিস করছেন মানে?

—তিতিক্ষা দ্বিবেদী এখন অন্য গ্রহের বাসিন্দা হতে চলেছেন, বলে অরিজিৎ আর একটি ছোট্ট শব্দ যোগ করলেন, সম্ভবত।

গার্গী এখনও পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারছে না পুলিশের বড়ো কর্তাটি ঠিক কী বলতে চাইছেন! ভুরু উঁচিয়ে বলল, মানে?

—আপনি নিশ্চয় তিতিক্ষা দ্বিবেদীর গত কয়েকদিনের হোয়ারঅ্যাবাউটস জানেন না!

গার্গী কিছু জানে, কিন্তু সবটা নয়। পুলিশ নিশ্চয় বেশি খবর রাখছে তিতিক্ষা সম্পর্কে কেন না তারা কোনও টিকটিকি ফিট করে দিয়েছে তার পিছনে। জানতে চাইল, নতুন কিছু ঘটেছে?

—তিতিক্ষা দ্বিবেদী এখন এক নতুন সওয়ারি পেয়েছেন তা জানেন?

কফিতে চুমুক দিতে গিয়ে বিষম খাচ্ছিল গার্গী। সওয়ারি শব্দটা ঠিক মনঃপূত হল না তার। পুলিশ অফিসারদের কথা অনেক সময় অতিক্রম করে যায় শালীনতার সীমা। গার্গী ঘাড় নাড়ে, সব জানি না। আপনি কার কথা বলতে চাইছেন? নীলার্ণব কাশ্যপ?

—একজ্যাক্টলি। তিতিক্ষা এখন নীলার্ণবের সঙ্গে খুব হবনবিং করছেন। আপনি হয়তো জানেন না কাল নীলার্ণব কাশ্যপের জন্মদিনের পার্টি ছিল, সেখানে অনেক রাত পর্যন্ত হইচই হয়েছে। খানাপিনা হয়েছে। নীলার্ণবের সঙ্গে নেচেছেনও তিতিক্ষা। শুনলাম তিতিক্ষা প্রচুর মদ্যপান করে বেসামাল হয়ে পড়েছিলেন। তাঁকে প্রায় পাঁজাকোলা করে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছেন নীলার্ণব।

গার্গী শুনেছিল তিতিক্ষা যাবে নীলার্ণবের জন্মদিনের পার্টিতে। তিতিক্ষাই নাকি ছিল পার্টির মূল আকর্ষণ। তারপর এত কাণ্ড হয়েছে জানত না। বলল, তিতিক্ষার এখন খুব খারাপ সময় যাচ্ছে। এত টাকা ঋণ, তার শোধ করার একমাত্র উপায় ছবি এঁকে পয়সা উপার্জন। শ্রাবণকুমার তাঁকে যে প্রলোভন দিয়েছেন, তাতে তিনিই এখন হতে পারেন তিতিক্ষার একমাত্র রক্ষাকর্তা। নীলার্ণব শ্রাবণকুমারের প্রতিনিধি। অতএব কাউকে না-পেয়ে হয়তো নীলার্ণবকেই ভর করতে চাইছে তিতিক্ষা।

—আই সি, তা হলে শেষাদ্রি হাওলাদারের নো চান্স, অরিজিৎ হাসছিলেন মৃদু মৃদু।

—কিন্তু শেষাদ্রি খুব সহজে হার মানার পাত্র নন। তিতিক্ষাকে এর মধ্যে তিনবার ফোন করা হয়েছে। হয়তো আজ রাতেই তিনি হানা দিতে পারেন তিতিক্ষার বাড়িতে।

—আপনি কী চাইছেন, ম্যাডাম?

—তিতিক্ষাকে পুলিশ প্রোটেকশন দেওয়াটা জরুরি।

অরিজিৎ ভাবলেন সমস্যাটার গুরুত্ব, তারপর বললেন, কিন্তু তিতিক্ষা নিজে তো কোনও প্রোটেকশন চাইছেন না!

গার্গী এক মুহূর্ত থমকায়, বলে, তিতিক্ষা হয়তো ঠিকমতো গাইডেন্স পাচ্ছে না। বুঝতে পারছে না এই সংকটে কী করা উচিত!

—তাঁর বাবাকে ঘটনাটা বলেছেন তিতিক্ষা?

গার্গী ইতস্তত করে, বোধহয় না।

—এ ক্ষেত্রে তিতিক্ষার প্রধান রক্ষাকর্তা অলীকশেখর। তাঁর হাত কিন্তু অনেক লম্বা!

গার্গী সজোরে ঘাড় ঝাঁকায়, বলে, অলীকশেখর বোধহয় তাঁর মেয়ের বিষয়ে হাত তুলে নিয়েছেন। বিশেষ করে শ্রাবণকুমারের দেওয়া চেক বাউন্স করার পরে তিনি বলেছেন, তিতি আর এক ফ্রডের পাল্লায় পড়েছে।

—ম্যাডাম, আমারও তাই মনে হচ্ছে। শ্রাবণকুমার খুব বড়ো খেলোয়াড়।

গার্গী থমকায় পুনর্বার, আপনার তাই মনে হচ্ছে? তা হলে তো তিতিক্ষার সামনে খুব বড়ো বিপদ। শ্রাবণকুমারের টাকার উপর নির্ভর করে আছে ওর ভবিষ্যৎ।

—হয়তো তাই নীলার্ণবের কাছে নিজেকে সারেন্ডার করেছে। হয়তো তিতিক্ষা দ্বিবেদীর ধারণা হয়েছে নীলার্ণবকে খুশি করতে পারলেই শ্রাবণকুমারের টাকা এসে যাবে। কিন্তু তিতিক্ষার ভুল হয়তো সেখানেই!

গার্গী বুঝতে চাইল অরিজিৎ পুরকায়স্থর বিশ্লেষণ।

—দেখুন ম্যাডাম, নীলার্ণব একটি সিঁড়ি মাত্র। তার কাঁধে ভর দিয়ে উঠতে হয় উপরে। কিন্তু কেউ যদি সিঁড়িতেই আটকে যায় তা হলে তার আর উপরে ওঠা হল না, চেক এনক্যাশমেন্টও হবে না।

গার্গী যা বোঝার বুঝে গেল অরিজিতের কথায়। তিতিক্ষার ভবিষ্যতের কথা ভেবে উদ্বিগ্নও হল। তিতিক্ষা হঠাৎ ভুলের ফাঁদে পা দিয়ে জড়িয়ে পড়ছে আরও নতুন ঝামেলার আবর্তে তা ভেবেই তার এত উৎকণ্ঠা।

—কিন্তু শেষাদ্রির হাত থেকে তিতিক্ষা বাঁচবে কী করে?

—দেখুন, ম্যাডাম। তিতিক্ষার হয়তো অন্য কোনও স্ট্রাটেজি আছে।

—কী স্ট্রাটেজি?

—তিতিক্ষার এখন প্রচুর টাকার প্রয়োজন। শ্রাবণকুমারের চেক যদি ভাঙাতে না পারেন, তবে হয়তো শেষাদ্রি হাওলাদারের চেক দরকার হবে তাঁর। তিতিক্ষা হয়তো এখনই প্রোটেকশন চাইছেন না! হয়তো শেষাদ্রিকে হাতে রাখতে চাইছেন। তিতিক্ষা যদি রাতে নিজে তাঁর ঘরের গেট খুলে না দেন, শেষাদ্রি নিশ্চয় গেট

ভেঙে ভিতরে ঢুকবেন না! আজ রাতে ওয়াচ রাখি ওঁর বাড়ির সামনে। যদি স্বেচ্ছায় দরজা খুলে দেন তো বুঝতে হবে তিতিক্ষা শেষাদ্রিকেও হাতছাড়া করতে চাইছেন না।

গার্গী বিভ্রান্ত বোধ করছিল অরিজিতের বিশ্লেষণে।

—ভাবছেন তিতিক্ষা দ্বিবেদী একই সঙ্গে দু-নৌকোয় পা দিয়ে চলতে চাইবে কেন?

গার্গী কিছু বলতে চাইল, তার আগেই—

—তিতিক্ষার চারপাশে এখন গুটিয়ে আসছে ঋণের জাল। তিতিক্ষা হয়তো বলতে চাইছেন তাঁর কাছে এক কপর্দকও নেই। কিন্তু সবাই তা শুনবে কেন? তাঁর এখন টাকা-সংগ্রহের পথ দুটি। প্রথম উৎস তাঁর বাবা অলীকশেখর। তিতিক্ষা তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী। অলীকশখের ইচ্ছে করলেই সমস্ত ঋণ চোখ বুজে শোধ করে দিতে পারেন। কিন্তু এ ধরনের বড়ো ব্যবসায়ীদের আপনি নিশ্চয় চেনেন। এঁরা কোটি কোটি টাকার লোন নেন ব্যাঙ্ক থেকে, কিন্তু শোধ দিতে খুব কষ্ট হয় তাঁদের। দ্বিতীয় সোর্স শ্রাবণকুমার। ব্যাঙ্কগুলো তো বটেই, সমস্ত উত্তমর্ণরা এখন তিতিক্ষার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করছে যাতে টাকাটা ফিরে পেতে পারে।

২০

পুলিশ অফিসার অরিজিৎ পুরকায়স্থ যত সহজে তিতিক্ষার সমস্যাটার সমাধান করতে চাইলেন, গার্গী তা হজম করে উঠতে পারল না চট করে। তিতিক্ষাকে এর আগে তেমন ভালো করে চিনত না যদিও, কিন্তু পরিস্থিতি যেদিকে গড়াচ্ছে তাতে তার ধারণা ক্রমশ আরও জটিল গহ্বরের দিকে রওনা দিচ্ছে তিতিক্ষা।

নীলার্ণবের সঙ্গে তিতিক্ষার মাখামাখি ঠিক কোন পর্যায়ে তা জানার জন্য পরদিন সকালে তিতিক্ষার বাড়ির দিকে রওনা দিল গার্গী। নীলার্ণব কি সিঁড়িমাত্র, না তিতিক্ষার ল্যান্ডিং তা জানাটা জরুরি। তিতিক্ষার সঙ্গে এ ক-দিন কথা বলে যা মনে হয়েছে খুব মুডি মেয়ে, শিল্পীরা যেমন হয়ে থাকে, নিজের শিল্প বিষয়ে যতটা সিরিয়াস, ভালোমন্দ বোঝার মতো ততটা সাবালক নয়।

ব্রেকফাস্ট খেয়ে একেবারে অফিসে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে বেরিয়েছে গার্গী, দুপুরে অফিসে আনিয়ে নেবে লাঞ্চ। কসবা থেকে নিউ আলিপুর বেশিক্ষণের পথ নয়, ড্রাইভার রতন হু হু করে গাড়ি চালিয়ে ঢুকিয়ে দিল তিতিক্ষাদের গেটের ভিতর।

তিতিক্ষা আগের দিনের মতোই তার ক্যানভাসের সামনে দাঁড়িয়ে কারিকুরি করছে তুলি নিয়ে। ক্যানভাসে যথারীতি আর একটি ন্যুড ছবি, উপুড় হয়ে শুয়ে

আছে একটি যুবতী, তার নগ্ন পিঠে একটি বিশাল মাকড়শা থাবা বিছিয়ে বসে জাল বিস্তার করে ঢেকে ফেলতে চাইছে মেয়েটির নগ্নতা। ছবিটি এই মুহূর্তে ভারি প্রতীকী মনে হচ্ছিল গার্গীর।

গার্গী চোখ চালিয়ে খুঁজছিল তিতিক্ষার মডেলের ফটোগ্রাফ। প্রত্যাশা অনুযায়ী ক্যানভাসের নীচে দাঁড় করানো ফটোটির নগ্নিকা তিতিক্ষা নিজেই। ফটো দেখেই সে চিনতে পারে তিতিক্ষা উপুড় শুয়ে আছে তাদের বেডরুমের খাটটিতে। আগের দিনের মতোই এই ফটোটিতেও সে নগ্ন। বেডরুমটি যে তাদেরই তা দেওয়ালের কয়েকটি পেইন্টিং দেখেই শনাক্ত করতে দেরি হয় না তার।

গার্গীকে দেখে তিতিক্ষা হাসল, বোসো, গার্গীদি, আমার সামান্য একটু টাচ দেওয়া বাকি।

তিতিক্ষা এই সাতসকালে স্নান করে তৈরি হয়ে নিয়েছে জিনসের রংচটা প্যান্টের উপর সাদা ধবধবে একটি টপ পরে। তার কি কোথাও যাওয়ার আছে এমন ভাবনা তার ভিতরে ঘূর্ণি সৃষ্টি করার আগেই তিতিক্ষা বলল, নীলার্ণব এক্ষুনি আসবে ছবিটা নিতে।

'নীলার্ণব আসবে' শব্দদুটি ভালো করে খেয়াল করল গার্গী। নীলার্ণবের সঙ্গে তিতিক্ষার ঘনিষ্ঠতা কতখানি তা জানতে হবে যে কোনও ভাবে। না, গার্গী কট্টরপন্থী নয় যে, তিতিক্ষার এই মেলমেশাকে পছন্দ করছে না। আসলে তিতিক্ষার সামনে যে-বিপদ ঘনিয়ে আসছে সেই জটাজাল থেকে কীভাবে বেরোতে চাইছে তা জানাটাই উদ্দেশ্য তার। নিশ্চয় নীলার্ণব তাকে এমন কিছু আশা জাগিয়েছে বা পথ দেখিয়েছে যার ফলে তার পিছনে ছুটছে রোজ।

না কি কোনও আবেগ কাজ করছে তার এই ছোটার পিছনে!

একটু পরেই বাড়ির বাইরে গাড়ি থামার শব্দ, পরক্ষণে কাজের মেয়েটির পিছু পিছু যিনি প্রবেশ করলেন তিনি নীলার্ণবই। গার্গীকে দেখে বললেন, গুড মর্নিং, ম্যাডাম।

—গুড মর্নিং, গার্গী প্রত্যুত্তরে জিজ্ঞাসা করে,তা এত সকালে দুজনে কোথায়?

নীলার্ণব হেসে বলল, বলতে পারেন অ্যাডভেঞ্চারে।

গার্গী অনুধাবন করতে চাইল নীলার্ণবের কথার ঘোরপ্যাঁচ। জানতে চাওয়া উচিত নয়, কিন্তু জেনে নেওয়াটাও এই মুহূর্তে জরুরি, মজা করার গলায় বলল, তা অ্যাডভেঞ্চার কোথায়? আন্টার্টিকায়, না আমাজন অরণ্যে?

—না, না, অত দূরে নয়, এই কলকাতায়, সাউথ কলকাতার একটি স্টুডিওতে।

—শ্যুটিং নাকি?

এতক্ষণে উত্তর দেয় তিতিক্ষাই, আর বোলো না গার্গীদি, শ্রাবণকুমারের মাথায়

কী এক নতুন আইডিয়া এসেছে। আমার একজিবিশনের সময় সেই যে একটা ব্রোসিওর করেছিলাম তাতে আমার কয়েকটা ফটোগ্রাফ ছিল, সেই ফটোগ্রাফ দেখে শ্রাবণকুমার ঠিক করেছেন তাঁর হোটেলে আমার পেইন্টিং যেমন থাকবে তেমনি থাকবে শিল্পীর কয়েকটি প্রমাণ সাইজের ফটোগ্রাফ। তাতে নাকি ট্যুরিস্টদের আকর্ষণ বাড়বে আরও।

নীলার্ণব উৎসাহিত হয়ে গার্গীকে বোঝাতে বসে, আইডিয়াটা কি খারাপ, ম্যাডাম? তিতিক্ষা যা সুন্দরী, যা ফিগার তাতে আইডিয়াটা খেয়ে যাবে নিশ্চিত।

গার্গী যত দেখছে হকচকিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। তিতিক্ষাকে নিয়ে শ্রাবণকুমার আর নীলার্ণব যে কী করবে, কী না করবে ভেবে পাচ্ছে না বোধহয়।

কথার বলার ফুরসতে নীলার্ণব ক্যানভাসের পাশ থেকে তুলে নিয়েছে তিতিক্ষার ন্যুড ফটোগ্রাফটি, দেখছে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, তারপর যথাস্থানে রেখে দিয়ে বলল, কলকাতার নামীদামি মডেলরাও তিতিক্ষার কাছে নস্যি।

তিতিক্ষাকে যথেষ্ট খুশি-খুশি দেখাচ্ছিল নীলার্ণবের স্তুতিতে। ততক্ষণে তিতিক্ষার হাতের তুলি ক্ষান্ত দিয়েছে ক্যানভাসে আঁকিবুকি কাটায়। গার্গী লক্ষ করছিল গল্প করতে করতে তিতিক্ষা এঁকে ফেলছে মাকড়শার বিশাল ও সূক্ষ্ম জালটি যা ক্রমে ঢেকে ফেলেছে ছবির নগ্নিকার নগ্নতা। মাকড়শার জালের মধ্যে দেখা যাচ্ছে তার শরীরের দৃশ্য। ছবির ন্যুডিটির উপর একটা পাতলা আস্তরণ থাকায় রহস্যের একটা চমৎকার আভাস।

গার্গী মুগ্ধ হয়ে দেখছিল জালের স্বচ্ছতার ভিতর দিয়ে নগ্নিকার যেটুকু শরীর দৃশ্যমান তা সত্যিই অনবদ্য।

নীলার্ণবও প্রশংসা করল ছবিটির, বলল, দেখেছেন, ম্যাডাম, ছবিটা কোথা থেকে কোথায় দাঁড় করিয়ে দিল এটুকু সময়ের মধ্যে। দেন–, তিতিক্ষা, তুমি নিশ্চয় রেডি? স্টুডিওতে পৌঁছোবার সময় ঠিক সাড়ে ন-টা। ক্যামোরম্যান প্রস্তুত থাকবেন। ঠিক আট ঘন্টা শ্যুটিং হবে। তার মধ্যে অনেকগুলো পোজ—

তিতিক্ষা তাকায় গার্গীর দিকে, গার্গীদি, স্যরি, আজ দেখতেই পাচ্ছ আমি খুব বিজি। তোমার সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে?

গার্গীও উঠে দাঁড়ায়, বলে, ঠিক আছে এই তো দেখা হল। আবার আমি আসব কোনও সময়।

তিতিক্ষা তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল নীচে, হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বলল, গার্গীদি, একটা ছোট্ট ডেভেলপমেন্ট আছে, গতকাল কোর্টে উকিল লাগিয়েছিলাম, আমাদের গাড়িটা পুলিশ গ্যারাজে সিল করে দিয়ে গিয়েছিল, সেইটে রিলিজ করতে পেরেছি।

গার্গী উচ্ছ্বসিত হয়, তা হলে তো তোমার একটা বড়ো জয়!

—হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি, গার্গীদি। গাড়ি ছাড়া চলে নাকি আমার? এ ক-দিন যা অসহায় লাগছিল কী বলব? নীলার্ণব যেখানে যেতে বলে তাকে বলতে হয় গাড়ি পাঠাও, তবে যাব। সেদিন নীলার্ণবের বার্থ ডে পার্টিতে গিয়ে যা কাণ্ড করেছি!

গার্গী জানে কী কাণ্ড, তবু কাণ্ডকর্ত্রীর নিজের মুখ থেকে শোনা যাক কী কাহিনি! জিজ্ঞাসা করে, কী এমন কাণ্ড করেছ?

তিতিক্ষা হেসেই অস্থির, হাসি থামিয়ে বলল, সেদিন বার্থডে পার্টিতে গিয়ে একটু বেশি ড্রিঙ্ক করে ফেলেছিলাম। বোধহয় নীলার্ণব দুষ্টুমি করে ককটেল জাতীয় কিছু দিয়ে থাকবে। খুব নাকি নেচেছি। অনর্গল কথা বলেছি। তারপর আর কিছু মনে নেই। পরে নীলার্ণব বলল, ও নাকি আমাকে কোলে করে নিয়ে গাড়িতে বসিয়ে ড্রাইভ করে পৌঁছে দিয়েছে বাড়িতে। হি হি হি—

নীলার্ণবও হাসছিল, ম্যাডাম, মদ খেলে তিতিক্ষা এত উল্টোপাল্টা করে তা জানতাম না। আমি বলেছি একটু কম করে খেতে। ভাগ্যিশ আমি সঙ্গে ছিলাম। নইলে বেজায়গায় গিয়ে কী যে করে ফেলবে তার ঠিক কী!

তিতিক্ষার সঙ্গে গল্প করতে করতে বাইরে বেরোয় গার্গী। তার চকোলেট রঙের গাড়ির দিকে যেতে গিয়ে নজরে পড়ল তিতিক্ষার লাল টুকটুকে গাড়িটার দিকে। বিবেক নাকি বলত ল্যাবেঞ্চুষের মতো চেহারা তার গাড়ির। সেই গাড়ির মধ্যে রোবটের মতো মুখ করে বসে আছে নতুন ড্রাইভার। একটু দূরেই দাঁড়িয়ে আছে নীলার্ণবের টাটা সুমো।

গার্গী হেসে বলল, যাক তোমার ড্রাইভার সমস্যা মিটেছে তা হলে?

—হ্যাঁ। বেশ পছন্দের ড্রাইভার। মুখে কোনও কথা নেই। অহেতুক কৌতূহল নেই। ভাবলেশহীন অভিব্যক্তি। অথচ গাড়ি চালানোর হাত ভালো। ড্রাইভার হওয়ার পক্ষে আদর্শ। আগের ড্রাইভারকে নিশ্চয় মনে আছে। তার মুখের দিকে তাকালেই কেমন ভয়-ভয় করত আমার।

নতুন ড্রাইভার নিয়ে তিতিক্ষা এতই উচ্ছ্বসিত দেখে তার দিকে আরও কয়েক পলক তাকায় গার্গী। সাদা প্যান্ট-শার্ট পরনে। মাথায় শেড-দেওয়া সাদা টুপি। গায়ের রং একটু ময়লাই। ঝাঁটার মতো পুরু গোঁফ। বাঁ-গালে একটা মস্ত লালচে জড়ুল। চোখে পড়ার মতো চেহারা। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। শুধু অভিব্যক্তিটাই যা নৈর্ব্যক্তিক।

তিতিক্ষা নীলার্ণবকে বলল, তোমার গাড়িকে ছেড়ে দাও। আজ আমিই তোমাকে লিফট দি।

বলতেই নীলার্ণব টাটা সুমোর ড্রাইভারকে কী বলতে সে তার বাহন ছুটিয়ে দিল একটা জার্কিং দিয়ে। লাল মারুতির দিকে এগিয়ে গিয়ে প্রথমে নীলার্ণব, তারপর তিতিক্ষা উঠে বলল, গার্গীদি, আমার খুব খারাপ লাগছে তোমার সঙ্গে ঠিক কথা বলতে পারলাম না।

পরক্ষণে তিতিক্ষা তাকায় উপরের বারান্দায়, 'ঝিমলি, ঝিমলি, গ্যারাজের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যাস', বলতেই লাল মারুতির ড্রাইভার এক পলক গার্গীর দিকে তাকিয়েই তার গাড়ি ছুটিয়ে দিল প্রবল গতিতে। গাড়ির গতি দেখে গার্গীর এক বার মনে হল, নতুন ড্রাইভার এত জোরে গাড়ি না চালালেই ভালো হত।

গ্যারাজটা তখনও খোলা দেখে গার্গী ভাবছিল ঝিমলিকে সেও ডেকে কোলাপসিবল গেটটা বন্ধ করে দিতে বলে। হঠাৎ তার নজরে পড়ে গ্যারাজের ভিতর দলা-পাকানো একটি বান্ডিল। সঙ্গে সঙ্গে রতনকে ডেকে বলে, রতন, চট করে বান্ডিলটা তুলে নাও তো গাড়িতে।

রতন তার মালকিনের হুকুম তামিল করতেই গার্গী উঠে বসল গাড়িতে, চলো--

দুপুরের ডা ডা রোদ্দুর ডিঙিয়ে গার্গী যখন অফিসে পৌঁছোতে পারল অনেকখানি অফিস গড়িয়ে গিয়েছে ডেকার্স লেনে। প্রচুর ভিজিটর তার অপেক্ষায়। বহু মিটিংও। কিন্তু তার পি এ আপাতগম্ভীর মুখে জানায় সায়ন অন্তত বারতিনেক খোঁজ করেছে তার।

সায়ন কোম্পানির চেয়ারম্যান, কিন্তু গার্গীকে সচরাচর খোঁজে না, কেন এত খোঁজাখুঁজি বুঝতে গার্গী সচকিত হয়। সত্যিই তো এই দীর্ঘক্ষণে সে একবারও সায়নকে জানায়নি তার কেন এত দেরি হচ্ছে তিতিক্ষার খোঁজ নিয়ে ফিরতে। সায়ন অবশ্য তার মোবাইলে ফোন করতে পারত, কিন্তু করেনি কোনও কারণে!

কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ভিজিটর সামলে গার্গী পি এ-কে বলল চেয়ারম্যান সাহেবকে ফোনে ধরতে, পেয়েও গেল তক্ষুনি, হ্যালো--

--কী ব্যাপার, আমি ভাবছিলাম তুমি হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে গেলে!

--আর বোলো না, তিতিক্ষাকাণ্ড যে কোনদিকে গড়াচ্ছে তা ভেবে আমি অস্থির। এক আকাশ বিস্ময় নিয়ে লক্ষ করছি তিতিক্ষাকে।

--কেন, কী হল আবার?

গার্গী সকালের ঘটনাটির একটি ব্রিফ অ্যান্ড টু দা পয়েন্ট গল্প বিবৃত করে বলল, শ্রাবণকুমার বোধহয় ওকে মুরগি করে নিজের আখের গোছাতে চাইছে।

সায়ন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তিতিক্ষা এখন সমুদ্রে বসবাস করছে, এখন সামান্য শিশিরকে ভয় করে কী আর করবে!

—ঠিকই বলেছ। ঋণসমুদ্র যে কী ভয়ংকর সমুদ্র তা তিতিক্ষাকে দেখেই বুঝতে পারছি। কথায় বলে লোকটা গলা পর্যন্ত ধারে ডুবে আছে। তিতিক্ষার মাথার চুল পর্যন্ত তো বটেই, ধারের কল্যাণে ডুবে আছে তিন মানুষ সমান ঋণের সমুদ্রে।

সায়ন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, বিবেক বোধহয় মরে গিয়ে বেঁচে গেছে। এখন বেঁচে থেকে তিতিক্ষারই সামনে দুর্ভোগ। কী বলো?

গার্গী দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, তিতিক্ষা এখন আঁকড়ে ধরেছে শ্রাবণকুমারকে। শ্রাবণকুমার ওকে যা করতে বলছে তাই করছে। কিন্তু না করেও তো উপায় নেই। ঋণের জাল যেভাবে ওকে ক্রমশ ঘিরতে চাইছে তাতে ওর দীর্ঘমেয়াদি জেল অনিবার্য। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, শ্রাবণকুমার লোকটি ঠিক কেমন তা বুঝে ওঠা যাচ্ছে না এখনও।

—তার হোটেল নিয়ে কোনও খবর নিয়েছ?

—পুলিশ জানিয়েছে তার একটা হোটেল হচ্ছে মরিশাসে, সি বিচের কাছেই।

সায়ন দার্শনিকের মতো বলল, দেন ওয়েট অ্যান্ড সি।

—অপেক্ষা করে কোনও লাভ হবে না, স্যার। তিতিক্ষার একদিকে তার হাজার উত্তমর্ণ। অন্যদিকে দুই দানব। দুজনেই হাত বাড়িয়েছে তার দিকে। একজন শ্রাবণকুমার অ্যান্ড হিজ মাস্টার্স ভয়েস নীলার্ণব কাশ্যপ। অন্যজন শেষাদ্রি হাওলাদার। শ্রাবণকুমার বা শেষাদ্রি যে-কেউ তার ঋণের একটা বড়ো অংশ শোধ করে দিতে পারে। কিন্তু তাতে এই দানবদের কারও সঙ্গে তাকে কমপ্রোমাইজ করতে হবে। নইল তিতিক্ষার পক্ষে বাঁচা অসম্ভব।

—বাট হোয়াট অ্যাবাউট বিবেক? তার খুনিরা কি ধরা পড়বে না?

গার্গী আবার দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, মনে হচ্ছে তারা হাওয়ায় উবে গেছে ম্যাজিকের মতো।

সায়নের সঙ্গে কিছুক্ষণ তিতিক্ষাচর্চা করে গার্গী মন দেয় তার নিজ কাজে। বহু মিটিং অপেক্ষা করে ছিল তার জন্য। বহু ফাইলও।

বিকেলে গার্গীর হঠাৎ মনে হল তিতিক্ষার শুটিংয়ের কী হল তার একটা হালহদিশ নেওয়া উচিত। মোবাইলে ধরতেই তিতিক্ষার খুশি-খুশি গলা, গার্গীদি, ইট ওয়াজ ওয়ান অফ দা ফাইনেস্ট এক্সপিরিয়েন্স অব মাই লাইফ। আমার শরীর যে এত সুন্দর তা এরকম বিখ্যাত ক্যামেরাম্যানের সামনে নিজেকে মেলে না ধরলে জানতেই পারতাম না। এখন আমি কোথায় জানো? নীলার্ণবকে নিয়ে যাচ্ছি চাঁদিপুর। ওখানেও নাকি সমুদ্রের বিচে একটা বিশাল হোটেল করবে শ্রাবণকুমার। তিনি ওখানেই অপেক্ষা করছেন আমার জন্য। ওখানে তিনদিন থাকব।

বলে ট্রাভেল এজেন্টদের ভাষায় কথা বলল, থ্রি নাইটস টু ডেজ।

২১

তিনরাত দুদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর আরও একদিন কেটে গেল তিতিক্ষার কোনও পাত্তা নেই দেখে গার্গী ব্যস্ত হয়ে পড়ল খুবই। সায়নকে বলছিল, কী ব্যাপার বলো তো? তিতিক্ষার মোবাইলে যতবার ফোন করছি, একই কথা বারবার বলছে, নট রিচেবল।

সায়নের অন্যমনস্ক উত্তর, হয়তো এমন কোথাও আছে যেখানে মোবাইলের টাওয়ার নেই।

তাদের কথোপকথনের মধ্যে হঠাৎ আকস্মিকভাবে ফোন এল একটা। গার্গী আশাই করেনি অলীকশেখর হঠাৎ তাকে ফোন করবেন, রিসিভার তুলতে ওদিক থেকে ভারী কণ্ঠস্বর, তুমি জানো তিতিক্ষা কোথায়?

গার্গী একটু থিতিয়ে নেয়, অলীকশেখর কেন তাকেই ফোন করছেন? বলল, আমিও তো তিতিক্ষাকে খুঁজছি গত তিনদিন ধরে। আপনাকে কিছু বলে যায়নি?

অলীকশেখরের গলা থমথমে, আমাকে আজকাল বলে যাওয়ার প্রয়োজনও মনে করে না। যখন টাকার দরকার, তখন পঞ্চাশবার ফোন করবে, আর—

গার্গী ইতস্তত করল একটু, সে যা জানে তা বললে কী প্রতিক্রিয়া হবে অলীকশেখরের বুঝে উঠতে পারল না। ধরি মাছ না ছুঁই জল গোছের উত্তর দেয়, আমাকে বলেছিল কী একটা অ্যাসাইমেন্ট পেয়েছে দূরে কোথাও। হয়তো সেখানেই।

—সঙ্গে কি নীলার্ণব নামের সেই গবেটটা গেছে?

গার্গী বুঝতে পারছে না ঠিকঠাক উত্তর দেওয়াটা কতখানি যুক্তিযুক্ত। তিতিক্ষা যখন তার বাবাকে বলে যায়নি, তারই বা কী দরকার সত্যিটা জানাতে! অলীকশেখর যা রাগী মানুষ, গার্গী যদি সত্যি কথাটা বলে কীভাবে রিঅ্যাক্ট করবেন কে জানে! বলল, আমি ঠিক পুরোপুরি জানি না কার সঙ্গে গেছে কোথায় গেছে। তবে তার পেইন্টিংএর কোনও অ্যাসাইনমেন্ট হতে পারে।

অলীকশেখর হঠাৎ বেশ ধমকের গলায় বললেন, তুমি সবই জানো, আমার কাছে চেপে যাচ্ছ।

গার্গীর মুখ লাল হয় বলার ধরনে, বলল, তিতিক্ষা আমাকেই বা সব কথা কেন বলবে?

—ঠিক আছে, বলেই ওপাশে ঠক করে রিসিভার রেখে দেওয়ার শব্দ।

গার্গী কিছুক্ষণ মোবাইল হাতে স্ট্যাচু। বিবেকের মৃত্যুতে তিতিক্ষা হঠাৎই বেশ টালমাটাল হয়ে পড়েছিল, তারপর কয়েকদিনের মধ্যে কাটিয়ে উঠেছে তার শোক।

শুধু কাটিয়েই ওঠেনি, সে ইতিমধ্যে নিজের পৃথিবী খুঁজে নিয়েছে অন্যভাবে। সায়নকে সমস্ত ঘটনাটা জানিয়ে বলল, বুঝলে, সেই থিয়োরিটাই ঠিক, পৃথিবীতে ভ্যাকুয়াম বলে কিছু থাকে না। একটি ভ্যাকুয়ামের সৃষ্টি হলে তা অন্য কোনও ভাবে পূরণ হয়ে যায়।

সেদিন অফিসে নিজের কাজে মনোনিবেশ করতে না করতে হঠাৎ ফোন এল ক্রাইম সেকশনের ইনস্পেক্টর দেবজ্যোতি নাগ রায়ের, ম্যাডাম, আমরা একটা বড়ো ব্রেকথ্রু করতে পেরেছি কাল।

গার্গী তার অফিস সংক্রান্ত বিষয়ে সাামান্য বিব্রত ছিল, সেই ঘোর কাটিয়ে বলল, কীরকম?

—তিতিক্ষা দ্বিবেদী কয়েকদিনের জন্য কোথাও গিয়েছিলেন, সেই ফুরসতে আমরা তাঁর বাড়ি আবার রেইড করি। একেবারেই গোপনে। বাড়িতে মেইড সারভেন্ট ছাড়া আর কেউ ছিল না।

গার্গী সামান্য হতবাক, তারপর?

—ভিতরের ঘরের আলমারির একটি চোরা-লকারের মধ্যে একটি ইনটারন্যাশনাল পাশপোর্ট পেয়েছি। বিবেকের নামে।

গার্গী এবার রীতিমতো উত্তেজিত, বাইরে যেত নাকি বিবেক?

—গত তিন বছরে চারবার। সবটাই ইউরোপে।

গার্গী বিস্মিত হয়ে বলে, কিন্তু বিবেক যে বাইরে যেত তা তো তিতিক্ষা একবারও বলেনি?

—ম্যাডাম, কাল গভীর রাতে মিসেস দ্বিবেদী ফিরে এসেছেন তাঁর প্রমোদভ্রমণ সেরে। আমরা আজ সকালেই মিসেস দ্বিবেদীকে ইন্টারোগেট করি। তিনি পুরোপুরি অস্বীকার করলেন ব্যাপারটা। বললেন, 'বিবেক মাঝেমধ্যে দিল্লি যাচ্ছি বলে সাতদিন দশদিনের জন্য যেত। এর বেশি আর কিছু বলতে পারব না।' তাঁকে নাকি একবারও বলেনি বিদেশে যেত কি না!

গার্গী মোবাইল হাতে কিছুক্ষণ স্থাণু। তিতিক্ষা তার শিল্প নিয়ে এতটাই বুঁদ হয়ে থাকে যে স্বামী ইউরোপে যেত কি না তাও খবর রাখত না! বলল, এও হতে পারে বিবেক পুরোটাই গোপন করেছিল তার স্ত্রীকে।

--হতে পারে। মিসেস দ্বিবেদী শুনে তো ভেঙে পড়লেন একেবারে। বললেন, আমাকে ও এত মিথ্যে কথা বলত? কী ডেঞ্জারাস!

—তা আপনারা হঠাৎ আবার রেইড করলেন কেন তাদের বাড়ি?

—খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। হঠাৎ একটি ভারী কণ্ঠস্বর ডি সি ডি ডি-কে ফোন করে বলেছিল বিবেক কেন ঘন ঘন ইন্টারন্যাশলাল ফ্লাইটে বাইরে যায় তার খোঁজ নিতে।

—কে লোকটি? তার পরিচয় বলেনি?

—না, বলেছিল আগে রেইড হোক। পরে ফোন করে নাম-পরিচয় দেবে, কিন্তু আর করেনি।

—স্ট্রেঞ্জ! পাশপোর্টটার ভ্যালিডিটি আছে এখনও?

—হ্যাঁ। আরও তিন বছর। সঙ্গে আরও একটি পাশপোর্ট পেয়েছি।

গার্গীর ভুরুতে লম্বা ভাঁজ, তিতিক্ষার?

—হ্যাঁ।

—তিতিক্ষাও বিদেশে গিয়েছিল নাকি?

—না। তাঁর পাশপোর্ট-টির মেয়াদ উত্তীর্ণ। কিন্তু কোথাও যাননি মিসেস দ্বিবেদী।

—বিবেকের পাশপোর্টে নিশ্চয় লেখা আছে কোথায় কোথায় যেত?

—হ্যাঁ, তিনবার লন্ডনে। একবার প্যারিসে।

গার্গী অবাক হয়, কী আশ্চর্য, বউ ছবি আঁকে, আর স্বামী প্যারিসে গেছে। বউকে না-বলে?

—তাই তো দেখছি। আমরা যত কেসটার গভীরে ঢুকছি, ততই নতুন নতুন তথ্য জানতে পারছি। খুব মিস্টেরিয়াস ব্যাপার।

গার্গী ভেবে নিয়ে বলল, হয়তো এও হতে পারে বিবেক তখন ঋণের হাত থেকে মুক্তি পেতে চাইছে তিতিক্ষার ছবি বিক্রি করে। স্বদেশে যদি বিক্রি না হয়, অনেক সময় বিদেশের বাজারে বিক্রি করতে চেষ্টা করে কেউ কেউ। তিতিক্ষার ছবি কোনও ভাবে বিদেশে বিক্রি করা যায় কি না হয়তো তারই খোঁজখবর নিতে গিয়েছিল। কিংবা তিতিক্ষার কোনও প্রদর্শনী সে দেশে করা যায় কি না তাও খতিয়ে দেখা উদ্দেশ্য ছিল তার।

দেবজ্যোতি নাগ রায় ছোট্ট করে বললেন, হয়তো। সবই 'হয়তো', ম্যাডাম। এখন বিবেক দ্বিবেদীর মৃত্যুর পর সবই 'হয়তো' ভাবতে হবে।

—ঠিক আছে, মি. নাগ রায়। তা হলে এখন আমাদের অন্যতম কাজ হবে খবর নেওয়া বিবেক দ্বিবেদী কেন ঘন ঘন বিদেশে যেতেন।

—আমরা সেই চেষ্টাই করছি, ম্যাডাম।

গার্গী নিজেও ব্যস্ত হয়ে পড়ল খবরটা নিয়ে। তিতিক্ষা একেবারে কিছুই জানে না শুনে একটু বিস্মিতই হচ্ছিল। না কি সে জানত, এখন বিপদে পড়ে চেপে যেতে চাইছে ঘটনাটা! গার্গী অনুমান করতে পারে তিতিক্ষার সমস্যাটা। এতদিন ব্যবসা নিয়ে যা কিছু ভাবনা সবই ভাবত বিবেক। তিতিক্ষা ব্যস্ত থাকত তার ছবি-আঁকা নিয়ে। তিতিক্ষা ভাবতেই পারেনি বিবেক ক্রমশ জড়িয়ে পড়ছে নানা ঝামেলায়।

যখন বুঝতে পারল তখন অনেকটাই দেরি হয়ে গেছে। চারদিক থেকে লোন নিয়েও বাঁচাতে পারেনি বিবেককে। এখন তার সামনে শুধুই নানা রকমের হাঁ-মুখ।

তিতিক্ষা ফিরে এসেছে জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ তাকে ফোনে ধরল গার্গী, হ্যালো, কবে ফিরলে চাঁদিপুর থেকে?

—কাল রাতে, গার্গীদি। কী আশ্চর্য, ফিরে এসে তোমাকে ফোন করব ভাবছি, হঠাৎ কাকতালীয়ভাবে তোমার ফোন।

—কেন, খুঁজছিলে কেন?

—গার্গীদি, নতুন সিরিজের যে-ছবিগুলো এঁকেছি, সেগুলো নিয়ে একটা প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে শ্রাবণকুমার। কাল তার উদ্বোধন।

গার্গী কিছুটা অবাক, কোথায় উদ্বোধন?

—একটা নতুন গ্যালারি হয়েছে শেক্সপীয়ার সরণিতে। ঠিক কোন জায়গাটায় বলি। ক্যামাক স্ট্রিট আর শেক্সপীয়ার সরণির জংশনে একটা বড়ো মাল্টিস্টোরিড হয়েছে তার নাম 'বিয়োন্ড দি স্কাই'। তার ফিফ্‌থ ফ্লোরে গ্যালারিটা, গ্যালারির নাম, 'গ্যালারি উইথ থ্রিল্‌স'। তাতে আমার সতেরোটা ছবি থাকবে। কাল বিকেলে ঠিক পাঁচটায় উদ্বোধন। তুমি শুনলে একটু অবাক হবে, উদ্বোধন করতে আসছেন একজন সেন্ট্রাল মিনিস্টার। তোমার আসা চাইই।

এতগুলো তথ্য হুড়হুড় করে বলে ফেলায় সবই গুলিয়ে যাচ্ছিল গার্গীর। তবু বিষয়টা একবার মনে মনে গুছিয়ে নিয়ে বলল, ঠিক আছে, যাব।

—রাখছি, গার্গীদি, তিতিক্ষা ফোন রেখে দিল ঝটিতি কায়দায়, বোধহয় ব্যস্ত হয়ে পড়ল তার অন্য বন্ধুবান্ধবদের ফোনে আমন্ত্রণ জানাতে।

গার্গী বিস্মিত হচ্ছিল এই ভেবে যে, তিতিক্ষার জীবনে আমূল পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে গত কয়েকদিনে। আর তার সঙ্গে কত সহজে নিজেকে শামিল করতে পেরেছে।

গার্গী খুব কৌতূহলী ছিল তিতিক্ষার প্রদর্শনী দেখার জন্য। যে দুটি ছবি সে দেখেছে তিতিক্ষাকে আঁকতে তা যথেষ্ট উত্তেজক। তার এই সতেরোটি ছবির প্রদর্শনী কীরকম বিস্ফোরণ ঘটাবে তা দেখতে যেতেই হবে তাকে।

পরদিন সকালে সব কাগজেই বেশ বড়ো করে বিজ্ঞাপন তিতিক্ষা দ্বিবেদীর প্রদর্শনীর। তার ক্যাপশন, 'সাম ইরোটিক মোমেন্টস্‌'। বিজ্ঞাপনের সঙ্গে সাদা-কালোয় শেড দেওয়া একটি ন্যুড ছবিও। তাতেই আকর্ষণ বেড়েছে প্রদর্শনীটির।

ঠিক চারটে পঞ্চান্নয় 'গ্যালারি উইথ থ্রিল'এ পৌঁছে গেল গার্গী। সঙ্গে সোনালিচাঁপাকে নিয়েছে আজ। বেচারি কালকেই বলছিল, 'দিদি, কী হল সেই পেইন্টারের?' তখন তাকে বলেছিল, 'ঠিক আছে, তার প্রদর্শনী দেখতে নিয়ে যাব তোকে। পেইন্টারের শেষতম আঁকাআঁকির নিদর্শন দেখানো হচ্ছে একটি নতুন

গ্যালারিতে।' দুজনে পৌঁছে দেখল বেশ জমায়েত হয়েছে গ্যালারিটির পাশাপাশি দুটি বিশাল আকারের ঘরে। তিতিক্ষার প্রদর্শনীতে তিতিক্ষার শরীরের দিকেই তাকিয়ে দেখতে হয় কিছুক্ষণ। একেই তো ডানাকাটা পরি, তার উপর তার পরনে একটি সাদা ধবধবে গাউন যার গলায়, কোমরে নানা কারুকাজ করা। তার উপর তার মুখে সারাক্ষণ উড়ে বেড়াচ্ছে লক্ষ টাকার হাসি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যাঁর উদ্বোধন করতে আসার কথা, তার নাম কখনও শোনেনি গার্গী। হয়তো কোনও স্টেট মিনিস্টার হবেন। আয়োজকদের ধারণা প্রদর্শনীর স্ট্যাটাস বাড়াতে একজন মন্ত্রীটন্ত্রী হলে ভালো হয়। যাই হোক, শেষপর্যন্ত তিনি এসে না পৌঁছোলেও একজন বর্ষীয়ান শিল্পীই ঘটা করে কাটলেন লাল ফিতেটি। উদ্বোধনের পরে অন্যদের অনুমতি হল প্রদর্শনী দেখার।

গ্যালারিতে ঢোকার মুখেই বিশাল এক ক্যাপশন যাতে লেখা, সাম ইরোটিক মোমেন্টস্। ভিতরের দেওয়ালে একের পর এক ন্যুড ছবি। কয়েকটি প্রায় দেওয়াল জোড়া। এতগুলি ন্যুড ছবি একসঙ্গে দেখতে গিয়ে গার্গীর শরীরে কেমন এক ধরনের অনুভূতি। তার চোখদুটো বারবার আটকে যাচ্ছিল ন্যুড মেয়েটির মুখের দিকে। এই সমস্ত ছবির মডেল তিতিক্ষা নিজেই তা গার্গী জানে বলে তার মনে হচ্ছিল তিতিক্ষাই নানা ভঙ্গিতে পোজ দিয়েছে ছবি আঁকার মুহূর্তে। তিতিক্ষা খুব চেষ্টা করেছে যাতে বদলে যায় মুখের আদল, কিন্তু ছবির মুখগুলো ভালো করে মিলিয়ে দেখলে কখনও তাকে চেনাও যাচ্ছিল । গার্গীর এও মনে হচ্ছিল হয়তো ইচ্ছে করেই কোনও কোনও ছবিতে নিজের মুখটা মিলিয়ে দিয়েছে ছবির মুখের সঙ্গে যাতে আকর্ষণ বাড়ে প্রদর্শনীর।

গার্গী অনুমান করছিল সোনালিচাঁপার অবস্থা তার চেয়েও খারাপ। ছবিগুলো খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে বারবার তাকাচ্ছিল গার্গীর মুখের দিকে। একবার ফিসফিস করে বললও, কী করে এ সব ছবি এঁকেছে, দিদি?

গার্গীও ফিসফিস করে, আর্টিস্টরা ন্যুড আঁকতে পছন্দ করে, তাই।

—কিন্তু মেয়েরা এ সব কী করে আঁকে?

গার্গী সে কথাও না ভেবেছে তা নয়, বলল, মেয়েরা মেয়েদের শরীর সবচেয়ে ভালো চেনে বলেই বোধহয় তাদের আঁকতেও সুবিধে হয়।

সেদিন প্রদর্শনীতে আরও ঘটনা ঘটল যা খুবই চিন্তায় ফেলল গার্গীকে।

প্রদর্শনী দেখতে আসা অন্য দর্শকরা সাধু সাধু করে উৎসাহ দিচ্ছে তিতিক্ষাকে। ভিড়ের মধ্যে থেকে একসময় গার্গী আর সোনালিচাঁপার কাছেও এল তিতিক্ষা, হাসি উপচিয়ে জিজ্ঞাসা করে, কেমন দেখছ গার্গীদি?

—বেশ এঁকেছ। যেমন বলতে হয় তেমনই বলল গার্গী।

২২

প্রদর্শনীতে শ্রাবণকুমারের উপস্থিতিই সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ছিল আজ। ঘন কালো রঙের খুব দামি একটা শেরওয়ানি পরে ঘোরাঘুরি করছেন ব্যস্ত হয়ে। তাঁর হাতে একগুচ্ছ ব্রোসিওর যা আজকের অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রকাশিত। ব্রোসিওরটিতে তিতিক্ষার আঁকা ন্যুড সিরিজের কয়েকটি চোখ-ধাঁধানো ছবির সঙ্গে তিতিক্ষার নিজের ফটোও দুটি। এই ফটোদুটিতে তিতিক্ষাকে আরও বেশি সেক্সি হিসেবে প্রোজেক্ট করা হয়েছে তা ব্রোসিওরের গেট-আপ ও ডিজাইন দেখে প্রতীয়মান। ফটোদুটি দেখে গার্গী অনুমান করছিল সম্প্রতি তিতিক্ষাব যে-ফটোসেশন করেছেন শ্রাবণকুমার তারই দুটি পোজের ছবি।

গার্গী বুঝে উঠতে চাইছিল শ্রাবণকুমার তিতিক্ষাকে নিয়ে ঠিক কী করতে চান।

প্রদর্শনীতে ছবি দেখার ফাঁকে কয়েকটি পেইন্টিঙে কী যেন লক্ষ করে সোনালিচাঁপা ফিসফিস করে, এই চিহ্নটি কেন, দিদি?

বেশ কয়েকটি ছবির কোণে লাল টিপ পরানো যার অর্থ এই ছবিগুলি ইতিমধ্যেই বিক্রীত। গার্গীর কাছে জেনে সোনালিচাঁপার তথ্যভাণ্ডার চমৎকৃত।

—তা হলে তো অনেক ছবিই বিক্রি হয়ে গেছে এর মধ্যে! প্রদর্শনী শুরু না-হতেই কত ছবি বিক্রি হল তা জানতে কৌতূহলী হয় সোনালিচাঁপা। কিন্তু গুনতে গুনতে প্রদর্শনী উজাড়। এক নিমেষে গুনে এসে আবার গার্গীর কানের কাছে ফিসফিস, ও দিদি, এ তো প্রায় সব ছবিই বিক্রি হয়ে গেছে এর মধ্যে!

—তাই নাকি? গার্গীর কাছেও তথ্যটি বিস্ময়কর মনে হচ্ছিল।

—মাত্র তিনটে ছবি এখনও বিক্রি হতে বাকি।

—সাংঘাতিক ব্যাপার! তিতিক্ষার ছবি তা হলে ঝালমুড়ির মতো বিক্রি হচ্ছে?

—ঝালমুড়ি বলে উড়িয়ে দিলে হবে না, দিদি। যে-তিনটি ছবি এখনও বিক্রি হয়নি তাদের দাম কত লেখা রয়েছে জানো? একটা তিন লক্ষ, একটা সাড়ে তিন, আর সবচেয়ে বড়োটা পাঁচ লক্ষ।

গার্গী কিছুক্ষণ স্তম্ভিত তিতিক্ষার এলেম জানতে পেরে। এক-একটি ছবি কী দ্রুত এঁকে ফেলছিল তিতিক্ষা তা সেদিন নিজের চোখেই দেখে এসেছে তার বাড়িতে গিয়ে। তার অর্থ কী দ্রুত তিতিক্ষার রোজগার বাড়ছে ছবির বাজার পেয়ে যেতে। আর্টিস্টদের নাকি এখন এমনই রমরমা।

—তা হলে বাকি যে-চোদ্দটি ছবি এর মধ্যেই বিক্রি হয়ে গেছে তাতে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট লক্ষ রোজগার হয়ে গেছে, কী বল?

সোনালিচাঁপা রীতিমতো হাঁ হয়ে গেছে প্রদর্শনীতে এসে।

তিতিক্ষা আজ খুবই ব্যস্ত বিভিন্ন শিল্পরসিকদের কাছে তার ছবির পশরা মেলে ধরতে। ব্যস্ত শিল্পসমালোচক ও বিখ্যাত শিল্পীদের আপ্যায়নেও।

ভিড়ের মধ্যে নীলার্ণবকে দেখছে গার্গী সারাক্ষণ তিতিক্ষার সঙ্গে লেপটে থাকতে। তিতিক্ষা কখন কী বলে সেই অপেক্ষায় ঘুরঘুর করছে তিতিক্ষার আশেপাশে।

শ্রাবণকুমারের একসময় চোখে পড়ল গার্গী আর সোনালিচাঁপাকে, কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, কেমন দেখছেন, ম্যাডাম?

—নাইস, গার্গী যেমন বলতে হয় বলল শ্রাবণকুমারকে। পরক্ষণে জিজ্ঞাসা করল, শুনেছিলাম এই ছবিগুলো আপনার হোটেলে টাঙানো হবে?

—তাই তো হবে, শ্রাবণকুমার আশ্বাস দেন।

গার্গীর মগজে বিষয়টি ঢোকে না এই মুহূর্তে। যদি হোটেলে টাঙানোই হবে, তা হলে প্রদর্শনীর আয়োজন করে ছবিগুলি বিক্রি করে দেওয়ার কথা ভাবা হল কেন?

বিষয়টি মাথার ভিতর ঝুলিয়ে রেখে গার্গী দেখছিল উপস্থিত দর্শকদের প্রতিক্রিয়া। বোধহয় ন্যুড পেইন্টিঙের প্রদর্শনী বলেই বেশ ভিড় হয়েছে আজ। হঠাৎ গার্গীর নজরে পড়ে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি মুখে একজন বেঁটে চেহারার স্যুটেড-বুটেড মাঝবয়সী ভদ্রলোক হঠাৎ তিতিক্ষার কাছাকাছি শুরু করলেন ঘুরঘুর করতে। দু-তিনবার তাকে কী জিজ্ঞাসাও করলেন, কিন্তু তাকে তেমন গুরুত্ব দিতে চাইল না তিতিক্ষা।

ভদ্রলোক অবশ্য তাতেও নিবৃত্ত না হয়ে আবার কী যেন জিজ্ঞাসা করলেন তিতিক্ষাকে। তিতিক্ষা ঘাড় নেড়ে না বলতে তিনি খুবই বিসদৃশভাবে তিতিক্ষার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলার চেষ্টা করলেন কিছু।

নীলার্ণব বিরক্ত হচ্ছিল ভদ্রালোকের নাছোড়বান্দা গতিবিধি দেখে। হঠাৎ ভদ্রলোককে উদ্দেশ করে কিছু বলতেই ভদ্রলোক মুখ খিঁচিয়ে কিছু একটা বললেন নীলার্ণবকে। অতঃপর যা হয়ে থাকে, নীলার্ণবের সঙ্গে একপ্রস্থ কথা-কাটাকাটি শুরু হতেই অনেকেরই নজর পড়ল দৃশ্যটার দিকে। তিতিক্ষা ছুটে এসে নীলার্ণবকে কিছু বলে আপাতত সুরাহা করল কলহের।

শ্রাবণকুমার দূর থেকে দেখছিলেন ঘটনাটা। তাঁর অভিব্যক্তিতে ফুটে উঠছিল ক্রূর ভঙ্গিমা। প্রদর্শনীর মধ্যেই এক অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটে যেতে অনেকেরই অস্বস্তি। খুব দ্রত বিষয়টি চাপা পড়ে গেলেও গার্গীর কাছে ঘটনাটি মনে হচ্ছিল বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

তিতিক্ষার আশেপাশে ঘুরতে থাকা নীলার্ণবকে ডেকে শ্রাবণকুমার কী যেন বলতে সে মুহূর্তে উধাও হল প্রদর্শনী থেকে। নিশ্চয় কিছু একটা আনার হুকুম

দিয়েছেন শ্রাবণকুমার। বিষয়টি খেয়াল করেনি তিতিক্ষা, একটু পরেই সে তাকেই খুঁজতে শুরু করল কী কারণে যেন। গার্গীর কাছে এসেও জানতে চাইল, গার্গীদি, নীলার্ণবকে দেখেছ তুমি?

গার্গী মাথা ঝাঁকায়, বোধহয় বাইরে গেছে কোনও কারণে।

তিতিক্ষা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেছে ঘটনাটিতে, বলল, খুব মুশকিল হয়ে গেল, গার্গীদি।

গার্গী বোঝার চেষ্টা করছিল কী ঠিক ঘটে গেল চকিতে। স্যুটেড-বুটেড ভদ্রলোকটিই বা কে? সে কী বলার চেষ্টা করছিল তিতিক্ষাকে।

তিতিক্ষা একান্তে ডেকে নিয়ে গেল গার্গীকে, গার্গীদি, এই লোকটিই হল শেষাদ্রি হাওলাদার।

—ও, বিষয়টা এতক্ষণে কিছুটা স্পষ্ট গার্গীর কাছে।

—খুব জ্বালাচ্ছে, গার্গীদি। প্রতিদিন আট-দশটা করে ফোন করছে মোবাইলে। বাধ্য হয়ে পুরোনো মোবাইলটা বাতিল করে নতুন মোবাইল কিনেছি আজ।

ব্যাগ থেকে একটি চিরকুট বার করে গার্গীর হাতে দিয়ে বলল, নতুন মোবাইলের নম্বর। পরে নম্বরটা ঢুকিয়ে নিয়ো তোমার মোবাইলে।

বিস্মিত গার্গী চিরকুটটি দ্রুত চালান করে নিল তার ব্যাগের ভিতর।

যে-কৌতূহলটি এতক্ষণ উসকোচ্ছিল গার্গীকে, ছবি বিক্রির সেই রহস্যটি জানতে চাইল তিতিক্ষার কাছে। এত দ্রুত এত দামে তার ছবি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে এ তো প্রায় মির‍্যাকল!

তিতিক্ষা লজ্জা-লজ্জা মুখে জানায়, গার্গীদি, বিক্রির ব্যাপারটা সত্যিই এক জটিল রহস্য। সত্যি বলতে কি একটি ছবিও বিক্রি হয়নি এখনও। অথবা বলতে পারো সব ছবিই বিক্রি হয়ে গেছে প্রদর্শনী শুরু হওয়ার আগেই।

—তার মানে?

—আসলে এটাও ছবি বিক্রির একটা স্ট্রাটেজি। শ্রাবণকুমার নিজেই সব ছবি কিনে নিয়েছেন প্রদর্শনী শুরু হওয়ার আগে। তিনটে ছবি বিক্রি হয়নি বলে ঘোষণা করা আছে যাতে কোনও ক্রেতা ইচ্ছে করলে এই দামে কিনতে পারেন আমার ছবি। তাতে আমার ছবির যে এত দাম তা প্রচারিত হয়ে যাবে ক্রেতাদের মধ্যে। তিনটে ছবি যদি বিক্রি হয়ে যায়ও তাতে আমার লাভ। শ্রাবণকুমারের জন্য আমি আবার তিনটে ছবি এঁকে দেব। তা ছাড়া—

তিতিক্ষা গলা নিচু করে বলল, গার্গীদি, এই প্রদর্শনীর আরও একটি উদ্দেশ্য আছে।

গার্গী উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করে তিতিক্ষার কথা বুঝতে।

—গার্গীদি, শ্রাবণকুমার এত খরচ করে এই প্রদর্শনী করলেন তাঁর হোটেলের প্রচারের জন্যও বটে। প্রদর্শনীর পর সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন বেরোবে তিতিক্ষা দ্বিবেদীর এই সিরিজের ছবিগুলি টাঙানো থাকবে তাঁর মরিশাস আর লাক্ষাদ্বীপের বিলাসবহুল হোটেলগুলিতে। বিজ্ঞাপনে আরও লেখা থাকবে তিতিক্ষা দ্বিবেদী আরও আরও সব ছবি আঁকছেন যাব একমাত্র স্বত্বাধিকারী শ্রাবণকুমার। তাঁর হোটেলে এমন হাজার বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে ট্যুরিস্টদের জন্য।

তিতিক্ষা কথা শেষ করেই ছুটল গেটের দিকে কেন না তখন সেখানে এক বিখ্যাত শিল্পীর আবির্ভাব। গার্গী শুনতে পেল, যোগেশদা, আপনি না এলে আমার একজিবিশন বৃথা যেত আজ।

কিন্তু যোগেশ চৌধুরিকে নিয়ে তিতিক্ষার ব্যস্ত থাকার উপায় রইল না, ততক্ষণে শেষাদ্রি হাওলাদার তিতিক্ষাকে বলছেন, কী হল, তুমি আমার কথার উত্তরই দিতে চাইছ না কেন?

তিতিক্ষা ক্ষুব্ধ, বিব্রত, বলল, প্লিজ, শেষাদ্রিদা, আপনি পরে আসবেন, পরে কথা বলব।

—পরে কেন? পরে কেন? আজ এখনই আমার কথার উত্তর দিতে হবে।

তিতিক্ষাকে স্তম্ভিত দেখায়, বলে, একজিবিশনে ছবি সম্পর্কে আপনার যাবতীয় কোয়ারির উত্তর দিতে পারি। কিন্তু নট অ্যাবাউট পারসোনাল ম্যাটার্স।

—হোয়াই নট? শেষাদ্রি হাওলাদার প্রায় গর্জে উঠলেন, বোঝাই যাচ্ছে তিনি আজ একটা হেস্তনেস্ত করতে এসেছেন তিতিক্ষার প্রদর্শনীর দিনটি বেছে নিয়ে।

শ্রাবণকুমার এগিয়ে এসে বললেন, মি. হাওলাদার, আপনি কাল সকালে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। তখন আপনার সঙ্গে কথা হবে।

—হু আর ইউ? শেষাদ্রি হাওলাদার চিৎকার করে উঠলেন যাতে তাঁর গলা শোনা যায় গোটা প্রদর্শনীর লোকজনের কাছে। বললেন, শি ইজ অ্যা লায়ার। আমি আজই কিছু একটা রিপ্লাই চাই।

হৈচৈ চেঁচামেচি হয়তো আরও চরমে উঠত যদি না কেউ বলে উঠত, পুলিশ এসেছে, পুলিশ।

পুলিশের আগমন সংবাদে বেশ ত্রস্ত হয়ে উঠল প্রদর্শনীর দর্শককুল। গেটের বাইরে পুলিশের গাড়ি থামার শব্দ শুনে সবাই ফিরে যাওয়ার চেষ্টায় ব্যস্ত, সেই ফুরসতে গার্গী খেয়াল করল শেষাদ্রি হাওলাদার প্রদর্শনীকক্ষ থেকে অদৃশ্য।

নীলার্ণব কাশ্যপকে দেখা গেল পুলিশবাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসতে তিতিক্ষার দিকে। একজন পুলিশ অফিসার, চারজন কনস্টেবল। লম্বা, আধময়লা গায়ের রং, উর্দি-পরা অফিসারটির নাম রামশরণ মিশ্র। নিজের পরিচয় দিয়ে তিনি

শ্রাবণকুমারের সঙ্গে কী যেন কথা বলতে শুরু করলেন। একটু পরেই শ্রাবণকুমার একটা প্যাডের কাগজ বার করে তার উপর কিছু লিখতে শুরু করলেন খসখস করে। পুলিশ দেখে তিতিক্ষা অতীব বিব্রত! নীলার্ণবকে হিস হিস করে বলল, পুলিশ ডাকতে গেলে কেন?

নীলার্ণব অবাক হয়ে বলল, শ্রাবণকুমারই তো পাঠালেন থানায়।

তিতিক্ষা তখন বিপন্ন চোখে তাকাচ্ছে গার্গীর দিকে। তিতিক্ষার উদ্বেগ দেখে গার্গী বুঝে ফেলে যায় পুলিশকে এখন তার নিদারুণ ভয়। কত-কতজনের কাছে ঋণ রয়েছে তার, এখন তাদের কেউ মামলা ঠুকে দিলে তার অস্তিত্ব নিয়েই টানাটানি।

নীলার্ণব তখন জানতে পেরেছে শেষাদ্রি হাওলাদার পালিয়েছেন পুলিশ দেখে। সেও দৌড়োল প্রদর্শনীকক্ষের বাইরে যদি শেষাদ্রিকে ধরা যায় এখনও। হঠাৎ পুলিশ অফিসারকে ফেলে নীলার্ণবের পিছনে ছুটে বেরিয়ে গেলেন শ্রাবণকুমারও। পরক্ষণে দুটো শব্দ শোনা গেল প্রদর্শনীকক্ষের বাইরে। গার্গীর মনে খটকা লাগল শব্দদুটোর মাহাত্ম্য উপলব্ধি করে। গুলির শব্দ নাকি!

আগত পুলিশ অফিসারটিও খেয়াল করলেন শব্দদুটো। তাঁর সঙ্গে যারা এসেছে তাদের একজন কনস্টেবলকে ডেকে বললেন, চলুন তো, দেখি কী হয়েছে?

তাঁর সঙ্গে আসা জনা চারেক কনস্টেবল তখন হাঁ করে প্রদর্শনীর ন্যুড পেইন্টিং দেখতে ব্যস্ত।

পরক্ষণে বাইরে শোনা গেল প্রবল হইচই। অনেকগুলি গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে। তার মধ্যেই দেখা গেল নীলার্ণব মুখ থুবড়ে পড়ে আছে মাটিতে। সারা শরীরে রক্ত মাখামাখি। তার পিঠের কাছে গুলি লেগেছে, এক গুলিতেই—

কিন্তু গুলি লেগেছে সম্ভবত আরও একজনের গায়ে। একটু দূরেই আর একটি রক্তের রেখা মিলিয়ে গেছে হঠাৎ। অপেক্ষমান গাড়ির একজন ড্রাইভার বলল, লোকটার পায়ে গুলি লেগেছে। গুলি লাগার পরেও খোঁড়াতে খোঁড়াতে একটা গাড়িতে উঠে পালিয়ে গেছে। গাড়িটা কালো রঙের।

২৩

ক্যামাক স্ট্রিট আর শেক্সপীয়ার সরণির জংশনে এক বিশাল মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং 'বিয়োন্ড দি স্কাই'য়ের ফিফ্‌থ ফ্লোরে গ্যালারিটা, তার ব্যালকনি দিয়ে ঝুঁকে নীচে তাকাতেই হাড়হিম করা সেই দৃশ্য। সন্ধের সামান্য আলোয় সেই অট্টালিকার সামনে তখন রক্তের বন্যা বইছে নীলার্ণবের শরীর থেকে। কী যে ঘটে গেল মুহূর্তের মধ্যে তা যে কারও চিন্তার বাইরে।

তিতিক্ষার প্রদর্শনী শুরু হয়েছে যে নতুন গ্যালারিটিতে তার নাম 'গ্যালারি উইথ থ্রিল'। সেই প্রদর্শনীর উদ্বোধনী দিনে যে ভয়ংকর কাণ্ডটি ঘটে গেল তাতে থ্রিল তো বটেই, উপস্থিত সবাইকার শরীর হিম হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে। কয়েক সেকেন্ড গার্গীর হৃৎপিণ্ডও ভুলে গেল নড়াচড়া করতে।

সোনালিচাঁপার মুখটা ভয়ে বিষবর্ণ।

কয়েক সেকেন্ড গোটা গ্যালারির মানুষ স্তব্ধ থাকার পর হঠাৎ নড়ে উঠল সিনেমার ফ্রিজশট যেমন নড়ে ওঠে।

পুলিশ অফিসার রামশরণ মিশ্র ও তাঁর সঙ্গে আসা কনস্টেবলরা কেউ লিফটে, কেউ সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করলেন দুদ্দাড় শব্দে। তার পিছনে আরও বহু মানুষ।

প্রদর্শনীকক্ষের ভিড় ততক্ষণে অনেকটাই হালকা। তিতিক্ষাও ঝুঁকে পড়ে দেখল দৃশ্যটা। তার সুন্দর মুখে ফুটে উঠল একই সঙ্গে অবিশ্বাস ও আতঙ্ক। পরক্ষণে বিকট একটা চিৎকার বেরোল তার বিবর্ণ মুখ থেকে। তারপর কেমন ফ্রিজ হয়ে গেল তার অভিব্যক্তি।

গার্গী তার শরীরটা ঝাঁকিয়ে বলল, তিতিক্ষা, নিজেকে ঠিক রাখো।

তিতিক্ষা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল হঠাৎ, গার্গীদি, নীলার্ণব অমন করে পড়ে আছে কেন! এত রক্ত কেন! ও বেঁচে আছে তো?

গার্গীও জানে না নীলার্ণবের অবস্থা কী! সম্ভবত পেটে বা বুকের কোথাও গুলি লেগেছে। তার শরীরটা সংজ্ঞাহীন, না কি প্রাণহীন তা বোঝা যাচ্ছে না উপর থেকে। বলল, নীচে না গেলে বোঝা যাচ্ছে না এখনও।

সোনালিচাঁপা বলল, চলো, নীচে যাই, দিদি।

গার্গীও যেতে চাইছে এখনই, তবু সোনালিচাঁপাকে বলল, তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই, স্টাম্পিড হওয়ার সম্ভাবনা আছে। চল, আমরা লিফটে নামি। এক ব্যাচ নিয়ে গেছে। বোতাম পুশ করেছি। একটু পরেই লিফট আসবে।

তিতিক্ষাও নড়ে উঠল, গার্গীদি, আমাকে একটু ধরবে? আমার গা মাথা সব টলছে।

গার্গী তার হাত ধরতেই এসে গেল লিফট। তাদের সঙ্গে আরও কয়েকজন লিফটে উঠতেই স্বয়ংক্রিয় লিফট চালু হয়ে নীচের দিকে।

কম্পাউন্ডে নেমে গার্গীরা দেখল বেশ ভিড় জমে গেছে নীলার্ণবের শরীরের চারপাশে, তার সামনেই হতভম্ব দাঁড়িয়ে শ্রাবণকুমার, বিস্ফারিত চোখে দেখছেন কাঠ হয়ে পড়ে থাকা নীলার্ণবকে।

ওদিকে একজন কনস্টেবল চেঁচাচ্ছে, হঠ যাও। হঠ যাও।

কনস্টেবলটি বাঙালিই মনে হল তবু বোধহয় তার ধারণা হিন্দিতে 'হঠ যাও' বললেই দ্রুত ফাঁকা হয়ে যাবে জায়গাটা। এও হতে পারে প্রদর্শনীর জায়গাটা মিক্সড এরিয়া বলেই হিন্দির ব্যবহার।

পুলিশ অফিসার মিশ্র নিজেই চিৎকার চেঁচামেচি করতে অনেকটা জায়গা বেরোল নীলার্ণবের চারপাশে। গার্গী এতক্ষণে দেখার সুযোগ পেল ভয়ংকর দৃশ্যটা। এক মুহূর্ত দেখেই তার স্থির ধারণা হল নীলার্ণব বেঁচে নেই আর। সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের ভিতরটাও কেমন ফাঁকা, শরীরে অস্থিরতা। এই তো একটু আগেই নীলার্ণব তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে এসেছিল প্রদর্শনীকক্ষে, এর মধ্যেই—

পরক্ষণেই রামশরণ মিশ্রর ভারী গলা শোনা গেল, প্লিজ, এখন কেউ কম্পাউন্ড ছেড়ে যাবেন না। আমরা বিষয়টা একটু আলোচনা করে তারপর আপনাদের জবানবন্দি নেব।

পুলিশে ছুঁলে ছত্রিশ ঘা প্রবচনটি মেনে ইতিমধে বেশ কয়েকজন গা ঢাকা দিয়েছেন এই হইহট্টগোলের মধ্যে।

হঠাৎ কী খেয়াল হল শ্রাবণকুমারের, চেঁচিয়ে হিন্দিতে বললেন, হায় হায়, উপর কেয়া খালি হ্যায়! অ্যাই নবীন, নবীন, জলদি জলদি উপর যা। খাড়া রহো তসবিরকে পাস।

পুলিশ অফিসারও ঝুঁকে পড়ে দেখছিলেন উপুড় হয়ে শুয়ে থাকা রক্তাক্ত নীলার্ণবকে। নিথর, নিস্পন্দ শরীর, প্রাণের কোনও চিহ্নমাত্র নেই, তবু হঠাৎ গলা উঁচু করে বললেন, কেউ ডাক্তার আছেন এখানে?

তাঁর কথায় কিছুক্ষণ স্তব্ধতা, উপস্থিত জনতা তাকলেন একে অপরের দিকে, পরক্ষণে রোগামতো চশমা-চোখে এক ভদ্রলোক বললেন, আমি একবার দেখতে পারি?

কাছে গিয়ে নীলার্ণবের হাতের কব্জিতে আঙুল রেখে কী যেন অনুভব করলেন কয়েক মুহূর্ত, একবার চোখ বুজলেন, তারপর বললেন, আমি ডা. অমলেশ দে, একটি প্রাইভেট হাসপাতালের সঙ্গে অ্যাটাচ্ড। আই অ্যাম সরি টু সে—ভদ্রলোক আর বেঁচে নেই। তবু ইচ্ছে করলে আপনারা ওঁকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারেন।

শ্রাবণকুমার স্তম্ভিত হয়ে তাকালেন ডাক্তার দে বলে যিনি পরিচয় দিলেন তাঁর মুখের দিকে, তারপর বললেন, ইউ মিন ডেড। ইমপশিবল।

ডাক্তার যাই বলুন, শ্রাবণকুমার কিছুক্ষণ চোখ শূন্য করে তাকলেন নীলার্ণবের শরীরটার দিকে, হিন্দিতে বললেন, নীলার্ণব ডেড তাই আমাকে মানতে হবে! কী

সর্বনাশ! আমি এখনই ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি। আমার রাইট হ্যান্ড এভাবে বেঘোরে মারা যাবে তা চোখের সামনে দেখব কী করে?

তাঁর নির্দেশে একজন পুরু গোঁফঅলা যুবক তাকে তুলতে যাচ্ছিলেন পাঁজাকোলা করে, কিন্তু পুলিশ অফিসারটি কী দেখে থামালেন তাকে, দেখি দেখি, ওটা কি একটা রিভলবার!

এতক্ষণ কারও নজরে পড়েনি নীলার্ণবের শরীরের নীচে চাপা একটি রিভলবার। গার্গীও ঝুঁকে পড়ে দেখল রিভলবারটি, বলল, কী আশ্চর্য! এর থেকে কি গুলি ছোঁড়া হয়েছে, মি. মিশ্র?

পুলিশ অফিসার রামশরণ মিশ্র নিচু হয়ে দেখছিলেন পিস্তলটি। গুলি ছোড়া হলে যে বিশেষ দাগটি দেখা যায় রিভলবারের নলে, তা লক্ষ করে বললেন, 'হুঁ, মনে হচ্ছে গুলি ছোড়া হয়েছে এর থেকে।' পরক্ষণে পকেট থেকে একটি রুমাল বার করে তা দিয়ে তুলে নিলেন আগ্নেয়াস্ত্রটি।

রিভলভারটি থেকে গুলি ছোড়া হয়েছে জেনে গার্গীর ভুরুতে অমনি কোঁচ। নীলার্ণবের শরীরের নীচে যখন রিভলবারটি চাপা পড়েছে ওটা তারই ধরে নিতে হবে। অতএব বিষয়টি মাত্রা পেয়ে গেল অন্যভাবে।

একটু পরেই ধরাধারি করে নীলার্ণবকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলেন শ্রাবণকুমার। তখন শ্রারণকুমারকে বিধ্বস্তই দেখাচ্ছিল বেশ। একটু দূরে তিতিক্ষা দাঁড়িয়ে আছে স্থাণুবৎ।

সোনালিচাঁপা ফিসফিস করে বলল, গার্গীদি, দুটো গুলির শব্দ শোনা গেছে উপর থেকে।

গার্গী ঘাড় নাড়ে তার কথায়। সে এর মধ্যে চোখ চালিয়ে দেখে নিয়েছে কীভাবে দুটির গুলির ব্যবহার হয়েছে অট্টালিকাটির সামনের কম্পাউন্ডে। একটি গুলিতে রক্তাক্ত হয়েছে নীলার্ণব। অন্য গুলিটি লেগেছে কারও পায়ে, তিনি সেই অবস্থায় সম্ভবত কাছেই দাঁড় করানো গাড়িতে উঠে বেরিয়ে গেছেন কম্পাউন্ড থেকে।

গার্গী জরিপ করছিল 'বিয়োন্ড দি স্কাই' নামের মাল্টিস্টোরিডটির কম্পাউন্ডটির ঠিক ততখানি নিরাপত্তা নেই যতখানি থাকা উচিত ছিল। আসলে কম্পাউন্ডটি খুবই অপ্রশস্ত। কয়েকটি গাড়ি রাখার পরে চাতালে স্থানাভাব। কিছু গাড়ি বাইরে রাস্তার উপর রাখা আছে, যেমন গার্গীদের গাড়িটিও।

পুলিশ অফিসার তাঁর কাজ শুরু করে দিয়েছেন অভ্যস্ত ভঙ্গিতে। ততক্ষণে গার্গী মোবাইলের বোতাম পুশ করে খবর দিল ডি সি ডি ডি অরিজিৎ পুরকায়স্থকে, মি.

পুরকায়স্থ, তিতিক্ষার একজিবিশনে এসে এক সাংঘাতিক কাণ্ড। আপনি যদি বিশেষ কোনও কাজে ব্যস্ত না থাকেন তো এখনই একবার স্পটে আসতে পারেন।

—কী হয়েছে যদি একবার নাটশেলে জানান, ম্যাডাম।

গার্গী অতিসংক্ষেপে বিষয়টি বিবৃত করে বলল, বিবেক দ্বিবেদীর মার্ডার নিয়ে আপনি মাথা ঘামাচ্ছিলেন বলেই আপনাকে জানালাম প্রথমে।

—ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি।

শ্রাবণকুমার তখন পুলিশ অফিসারকে বলছেন, মি. মিশ্র, আপনি কিন্তু এখনই আপনার বড়ো কর্তাদের জানিয়ে দিন, ওই হারামি শেষাদ্রিই মার্ডারার। এখনই তাকে অ্যারেস্ট করার ব্যবস্থা করুন। ওই হারামি মিসেস দ্বিবেদীর লাইফ হেল করে দিচ্ছে রোজ। আজ আবার আমাদের একজিবিশনটাই মার্ডার করে দিতে এসেছিল, তারপর কাশ্যপকেই—

বলে প্রায় কান্না-কান্না গলায় বললেন, আপ জানতি হো, কাশ্যপকো ইসকে আগে ফোনমে চার সময় থ্রেট কিয়া—

—তাই নাকি, থ্রেট করেছে! আপনি কি থানায় এফ আই আর করেছেন?

শ্রাবণকুমার থমকালেন, না, তা করিনি। ভেবেছিলাম কুত্তার বাচ্চা, ঘেউ ঘেউ করছে, পরে একটু মেডিসিন দিয়ে দেব, থেমে যাবে। কিন্তু হারামিটা এভাবে অ্যাটাক করবে ভাবিওনি একেবারে! তার কথা শেষ হওয়ার আগেই বাইরে আরও পুলিশের গাড়ি এসে থেমে যাওয়ার শব্দ ও হর্ন।

গাড়িগুলো এসেছে থানা থেকেই, সঙ্গে ফোরেনসিকের অফিসার ও কর্মীরা। তারা গোটা জায়গাটা কর্ডন করে ফেলল মুহূর্তের মধ্যে।

দর্শকদের মধ্যে অনেকেই চলে-যাই চলে-যাই করছিলেন, কেউ বা পুলিশের চোখে অন্ধকার ছুড়ে পালিয়েও গিয়েছেন নিঃশব্দে, যারা পারেননি, তারা আরও পুলিশ দেখে ঘাবড়ে যাচ্ছেন, মি. মিশ্রকে বললেন, আপনার যা জিজ্ঞাসা করার করে ছেড়ে দিন আমাদের। অনেক দূর যেতে হবে।

তাঁদের কথায় তেমন গুরুত্ব দিলেন না রামশরণ মিশ্র। তিনি তখন মোবাইলে রিং হতে সুইচ অন করে কারও সঙ্গে কথোপকথনে বেজায় ব্যস্ত। কয়েকবার 'স্যার স্যার' শুনে গার্গী বুঝে যায় কোনও উপরঅলা খোঁজখবর নিচ্ছেন প্রদর্শনীতে ঘটে যাওয়া ঘটনাটির।

ফোরেনসিকের অফিসার ও কর্মীরা তখন কম্পাউন্ডে পড়ে থাকা রক্তের ছবি তুলছেন, কী সব পাউডার ছড়িয়ে ছবি তুলছেন পটাপট।

গার্গীর নজরে পড়ল তিতিক্ষা তার গাড়ির কাছে গিয়ে কী যেন জিজ্ঞাসা করছে ড্রাইভারকে, একটু পরেই ফিরে এসে গার্গীকে বলল, জানো গার্গীদি, বাবা নাকি এসেছিল একজিবিশন দেখতে।

গার্গী অবাক হয়ে বলল, কই, তাঁকে দেখিনি তো উপরে!

—মকবুল বলল, বাবা ঠিক তখনই এসেছিলেন যখন গুলির শব্দ হয়েছিল নীচে। গাড়ি থেকে নেমে এগোচ্ছিলেন, সেসময় ওই অবস্থা দেখে গাড়িতে উঠে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে গেছেন বাড়িতে।

মকবুল মানে তিতিক্ষার গাড়ির নতুন ড্রাইভার, গার্গী অনুমান করে। মকবুল নীচে তার গাড়িতে বসে ছিল, ঠিকই দেখেছে অতএব। কিন্তু অলীকশেখর এ সব দেখে ফিরে গেলেন কেন তা বুঝে উঠতে পারে না গার্গী।

বিষয়টি নিয়ে বেশি ভাবনার আগেই হুড়মুড় করে এসে পৌঁছোলেন ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি কমিশনার অরিজিৎ পুরকায়স্থ।

২৪

ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি কমিশনার অরিজিৎ পুরকায়স্থকে দেখে গার্গীর শরীরে একটু হাওয়া লাগল এতক্ষণে। অনেকগুলো খুনের তদন্ত সে করেছে এর আগে, কিন্তু চোখের সামনে এভাবে খুন হওয়ার ঘটনা কখনও দেখেনি। তিতিক্ষাকে ঘিরে কিছু জট ঘনিয়ে উঠছিল দ্রুত, কিন্তু তার পরিণামে এভাবে খুন হয়ে যাবে নীলার্ণব তা ঘুণাক্ষরেও অনুমান করতে পারেনি।

অরিজিৎ তখন ঘটনাস্থলে গিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন নীলার্ণবের খুন হওয়ার দৃশ্যটি। পুলিশ অফিসার রামশরণ মিশ্রকে জিজ্ঞাসা করছেন কী করে পুলিশের উপস্থিতিতে খুন হয়ে গেলেন নীলার্ণব! পুলিশ আরও একটু সতর্ক থাকলে এড়ানো যেত কি না দুর্ঘটনাটি।

রামশরণের শঙ্কিত অভিব্যক্তি লক্ষ করছিল গার্গী। ওপরঅলাকে দেখে গুছিয়ে বলার চেষ্টা করছিলেন ঘটনাটি। প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন অনেক নামীদামি মানুষ, অনেক বিখ্যাত শিল্পরসিক। কিন্তু কারও পক্ষেই সম্ভব হয়নি দুর্ঘটনাটি আটকানোর। কেউ ভাবতে পারেনি শেষাদ্রি হাওলাদার সবার সামনে অপমান করবেন তিতিক্ষাকে, সেই অপমানের প্রতিশোধ নিতে নীলার্ণব প্রথমে থানায় গিয়ে ডেকে আনবে পুলিশ, পরক্ষণে সে নিজেই শেষাদ্রিকে তাড়া করতে গিয়ে খুন হয়ে যাবে মুহূর্তের মধ্যে।

রামশরণ অবশ্য উপরঅলার সামনে যথেষ্ট বিনয় দেখিয়ে বললেন, উই আর স্যরি, স্যার। সামান্য কথা কাটাকাটি থেকে পিস্তলের লড়াই হবে তা ছিল আমাদের ভাবনার বাইরে। কিন্তু স্যার, মার্ডারারকে আমরা অ্যারেস্ট করবই।

—আপনি তা হলে জানেন কে মার্ডার করেছে।

—হ্যাঁ, স্যার, ওই ফ্রেঞ্চকাট বেঁটে চেহারার লোকটাই। শেষাদ্রি হাওলাদার। নামটি আমি ডায়েরিতে টুকে রেখেছি।

—আপনি সিওর ওই লোকটিই গুলি চালিয়েছে?

রামশরণ ঘাড় নাড়েন, সিওর, স্যার।

গার্গী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, আপনি তো নিজের চোখে দেখেননি কে গুলি চালিয়েছে?

—না, তা দেখিনি। কিন্তু যেভাবে দুজনে ছুটে বেরিয়ে গেল একজিবিশন হল থেকে, একজন আর একজনকে তাড়া করে, তাতেই যা বোঝার বুঝে নিয়েছি—

অরিজিৎ কী ভেবে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, এখানে তো কয়েকজন ড্রাইভার ছিল গাড়িতে বসে, তাদের কাউকে ইন্টারোগেট করেছেন?

—স্যার, কয়েকজনকে ইন্টারোগেট করেছি। তারা কেউ ঘুমিয়ে পড়েছিল, কেউ বেরিয়েছিল কম্পাউন্ডের বাইরে চা খেতে। কেউ বলতে পারছে না ঠিক কী ঘটেছিল ওই মুহূর্তে।

—কী আশ্চর্য, কেউ বলতে পারছে না?

—স্যার, কম্পাউন্ডে মাত্র চারটে গাড়ি ছিল। বাকি সব গাড়ি বাইরে রাখতে হয়েছে যেহেতু কম্পাউন্ডে স্পেস কম। যাদের গাড়ি ভিতরে ছিল তারা বাইরে গিয়ে অন্য ড্রাইভারদের সঙ্গে আড্ডা মারছিল। এখন ঝামেলায় পড়ে সব আবার নিজের নিজের গাড়িতে এসে বসে আছে। তবে কেউ কেউ বলল, তারা দুটো গুলির শব্দ শুনেছে। তার ঠিক পরেই একটা কালো রঙের গাড়ি বেরিয়ে গেল হু হু করে। সেইটেই শেষাদ্রি হাওলাদারের।

—ইজ ইট? ঠিক আছে, আপনি কম্পাউন্ডের ভিতরের ও বাইরের সব গাড়ির নম্বর ও ড্রাইভারদের নাম নোট করে রাখুন। পরে আবার ইন্টারোগেট করা যাবে।

অরিজিৎ পুরকায়স্থকে দেখে গার্গী এগিয়ে গেল, কিছু বলতে যাবে তার আগেই অরিজিৎ বললেন, কী ম্যাডাম, আপনি এই একজিবিশনে উপস্থিত থাকতেও কিনা এরকম সিরিয়াস একটা ঘটনা ঘটতে দিলেন! যা শুনছি এ তো ডুয়েল লড়াই।

খুব উৎকণ্ঠিত স্বরেই কথাগুলো বললেন অরিজিৎ, কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে নিহিত আছে এক ধরনের হালকা টোন, যেন গার্গীর উপস্থিতিতে এরকম ঘটনা হওয়াটা উচিতই হয়নি। গার্গী তার হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে উঠেছে এতক্ষণে, একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, এমন চকিতে ঘটে গেল ব্যাপারটা, আমরা কেউই ভাবতে পারিনি এই পর্যায়ে চলে যাবে জেলাসিটা।

—আপনি বলছেন জেলাসি?

—হ্যাঁ, জেলাসি তো বটেই। নারীর অধিকার নিয়ে ডুয়েল লড়াই তো চিরকালই হয়েছে, মি. পুরকায়স্থ! শেষাদ্রি হাওলাদার সেই আমেরিকা থেকে উড়ে এসেছে তিতিক্ষাকে ব্ল্যাকমেল করে তাকে দখল করবে বলে। তার সামনেই নীলার্ণব তিতিক্ষাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, পার্টিতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে, অনেক রাত পর্যন্ত নাচগান করছে, এ ঘটনা শেষাদ্রির মাথায় আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। বোঝেনই তো একটা সেক্স-স্টার্ভড লোক হাতের সামনে তিতিক্ষার মতো একজন সুন্দরী নারীকে পেয়েও হারাচ্ছে সেই শোক সামলাতে পারেনি। ঠিক করেছিল আজ একজিবিশনেই তিতিক্ষাকে থ্রেট করে তাকে কব্জা করবে। কিন্তু হঠাৎ একজিবিশনে পুলিশের আগমন তার মাথা খারাপ করে দিয়েছে।

—কিন্তু কী অদ্ভুত ঘটনার সৃষ্টি হল আজ, বলুন? আমরা বিবেক দ্বিবেদীর হত্যা রহস্যের সমাধান খুঁজছি, হঠাৎ কোথা থেকে শেষাদ্রি হাওলাদার নামের একটি লোক এসে বদলে দিল গোটা দৃশ্যপট। আপনি জানতেন শেষাদ্রিকে?

গার্গী মাথা নেড়ে বলল, না, শেষাদ্রি হাওলাদার লোকটিকে এই প্রথম চোখে দেখলাম। কোথায় আমেরিকায় ছিলেন, হঠাৎ কেন যে কলকাতায় ফিরতে গেলেন, আর যদি ফিরলেনই কেন যে তিতিক্ষার দিকে হাত বাড়াতে গেলেন তাই ভাবছি।

অরিজিৎ হেসে বললেন, ম্যাডাম, আমি এখন বুঝে গেলাম হোয়াট ইজ হোয়াট! খুব সোজা অঙ্ক এটা। ক্রাইম লাইনে দীর্ঘদিন থেকে এই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, তিতিক্ষা এখন একটি ফ্রি বার্ড। তাকে এখন যে কোনও ভাবে দখল করে নেওয়া সম্ভব। তিতিক্ষারও এখন কিছু করার নেই, ঋণে ডুবে আছে আপাদমস্তক, তারও কোনও একটা অবলম্বন দরকার যে তাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারবে। আইদার শেষাদ্রি অর শ্রাবণকুমার—কোনও একজনের কাছে তাকে সারেন্ডার করতে হবে। তিতিক্ষা শ্রাবণকুমারকেই বেছে নিয়েছে খুব অঙ্ক কষে। এক গুলিতে দুই ঘুঘু নিধন করার মতো। ছবি এঁকে অর্থ উপার্জন করতে পারলে একই সঙ্গে ঋণের জাল থেকে মুক্ত করতে পারবে নিজেকে, আবার সুনাম অর্জনও তখন হাতের মুঠোয়। কিন্তু শেষাদ্রিকে পাত্তা দিলে ঋণমুক্ত হলেও হতে পারে, কিন্তু যশ অর্জন নৈব নৈব চ। বরং সারা গায়ে কলঙ্ক।

—তা হলে বলছেন এটিও একটি ত্রিভুজ প্রেমের পরিণতিতে খুন!

—না, মি. পুরকায়স্থ। প্রেমের কোনও সিন নেই এখানে। এখানে যা হচ্ছে সবই ব্ল্যাক মেল। সঙ্গে ককটেল হয়ে আছে সেক্স। চেষ্টা চলছিল ব্ল্যাকমেল করে কে দখল করে নিতে পারে তিতিক্ষাকে। নীলার্ণব তিতিক্ষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হচ্ছে তা সহ্য হয়নি শেষাদ্রির।

অরিজিৎ বললেন, কিন্তু নীলার্ণব তো ফ্যাক্টর নয়। ফ্যাক্টর হল শ্রাবণকুমার। একজন নীলার্ণব গেলে পরের দিনই শ্রাবণকুমার আর একজন লালার্ণব বা সবুজার্ণবকে ফিল্ডে নামিয়ে দেবেন।

গার্গী সায় দিয়ে বলল, কিন্তু শেষাদ্রির সামনে নীলার্ণবই দেওয়াল হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই মুহূর্তে। শ্রাবণকুমার পিছন থেকে খেলছেন। তাই শেষাদ্রি হয়তো প্রথমে নীলার্ণবকেই টার্গেট করল। পরে শ্রাবণকুমার। —

—তা হলে আমরা ধরে নিচ্ছি নীলার্ণব মারা গেছে শেষাদ্রির গুলিতে?

—রামশরণ মিশ্র তো তাই বললেন আপনাকে। কিন্তু বাস্তবে সেটাই সত্যি কি না তা এখনই বলার সময় হয়নি।

—হয়নি! কেন এ কথা বলছেন, ম্যাডাম?

—মি. পুরকায়স্থ, আপনি লক্ষ করেছেন নীলার্ণবের পিঠে গুলি লেগেছে, বুকে নয়। দূরে আর একটা রক্তের দাগ রয়েছে, যদি ওই রক্তের দাগ শেষাদ্রি হাওলাদারের হয়ে থাকে, আর যদি তিনি গুলি চালিয়ে হত্যা করে থাকেন নীলার্ণবকে, তা হলে কিন্তু গুলিটা বুকে লাগার কথা, পিঠে নয়।

অরিজিৎ ভাবলেন গার্গীর যুক্তিজাল কতখানি অকাট্য, বললেন, কিন্তু এও তো হতে পারে, শেষাদ্রি হাওলাদার আগে নেমে গিয়ে কোথাও লুকিয়ে অপেক্ষা করছিলেন নীলার্ণব তাঁর পিছনে নেমে আসেন কি না দেখতে। নীলার্ণব সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেই এগিয়ে গেছে শেষাদ্রিকে টার্গেট করতে, অমনি শেষাদ্রি লুকোনো জায়গা থেকে বেরিয়ে তাকে পিছন থেকে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে তারপর ছুটে গিয়ে উঠেছেন গাড়িতে।

—তা হলে শেষাদ্রির গায়ে বা পায়ে গুলি লাগল কী করে? নীলার্ণব তার আগেই তো গুলি খেয়ে পড়ে গেছে!

—হয়তো এমন হতে পারে, প্রথমে নীলার্ণবই গুলি চালিয়েছে, তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় শেষাদ্রি সামান্য আহত হয়, নীলার্ণব তখন পালিয়ে আসার জন্য যেই ঘুরে দাঁড়িয়েছে অমনি তার পাল্টা হিসেবে শেষাদ্রি গুলি করেন নীলার্ণবকে। তখন তো নীলার্ণব পিছন ফিরে পালাচ্ছিল—

গার্গী হঠাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলল, তা হলে একটা তথ্য পরিষ্কার হল, প্রদর্শনীতে আসার সময় নীলার্ণব ও শেষাদ্রি দুজনেরই কাছে রিভলবার ছিল, হয়তো দুজনেই প্রস্তুত ছিল আজ একটা হেস্তনেস্ত হবে।

—হ্যাঁ। তাই তো দেখা যাচ্ছে। তবে, ম্যাডাম, যারা আগুন নিয়ে খেলে তাদের কাছে রিভলবার থাকবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। দুজনেই তিতিক্ষা নাম্নী একটি আগুনের পিছু ছুটছিল।

—তা বটে। সে যাই হোক, এখন এক খুনের তদন্ত শেষ না হতে আর এক খুন ঘাড়ে এসে চাপল আপনাদের।

রামশরণ মিশ্র হঠাৎ এসে তাদের আলোচনায় ব্যাঘাত ঘটিয়ে অরিজিৎ পুরকায়স্থকে বললেন, স্যার, একজিবিশনে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের অনেককেই প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। অনেকের নাম-ঠিকানা লিখে নিয়েছি পরে ইন্টারোগেট করব বলে। এখন কেউ আর এখানে থাকতে চাইছে না। ড্রাইভাররাও চলে যেতে চাইছে। আপনি অনুমতি করলে ছেড়ে দি।

অরিজিৎ ঘাড় নাড়তেই পুলিশ অফিসারটির স্বস্তি। অমনি গাড়িগুলির হর্ন বাজতে শুরু করল তুমুল চিৎকার করে। একে একে চলে গেল শিল্পরসিক অতিথিরা। তখনও তিতিক্ষার গাড়ি রয়ে গেছে কম্পাউন্ডে। গার্গী তাকে ডেকে একান্তে জিজ্ঞাসা করে, তিতিক্ষা, তোমার মকবুল কিছু দেখেনি?

তিতিক্ষার মুখ তখনও শুকিয়ে কিসমিস, বলল, গার্গীদি, আমি ওকে জিজ্ঞাসা করছিলাম, যদি কিছু দেখে থাকো, সত্যি করে বলো, মকবুল। কিন্তু মকবুল ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল, কিছু দেখেনি। ও ঘুমিয়ে পড়েছিল গাড়ির মধ্যে। বুঝলে, গার্গীদি, লোকটা কিছু ঘুমোতে পারে। আমি গাড়ি থেকে নামতেই ঘুমোবে, আবার যেই গাড়িতে উঠি, অমনি ঘুম ভেঙে চালাতে শুরু করে দেবে।

গার্গী তাকায় তিতিক্ষার চোখের দিকে, বলল, যে-ড্রাইভার এত ঘুমোয় তার সম্পর্কে সাবধান হওয়াই ভালো। দেখো, চালাতে চালাতে ঘুমিয়ে না পড়ে।

তিতিক্ষা অপ্রস্তুত হয়, বলে, গার্গীদি, আমার কিন্তু খুব ভয় করছে। শেষাদ্রিদা আমাকে সারাক্ষণ থ্রেট করছিলেন। যদি এখন আমার উপর চড়াও হয়!

—তা হলে এখনই পুলিশ অফিসারকে জানিয়ে স্পেশাল সিকিউরিটি নাও।

তিতিক্ষার মুখ অরও শুকিয়ে যায়, গার্গীদি, সারাক্ষণ পুলিশ সঙ্গে লেপটে থাকবে! ইস, তার চেয়ে মরাও ভালো।

২৫

কলকাতার এই পশ এলাকায় রাত তখন নেমে আসছে নিয়ন আলোর জ্যোৎস্না ছড়িয়ে। মায়াবী আলোয় একটি অনভিপ্রেত হত্যাকাণ্ড ঘনিয়ে নিয়ে এল অদ্ভুত রহস্য। নীলার্ণবের নিথর শরীরটা মর্গে নিয়ে যাওয়ার সময় একজন পেটমোটা কনস্টেবল আবিষ্কার করে ফেলল এক অত্যাশ্চর্য তথ্য। নীলার্ণবের ডেডবডি যেখানে পড়েছিল চাতালের উপর, তার কাছেই একটি রুমাল খুঁজে পেয়ে সেটি তৎক্ষণাৎ হাজির করল ডি সি ডি ডি অরিজিৎ পুরকায়স্থর সামনে, স্যার, দেখুন।

গার্গী লক্ষ করছিল কনস্টেবলটির হাতে একটি লেডিজ রুমাল, তার এক কোণের সঙ্গে অন্য কোণটি গিঁট দিয়ে বাঁধা। অরিজিতের নির্দেশে রুমালটির গিঁট খুলতেই তার ভিতর থেকে প্রকাশিত হল একটি কাগজখণ্ড, কাগজটি হাতে নিয়ে খুলতেই তাতে লেখা, মৃত্যুই আপনার জন্য শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

—স্ট্রেঞ্জ! এটা কার কাছে পাওয়া গেছে?

কনস্টেবলটি মাথা দুলিয়ে বলল, স্যার, চাতালের একপাশে পড়ে ছিল অন্ধকারে। হই-হট্টগোলের মধ্যে কারও চোখে পড়েনি এতক্ষণ। চাতালের ভিড় কমে যেতে চোখে পড়ে গেল হঠাৎ।

অরিজিৎ কাগজের লেখাটি দু-তিনবার পড়ে কপালে তিনটে বিশাল ভাঁজ ফেলে তাকালেন গার্গীর দিকে, ম্যাডাম, দেখেছেন হাতের লেখাটি? বিজ্ঞাপনের দাঁতের মতো ঝকঝক করছে। কে রেখে গেল রুমালটা? বেশ অদ্ভুত রং কিন্তু রুমালটার!

গার্গী আশ্চর্য হচ্ছিল রুমালটা দেখে, এই সেই রুমাল—তিতিক্ষার কাছে শুনেছিল কফিন রঙের রুমাল। কিন্তু রুমালের সেটটা পাঠিয়েছিলেন শ্রাবণকুমার। একবার অচেনা নামের একটি মেয়েকে দিয়ে, অন্যবার নীলার্ণব নিজেই দিয়েছিল তিতিক্ষাকে। নীলার্ণবের মৃতদেহের অদূরে এরকম একটি রুমাল, তার ভিতর তাৎপর্যপূর্ণ একটি চিঠি, সব মিলিয়ে বেশ ধন্দে ফেলে দিল চিঠিটার উপস্থিতি।

—কে রেখে গেল চিঠিটা? শেষাদ্রি হাওলাদার নাকি? তার হাতের লেখার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে হয়! অরিজিৎ মন্তব্য করলেন তিরিক্ষি স্বরে।

গার্গী খুবই ঘোরের মধ্যে, চিন্তান্বিত তার অভিব্যক্তি। শেষাদ্রি হাওলাদার গুলি করে নীলার্ণবকে খুন করে তার ডেডবডির পাশে ফেলে গেলেন এই রুমালটা? কিন্তু তা কী করে হবে? রুমালের মালিক তো শ্রাবণকুমার। সেই রুমাল বড়োজোর থাকতে পারে নীলার্ণবের কাছে। তা হলে কি এরকম হতে পারে রুমালটা নীলার্ণবের কাছেই ছিল, সে-ই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল শেষাদ্রি হাওলাদারকে খুন করবে, তারপর তার ডেডবডির পাশে রেখে দেবে রুমালটা! কিন্তু সে নিজেই খুন হওয়ায় তার শরীরটা যখন ছিটকে পড়ছিল চাতালের উপর, তখন রুমালটাও তার পকেট থেকে ছিটকে পড়েছে চাতালে!

শ্রাবণকুমার সেই যে পুলিশের সঙ্গে কথা বলে উপরে প্রদর্শনীকক্ষে ঢুকেছেন আর দেখা নেই। শোনা গেল প্রদর্শনী বন্ধ করে দিচ্ছেন এখনই। তিতিক্ষার কানে খবরটা পৌঁছোল দেরিতে। সামান্য সময়ের জন্য সে উপরে গিয়েছিল দেখতে, ফিরে এল একটু পরেই। অরিজিতের হাতে কফিন রঙের রুমালটি দেখে স্তম্ভিত হয়ে বলল, এ কী! এই রুমাল কোত্থেকে বেরোল?

নীলার্ণবের ডেডবডির কাছেই পড়ে পাওয়া গেছে শুনে তার বিস্ময় আরও ঊর্ধ্বগামী। বলল, অসম্ভব!

কেন অসম্ভব তা জানার প্রতীক্ষায় অরিজিৎ ও গার্গী দুজনেই তার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে তিতিক্ষা একটু বিব্রত। বলল, আমাকে প্রায় দেড় ডজন রুমাল উপহার হিসেবে পাঠিয়েছিলেন শ্রাবণকুমার।

গার্গী হঠাৎ তাকে একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে জানতে চাইল, সব রুমালই কি তোমার কাছে এখনও আছে, না কোনও কোনওটা খোয়া গেছে ইতিমধ্যে।

তিতিক্ষা মাথা ঝাঁকায়, বলে, রুমাল আমার কোমরে গোঁজা থাকে, গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে কিংবা হাঁটাচলার ফাঁকে দু-চারটে পড়ে যায়, যাওয়াটাই স্বাভাবিক। সেই খোয়া যাওয়া রুমালই কেউ ব্যবহাব করেছে দেখে আশ্চর্য হচ্ছি। তুমি কিছু কারণ খুঁজে পাচ্ছ, গার্গীদি?

—এখনও পাইনি। কিন্তু একটা ছোট্ট প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে আমার মনে। ঠিক করে বলো তো, তিতিক্ষা, শেষাদ্রি হাওলাদার তোমার কাছে কি এসেছিলেন ইতিমধ্যে?

তিতিক্ষা ইতস্তত করে, তারপর হ্যাঁ-বোধক উত্তর দিয়ে ঘাড় নাড়ে।

—সে সময় কোনও রুমাল পড়ে গিয়ে থাকতে পারে তোমার কোমর থেকে?

তিতিক্ষা মনে করার চেষ্টা করে বলে, হয়তো। ঠিক মনে নেই।

গার্গী চোখ তীক্ষ্ণ করে, শেষাদ্রি বাড়িতে এসেছিলেন?

তিতিক্ষা চুপ করে থাকে, গার্গীর চোখের দিকে তার চোখ, আস্তে করে বলে, হ্যাঁ।

গার্গী বিস্মিত হয়ে বলে, তুমি তাকে বাড়ির ভিতর এন্ট্রি দিলে কেন?

তিতিক্ষা চুপ করে থাকে আবার, কিছুক্ষণ পরে বলে, না দিয়ে উপায় ছিল না। বলছিল মামলা করে জেলে ঢুকিয়ে দেবে আমাকে। পাঁচ-সাত বছর জেল নাকি অনিবার্য।

গার্গী পরখ করছিল তিতিক্ষার চোখের ভীরুভাবটা, শেষাদ্রি তাকে কতখানি দখল করেছে তা মাপতে চাইছিল চোখে টর্চ জ্বেলে। কিন্তু এই মুহূর্তে এর চেয়ে বেশি জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হল না। আন্দাজ করে নিচ্ছিল তিতিক্ষা যেমন শ্রাবণকুমারকে তার জীবনে প্রবেশ করতে দিয়েছে, নিজেকে বাঁচাতে শেষাদ্রি হাওলাদরের কাছেও আত্মসমর্পণ করেছে হয়তো।

তিতিক্ষার এখন বোধহয় তা না-করেও আর উপায় নেই। আজ আর ওকে বাঁচানোর কেউ নেই আশেপাশে। বিবেক এত-এত ঋণ করে গেছে, তা সুদে-আসলে বেড়ে এখন একটি হাঙরের মতো তাড়া করেছে তিতিক্ষাকে, তার এখন অস্তিত্বই সংকটে। তার নিজের বলতে আছেন তার বাবা অলীকশেখর, কিন্তু

অলীকশেখরের ভূমিকা বেশ রহস্যজনক। মেয়েকে কতখানি গার্ড দিচ্ছেন বা দিতে চাইছেন তা বোঝার চেষ্টা করেছে গার্গী। কিন্তু এমনও হতে পারে তিতিক্ষা আর তার বাবার কাছে নিরাপত্তার আশা করে না। সে চাইছে নিজের বুদ্ধিমতো চলতে।

তিতিক্ষাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর গার্গী ফিরে এল অরিজিতের কাছে, বলল, রুমালটা শেষাদ্রি হাওলাদারের হওয়াটাও সম্ভব।

অরিজিৎ লাফিয়ে উঠে বলল, তা হলে শেষাদ্রি হাওলাদারের হাতের লেখার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই তো হয়!

এক পশলা ভাবনাচিন্তার পর গার্গী বলল, শেষাদ্রি হাওলাদার নিশ্চয় এমন বোকা নন যে, খুন করে তার ডেডবডির পাশে রেখে যাবেন নিজের হাতের লেখাটি। তবে হাতের লেখা যখন একটি পাওয়া গেছে সম্ভাব্য সাসপেক্টদের হাতের লেখার সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যেতে পারে। তা ছাড়া শেষাদ্রি হাওলাদারকে তো আর খুঁজে পাওয়া যাবে না চট করে!

পাওয়া যাবে না জেনেও অরিজিৎ পুরকায়স্থ একজন সাব-ইনস্পেক্টরকে ইশারায় ডেকে হুকুম দিলেন শেষাদ্রি হাওলাদারকে যেখান থেকে হোক ধরে নিয়ে আসতে।

তাঁর আদেশ দেওয়া শেষ হলে গার্গী বলল, কিন্তু আপনি নিশ্চয় জানেন এই রুমালের মালিক শ্রাবণকুমার।

--শ্রাবণকুমার! অরিজিতের বিস্ময় উথলে উঠল, বলেন কী!

—হ্যাঁ, তিনিই দফায় দফায় এই বিশেষ রঙের রুমালটি উপহার হিসেবে পাঠিয়েছেন তিতিক্ষাকে। তাঁর নাকি এইটেই কেতা। যাদের উনি খুব পছন্দ করেন তাদের কাছে এভাবেই একডজন বা আধডজন রুমাল উপহার দিয়ে থাকেন।

বলে গার্গী তিতিক্ষাকে পাঠানো রুমালকাহিনি বর্ণনা করে সংক্ষেপে ও টু দি পয়েন্ট। পরক্ষণে বলল, তাঁর কাছে নিশ্চয় আরও রুমাল থাকা সম্ভব।

অরিজিৎ উত্তেজিত স্বরে বললেন, তা হলে কি শ্রাবণকুমারই—

বলে থেমে গেলেন অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসারটি, পরক্ষণে দ্বিতীয় চিন্তায় নিজেকে নিয়োজিত করে বললেন, এও তো হতে পারে নীলার্ণব তিতিক্ষার সঙ্গে বেশি বাড়াবাড়ি করছিল দেখে এই সুযোগে নীলার্ণবকে তিনিই সরিয়ে দিলেন। নীলার্ণবের কাছে যদি রিভলবার থেকে থাকে, তা হলে তার মালিক শ্রাবণকুমারের ঢাউস পোশাকের নীচে দু-চারটে রিভলবার থাকা অবশ্যই সম্ভব।

গার্গী এই গূঢ় ভাবনার ভিতরে নিজেকে থিতু করল কিছুক্ষণ, বলল, তিনি যদি খুন করে থাকেনও, এই বিশেষ কফিন রঙের রুমালটি এখানে ফেলে রাখবেন না। তা ছাড়া তিনি নিশ্চয় পারবেনও না এমন চমৎকার হস্তাক্ষরে বাংলা লিখতে।

—তিনি না-লিখলেও তাঁর কোনও কর্মচারী লিখতে পারেন, তাঁর নির্দেশে।

—মি. পুরকায়স্থ, একটা বিষয় লক্ষ করছিলাম—বিবেককে হত্যার পরও ঠিক এরকম একটি চিঠি এসে পৌঁছেছিল তিতিক্ষার কাছে। বিষয়টা কাকতালীয় নয় বলেই আমার ধারণা।

অরিজিৎ উত্তেজিত হলেন, প্রথম চিঠির হাতের লেখা আর এই দ্বিতীয় চিঠির হাতের লেখা কি এক!

গার্গী মনে করার চেষ্টা করছিল, ঠিক মনে করতে পারছি না।

—এখনই মিলিয়ে দেখতে হবে। যদি এক হয় তা হলে কি সেই একই লোক নীলার্ণব হত্যাকাণ্ডের সঙ্গেও জড়িত!

গার্গীও চিন্তায় জেরবার হচ্ছিল এই দ্বিতীয় হত্যাকাণ্ডের পর। যদি এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে শেষাদ্রি জড়িত থাকেন, তা হলে কি তাঁর পক্ষে প্রথম হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকা সম্ভব! তিতিক্ষার ভাষ্যমতো তখন তো তিনি আমেরিকায় ছিলেন!

না কি তাঁর আমেরিকায় থাকার গল্পটা বানানো! হয়তো ক-মাস আগে থাকতেন, তারপর তিতিক্ষার দিকে তাঁর নজর পড়ার পর সেখানে স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর অবনিবনা হয়। তখন সেই স্ত্রীকে ছেড়ে দিয়ে তিনি চলে আসেন কলকাতায়। এখানে এসে তিনি শাসানি দিতে থাকেন বিবেককে। কিন্তু যেহেতু এত টাকা ঋণ মেটানো সম্ভব ছিল না বিবেকের পক্ষে, সেই সুযোগে বিবেকের উপর এক্সপোর্টের টোপ ফেলে তাকে আরও ঋণগ্রস্ত করে তুলল ক্রমশ। একেবারে খাদের কিনারে নিয়ে গিয়ে শেষে হত্যা করেছে নির্মমভাবে। এবার তার শিকার তিতিক্ষা।

গার্গী বিষয়টা নিয়ে ভাবতে থাকে গভীর অন্যমনস্কতায়। তিতিক্ষাকে কেন্দ্র করে যে-জটিলতা আর টানাপোড়েনের সৃষ্টি হয়েছে তাতে শেষাদ্রি হাওলাদারের কতখানি ভূমিকা থাকতে পারে তা নিয়ে আন্দোলিত হয়, উত্তেজিত হয়, দ্বিধান্বিতও হয়। কফিন রঙের রুমালে চিরকুট পাঠিয়ে কি তাদের সবাইকে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস!

গার্গী ভিতরে ভিতরে কাঁপতে লাগল কী এক অপার আলোড়নে, বলল, মি. পুরকায়স্থ, শেষাদ্রি হাওলাদারের জীবনযাপনের পুরো ইতিহাস আমাদের কারও জানা নেই। আপনি যদি আমেরিকা থেকে তাঁর একটি ক্ষুদ্র জীবনপঞ্জি আনানোর ব্যবস্থা করেন তো এই তদন্তে বিশেষ সুবিধে হয়।

—রাইট ইউ আর, অরিজিৎ পুরকায়স্থও উত্তেজিত হতে থাকেন তাঁদের তদন্ত হঠাৎ একটা বাঁকের মুখে এসে পৌঁছেছে দেখে। বললেন, আমি এখনই ব্যবস্থা নিচ্ছি। অবশ্য এর মধ্যে আমার হেডকোয়ার্টারকে সতর্ক করে দিয়েছি যাতে লোকটি দেশ ছেড়ে পালাতে না পারে।

গার্গী ততক্ষণে সমস্ত বিষয়টি পর্যালোচনা করে কয়েকটি সূত্রে পৌঁছেছে। অরিজিৎ পুরকায়স্থকে বলল, দেখুন, এখনও পর্যন্ত যা মনে হচ্ছে শেষাদ্রি হাওলাদার অথবা শ্রাবণকুমার—যে কোনও একজনই জড়িত থাকতে পারেন এই হত্যাকাণ্ডে। সে ক্ষেত্রে আমাদের দেখতে হবে কফিন রঙের রুমালটি কীভাবে এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে গেল! এই রুমালটি কি তিতিক্ষার কাছ থেকে পাওয়া কোনও রুমাল, না শ্রাবণকুমারের কাছেই ছিল তাঁর পেটেন্ট রুমাল!

২৬

ক্রাইম সেকশনের পুলিশ ইনস্পেক্টর দেবজ্যোতি নাগ রায় তাঁর অফিসের টেবিলে একরাশ কাগজপত্র ছড়িয়েছিটিয়ে বসে কী যেন পড়ছেন মনোযোগ দিয়ে, হঠাৎ একটি ফোন আসায় মনঃসংযোগ করলেন সেদিকে।

—হ্যালো—

কিছুক্ষণ নিবিষ্ট হয়ে শুনলেন ওপাশের মিনিট-তিনেকের কিছু সংলাপ, শুনতে শুনতে চোয়ালে জড়ো হল কিছু কুঞ্চন ও কপালে ভাঁজ। বললেন, কখন ফোনটা এসেছিল আপনার কাছে?

'রাত এগারোটা নাগাদ' শুনে কুঞ্চন ও ভাঁজের ডিগ্রি উর্ধ্বমুখী। দেবজ্যোতি নাগ রায় পরক্ষণে বললেন, ঠিক আছে, একটু সতর্ক থাকবেন। আজ কোথাও বেরোনোর প্রয়োজন নেই। আমরা বিষয়টা আলোচনা করে দেখছি।

—কিন্তু আমার যে আজ একবার দক্ষিণ কলকাতার একটা গ্যালারিতে যেতেই হবে। আমার এক বান্ধবীর ছবির সোলো প্রদর্শনী হচ্ছে, সেখানে আমার হাজির থাকার কথা।

শুনে দেবজ্যোতি আবার বললেন, দেখুন, যখন একটা থ্রেট-কল এসেইছে টেলিফোনে, অন্তত কয়েকটা দিন সতর্ক থাকাই শ্রেয়।

—কিন্তু আপনি নিশ্চয় পামেলা নাদকার্নীর নাম শুনেছেন? ইন্ডিয়ার ওয়ান অফ দি বেস্ট আর্টিস্টস। তিনি নিজে কাল টেলিফোন করে বললেন তাঁর একজিবিশনে আমি যেন অনুপস্থিত না থাকি। কী করে সেই অনুরোধ না রাখি বলুন!

দেবজ্যোতির মুখে বিরক্তির সঞ্চার, দেখুন, যা পরিস্থিতি আপনার এখন সাবধান থাকাই ভালো।

—কিন্তু তাই বলে ঘরে বন্দি হয়ে থাকব আমি? ক-দিনই বা বন্দিজীবন কাটানো যাবে? আমার হাতে এখন প্রচুর কাজ। আমাকে ঘুরতেও হচ্ছে খুব।

দেবজ্যোতি বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন, এখন আপনি যা ভালো বুঝবেন—

টেলিফোন সংলাপ শেষ না-করেই রিসিভারটা ক্র্যাডলে রেখে দেবজ্যোতি পরক্ষণে আবার তুললেন রিসিভার, বোতাম পুশ করে প্রথমেই বিষয়টা জানিয়ে রাখলেন ডি সি ডি ডি অরিজিৎ পুরকায়স্থকে। পরক্ষণে লাইনে ধরলেন গার্গীকে, হ্যালো, ম্যাডাম, একটু আগে তিতিক্ষা দ্বিবেদী ফোন করেছিলেন আমাকে।

গার্গী তরফ থেকে সাগ্রহ উৎকণ্ঠা, কেন হঠাৎ?

তিতিক্ষা দ্বিবেদী জানাচ্ছেন কাল রাত এগারোটা নাগাদ ওঁর ল্যান্ডফোনে একটি কল আসে, রিসিভার তুলতেই শুনলেন কোনও পুরুষকণ্ঠ ওঁকে হুমকি দিয়ে বলছেন, তুমি যে-পথে এগোচ্ছ তা ভুল পথ। এখনই ফিরে এসো ওখান থেকে। দিস ইজ ফার্স্ট ওয়ার্নিং। অ্যান্ড অলসো লাস্ট ওয়ার্নিং। কথা না শুনলে সামনে ভয়ংকর বিপদ।

গার্গীর ভুরুতেও ঢেউ খেলে গেল অজস্র ছোটো বড়ো কুঞ্চন। তিতিক্ষা এখন বসে আছে কোনও সুপ্ত আগ্নেয়গিরির ক্রেটারের উপর, যে কোনও মুহূর্তে লাভা ছড়িয়ে ধ্বংস করে দিতে পারে তার চারপাশে জড়ো হওয়া রঙিন সুখস্বপ্নকে।

গার্গী তার মগজে কিছু আলটপকা চিন্তার তোলাপাড়া করে জিজ্ঞাসা করল, কার কণ্ঠস্বর সে-বিষয়ে কিছু দিশা দিতে পেরেছে?

—না, তিনি চিনতে পারেননি গলা।

—তা এখন কী করতে চান?

—আমি মিসেস দ্বিবেদীকে পরামর্শ দিয়েছি আপাতত কোথাও না বেরোতে।

—ভালোই তো পরামর্শ দিয়েছেন।

—কিন্তু মিসেস দ্বিবেদী বলছেন আজ বিকেলে কোথায় ছবির একজিবিশন আছে, তাঁকে নাকি যেতেই হবে। কী মুশকিল বলুন তো!

—তা হলে, গার্গী কিছুটা সময় নিল তিতিক্ষা-বিষয়ে ভাবতে, তারপর বলল, তা হলে তো ওকে পার্সোনাল সিকিউরিটির ব্যবস্থা করতে হয়।

দেবজ্যোতি নাগ রায়ের কণ্ঠে কিছু উষ্মা জড়ো হয় মুহূর্তে, দেখুন, ম্যাডাম, মাত্র দু-দিন আগে ওঁরই প্রদর্শনীতে ঘটে গেল একটা মস্ত দুর্ঘটনা। সেখানে কত বিখ্যাত মানুষের উপস্থিতিতেও ঠেকানো যায়নি হত্যাকাণ্ড। এমনকী পুলিশ সেখানে উপস্থিত ছিল, তা সত্ত্বেও একজন খুনি সকলের চোখের সামনে একটা খুন করে পালিয়ে গেল, এখনও খুনির টিকিটিও ছুঁতে পারিনি আমরা। এখনই যদি মিসেস দ্বিবেদী আবার জেদ ধরেন প্রদর্শনীতে যাবেন বলে, পুলিশ কী করে দায়িত্ব নেবে বলুন। মাত্র কয়েকটা দিন তো—

গার্গী আবার একটু ভেবে নিয়ে বলল, কিন্তু কয়েকটা দিন পরেও যে তার বিপদ কেটে যাবে তারও তো কোনও স্থিরতা নেই!

—তা নেই। কিন্তু আমরা চেষ্টা করছি ব্রেক-থ্রু করতে। শেষাদ্রি হাওলাদারের খোঁজে আমরা সারা কলকাতার প্রত্যেক থানায় রেড অ্যালার্ট দিয়েছি। নিশ্চয় ধরা পড়ে যাবে দু-চারদিনের মধ্যে।

—আর ইউ শিওর শেষাদ্রি হাওলাদারই মার্ডারার?

—সারকামস্ট্যান্সেস তো তাই বলছে।

—ঠিক আছে, যদি খুনি ধরা পড়ে তো ভালোই। কিন্তু তিতিক্ষাকে প্রোটেকশন দেওয়াটাও তো জরুরি। তিতিক্ষা দ্বিবেদী তো এখন প্রায় ভি আই পি।

—দেখছি, ম্যাডাম, কী করা যায়!

রিসিভার রেখে দেবজ্যোতি নাগ রায় কিছুক্ষণ বিড়বিড় করলেন নিজের মনে। এই সব উটকো ঝামেলা উড়ে আসে বলেই পুলিশের চাকরিটা এত খারাপ। কলকাতায় এখন সবাই ভি আই পি। সবাই গাড়ির মাথায় লাল লাইট লাগিয়ে ঘুরতে চায়, সবাই ভি আই পি ট্রিটমেন্ট চায়। এভাবে চললে তো—

তাঁর বিড়বিড়ানি শেষ হওয়ার আগেই আবার বেজে ওঠে ফোনের টিংনানা টিং নানা। বিরক্ত হয়ে ফোন তুলে বেশ হেঁড়ে গলায় বললেন, হ্যালো—

কিন্তু পরক্ষণে চেয়ার ছেড়ে প্রায় লাফিয়ে ওঠার উপক্রম করলেন কেন না টেলিফোনের ওপাশ থেকে যে-কণ্ঠটি শোনা গেল তাতে তাঁর হার্টবিট প্রায় দ্বিগুণ। রিসিভারটি কানে বেশ জোরে চেপে শুনলেন, মি. ইনস্পেক্টর, আমার নাম শেষাদ্রি হাওলাদার।

নামটি শুনে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছেন পুলিশ ইনস্পেক্টর, হ্যাঁ বলুন—

পরক্ষণে শুনলেন, মাত্র দু-দিন আগে তিতিক্ষা দ্বিবেদী নামের এক শিল্পীর প্রদর্শনীতে একটি খুনের ঘটনা ঘটে গেছে যার দায়ভাগ নাকি বর্তেছে এই অধমের উপর। অন্তত খবরের কাগজের রিপোর্টে পড়ে তাই ধারণা হয়েছে আমার।

দেবজ্যোতি নাগ রায় কিছু মন্তব্য না করে শুধু উচ্চারণ করলেন, হুঁ।

—খবরটি জেনে ও পড়ে আমি স্তম্ভিত। আমি নীচে নেমে গাড়িতে উঠে পালাতেই চেয়েছিলাম সেদিন, কিন্তু পিছন থেকে একটি গুলি এসে আমার পায়ে লাগায় আর একটু হলেই পড়ে যাচ্ছিলাম চত্বরের মেঝেয়। যা মনে হয়েছে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামামাত্র আমাকে লক্ষ্য করে কেউ গুলি ছুড়েছিল, তাতে আমার পায়ে গুলি লাগে, আর একটু উপরে হলেই ফুঁড়ে ফেলত আমার হৃৎপিণ্ড, কিন্তু বেঁচে গেছি বরাত জোরে, আমি সেই মুহূর্তে গাড়িতে উঠে পালিয়ে না-গেলে হয়তো নীলার্ণব কাশ্যপের মতো আমাকেও হাইরাইজ বিল্ডিংটির চত্বরে চিরকালের মতো শুয়ে থাকতে হত মুখ থুবড়ে। যা হোক প্রাণে বেঁচে ফিরে এসেছি সেদিন। পরদিন

সকালে উঠে আমি থানায় এফ আই আর করব বলে খসড়া তৈরি করছি, খবরের কাগজ পড়ে আমি অবাক। সেই সন্ধেয় আমার কাছে আদৌ কোনও আগ্নেয়াস্ত্র ছিল না, নীলার্ণব কাশ্যপ আমার পিছু ধাওয়া করেছে দেখে আমি নিশ্চিত ছিলাম আমাকে খুন করার জন্যই ওকে সুপারি দিয়েছেন শ্রাবণকুমার। কিন্তু কে গুলি করেছিল তা বুঝে উঠতে পারিনি আধো-অন্ধকারে। পর পর দুটি গুলি ছুড়েছিল আততায়ী। একটি গুলি লাগে আমার পায়ে, অন্যটি নীলার্ণবের শরীরে। তাকে লুটিয়ে পড়ার দৃশ্যও আমার নিজের চোখে দেখা।

এক নিঃশ্বাসে বহুক্ষণ বলে শেষাদ্রি হাওলাদার থামতেই দেবজ্যোতি বলতে পারলেন, আপনি এখন কোথায়?

—আমি কলকাতারই কোথাও আছি, কিন্তু সেটা আমি এখনই আপনার কাছে প্রকাশ কবছি না, করলেই তো আপনি আমাকে গ্রেফতার করার জন্য বাহিনী পাঠিয়ে দেবেন আমার কোনও অপরাধ না-থাকা সত্ত্বেও। কিন্তু আপনাদের অনুমান ভুল। ভুলটা ধরিয়ে দেওয়ার জন্যই এই ফোন। তবে এও বলে দিচ্ছি তিতিক্ষার সামনে অনেক বিপদ। কথাটা স্মরণ করিয়ে দিলাম আপনাদের।

পরক্ষণে ফোনের লাইন কাটা। রিসিভার হাতে নিয়ে বিমূঢ় বসে রইলেন দেবজ্যোতি নাগ রায়। শেষাদ্রি হাওলাদার সত্যি বলছেন না মিথ্যে তা নিয়ে ধ্যান দিলেন কিছুক্ষণ। তাঁদের ধারণা ছিল নীলার্ণব ও শেষাদ্রির মধ্যে গুলি বিনিময় হয়, তাতে নীলার্ণবের গুলি লেগেছিল শেষাদ্রির শরীরে, শেষাদ্রির ছোড়া গুলি লেগেছিল নীলার্ণবের পিঠে। কিন্তু শেষাদ্রির কথামতো অন্য কেউ যদি গুলি করে থাকে তা হলে তিনি কে!

রিসিভারটি ক্র্যাডলে রেখে প্রায় ভ্যাবলার মতো ভাবনায় অন্তরিন হলেন দেবজ্যোতি নাগ রায়। লোকটা এই সাতসকালে কিছু ফোনবার্তা উপহার দিয়ে তাঁকে একটি ভুলভুলাইয়ার গলিতে রেখে দিয়ে কেটে দিল ফোনটা। বিষয়টি নিয়ে পাঁচ-পনেরো যখন ভাবছেন, সে সময় তাঁর ভাবনা ঘেঁটে দিয়ে আবারও একটি ফোন। বিরক্তির চরম ভেবে যখন ফোনটি তুললেন, ওপাশে মহিলাকণ্ঠ। হ্যালো বলতেই শুনলেন, আমি গার্গী চৌধুরি বলছি।

—বলুন, ম্যাডাম।

—আপনি কি একটু আগেই শেষাদ্রি হাওলাদারের কোনও ফোন পেয়েছেন?

—আপনাকেও কি উনি ফোন করেছিলেন?

—না, আমার ফোন নম্বর সম্ভবত উনি জানেন না। উনি ফোন করেছিলেন তিতিক্ষাকে। তিতিক্ষাই একটু আগে আমাকে ফোন করে বিষয়টি জানায়। শেষাদ্রি বলছেন তিনি কোনও গুলি করেননি। করেছে অন্য কেউ।

—ম্যাডাম, আপনার কি মনে হয় উনি সত্যি বলছেন?

—ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না উনি ঠিক বলছেন কি না। দুটো প্রোব্যাবলিটি হতে পারে, সত্যি বলছেন, অথবা মিথ্যে। যদি মিথ্যে হয়, সে ক্ষেত্রে আমাদের আগের অনুমানই হয়তো সঠিক। নীলার্ণব ও শেষাদ্রি দুজনেই ডুয়েল লড়েছিল, একজন সফল অন্যজন ব্যর্থ। যদি শেষাদ্রি হাওলাদারের কথা সত্যি হয়, তা হলে তৃতীয় কোনও ব্যক্তি দুটো গুলি ছুড়তে পারে। যাদের পক্ষে গুলি ছোড়া সম্ভব, তাদের মধ্যে একজন হলেন শ্রাবণকুমার।

—ম্যাডাম, শ্রাবণকুমারের পক্ষে কি নীলার্ণবকে গুলি করে হত্যা করা সম্ভব?

-হয়তো সম্ভব, হয়তো নয়। নীলার্ণব শ্রাবণকুমারের আজ্ঞাবাহী কর্মচারী মাত্র। যা করেছিল সবই শ্রাবণকুমারের হুকুমে। সে ক্ষেত্রে তাকে গুলি করবেন না শ্রাবণকুমার এটাই হয়তো বাস্তব। কিন্তু হয়তো পরিস্থিতি এমন হয়েছিল— তিতিক্ষার সঙ্গে তার মাখামাখিটা মাত্রাছাড়া হয়ে যাওয়ায় এই সুযোগে শেষাদ্রির সঙ্গে নীলার্ণবকেও পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন অগাধ বিত্তের মালিকটি। কিন্তু মি. নাগ রায়, আরও একটি সম্ভাবনার কথা মাথায় রাখতে হবে আমাদের।

—কী সম্ভাবনা, ম্যাডাম?

—তিতিক্ষার কাছে খবর পেয়েছিলাম তার একজিবিশন দেখতে সেই মুহূর্তে কম্পাউন্ডে গাড়ি নিয়ে ঢুকে পড়েছিলেন অলীকশেখর। তিনি কিন্তু তিতিক্ষার এই জীবনযাপন পছন্দ করছিলেন না।

—তার মানে?

—এমনও হতে পারে, প্রদর্শনী দেখতে এসে যখন দেখলেন তাঁর সামনে দুই শিকার, একজন তাড়া করেছে অন্যকে, সেই প্লাটিনাম সুযোগ তিনি হাতছাড়া করতে চাননি। আপনি নিশ্চয় অলীকশেখরের ভয়ংকর জীবনকাহিনির কিছুটা শুনেছেন। এরকম দুটো-চারটে নীলার্ণব-শেষাদ্রিকে তিনি নখে টিপে মারতে পারেন যখন-তখন। অতএব অলীকশেখরের কথাও মগজের কুঠুরিতে রাখা দরকার। যাই হোক, আজকের কাগজে পামেলা নাদকার্নীর ছবির প্রদর্শনীর উল্লেখ আছে। সেখানে তিতিক্ষার হাজির থাকার কথাও লেখা আছে। প্লিজ, ওখানে ক্লোজ ওয়াচ রাখার ব্যবস্থা রাখুন।

২৭

কলকাতায় এত-এত ছবির গ্যালারি হয়েছে আজকাল, তাতে নিত্যিদিন এত-এত ছবির প্রদর্শনী হয় তা যেন জেনেও জানত না গার্গী। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় রোজই প্রদর্শনীর খবর বেরোয়, তাতে প্রদর্শনীর খবরের সঙ্গে গুচ্ছগুচ্ছ শিল্পীদের নামও প্রকাশিত হয়, তা পড়ে এ রাজ্যে ছবির রমরমা বাজারের কথা যে কোনও ছবিবিমুখ পাঠকেরও জানা হয়ে যায় রোজ। গার্গীও পড়ে প্রদর্শনীর বিবরণ, কিন্তু বাস্তব চিত্রটা জেনে গেল তিতিক্ষার এখানে-ওখানে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হওয়া দেখে।

যেমন আজ পামেলা নাদকার্নী নামের শিল্পীর প্রদর্শনীতে তার যাওয়ার কোনও আগ্রহ থাকার কথাই নয়, কিন্তু ঘটনাক্রম যা দাঁড়াচ্ছে তাতে তার না-গিয়েও কোনও উপায়ম্ নাস্তি। তিতিক্ষার সঙ্গে কয়েক মিনিটের টেলি-আলাপে তার বুঝতে বাকি রইল না এ দেশের অন্যতম বিশিষ্ট শিল্পী পামেলা নাদকার্নীর ছবির সমারোহে তিতিক্ষার না-গেলেই নয় আজ সন্ধেয়। তা হলে গার্গীকেও যেতে হয় কেন না গার্গীর স্থির অনুমান তিতিক্ষাকে ঘিরে কোনও একটি নাটক অভিনীত হলেও হতে পারে।

তিতিক্ষার সাহস ও উৎসাহ দেখে গার্গী স্তম্ভিত। তিতিক্ষার জীবনযাপন এখন এক বিশাল ঋণের জালে আবর্তিত, অনেক উত্তমর্ণই তাকে অনবরত ধমকাচ্ছে, শাসাচ্ছে, মামলা করবে বলে শাণ দিচ্ছে রিট পিটিশনের খসড়া করে, কিন্তু তিতিক্ষাব তাতে তেমন ভ্রূক্ষেপ নেই যা থাকা উচিত ছিল। না কি তিতিক্ষা এখন বুঝেছে একমাত্র ছবির জগৎই তাকে পারে এই ঋণমুক্ত হতে সাহায্য করতে, তাই হাজার বিপদ তার চারদিকে ধারালো দাঁড়া বার করে তেড়ে আসছে জেনেও সে পামেলা নাদকার্নীর প্রদর্শনীতে যাবেই যাবে আজ।

ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি কমিশনার অরিজিৎ পুরকায়স্থের সঙ্গে একটু আগেই সে কথা বলে নিয়েছে পর্যাপ্ত পুলিশি ব্যবস্থা থাকছে কি না গ্যালারির আশেপাশে। গার্গীর ধারণা আজ সন্ধেয় কিছু একটা হেস্তনেস্ত হবেই হবে। সায়ন তার কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে বলল, তার মানে সেখানে একটা বিপদ আছে জেনেও তুমিও দৃঢ়চিত্ত প্রদর্শনীতে যাবেই যাবে, তাই না?

গার্গী সামান্য অপ্রস্তুত, সায়ন জানে রহস্যের সন্ধান পেলে তারও কাণ্ডজ্ঞান পাড়ি দেয় সুদূর মঙ্গলগ্রহে, তবু সায়নের স্বরে সামান্য সতর্কবার্তা। সামলে নিয়ে বলল, আমি তো আর টার্গেট নই। তিতিক্ষার মতো অসামান্যা সুন্দরীও নই যে, আমাকে লক্ষ্য করে কেউ আক্রমণ করবে।

সায়ন হাসল এবার, বলল, আমি জানি আমার স্ত্রীরত্নটি অতীব বুদ্ধিমতী। কিন্তু যেভাবে গুলিগোলা চলছে তাতে নিরীহ পথচারীরাই ঝামেলায় পড়ে।

সায়নের মনে ঘনিয়ে আসা শঙ্কার বার্তা গার্গীর বুঝতে অসুবিধে হয় তা নয়, কিন্তু তার কেন যেন মনে হচ্ছে পামেলা নাদকার্নীর প্রদর্শনীতেও কোনও হেস্তনেস্ত ঘটে যাবে আজ। বলল, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। আমি নিজের নিরাপত্তা বিষয়ে যথেষ্ট সাবধান।

সুতরাং সায়নের সতর্কবার্তাটি ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে অন্তরিন করে সন্ধে পৌনে ছ-টা নাগাদ বেরিয়ে পড়ল গোলপার্কের কাছে 'কালার ইজ লাইফ' নামের গ্যালারিটির উদ্দেশে। তার কসবার ফ্ল্যাট থেকে গোলপার্ক হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায় দূরত্বে। খুব বেশি জ্যামট্যাম হলেও ছ-টার মধ্যেই পৌঁছে যাওয়ার কথা। বিজন সেতু পার হয়ে সামান্য জ্যাম পেল বটে, কিন্তু গড়িয়াহাটের দিকে একটু এগিয়ে ড্রাইভার এমন গলিঘুঁজি ধরে পৌঁছে গেল গ্যালারির ঠিকানায় যে, তখনও ছ-টায় পৌঁছোতে পাঁচ ঘর বাকি বড়ো কাঁটাটার। একেবারে বড়ো রাস্তার উপর নয়, কিন্তু খুব ভিতরে তাও নয় বরং একটু ভিতরে হওয়ায় বেশ বড়োসড়ো স্পেস এই নতুন গ্যালারিটায়। কম্পাউন্ডে জায়গাও অনেকখানি, সেই কম্পাউন্ড ভরে গেছে দেশি-বিদেশি নানা আকারের ও নানা রঙের সুদৃশ্য গাড়িতে। একতলা-দোতলা মিলিয়ে বিশাল গ্যালারি, সাদা ধবধবে দেওয়ালগুলিতে প্রমাণ সাইজের ছবি টাঙানো।

গাড়ির ভিড়ের মধ্যে তিতিক্ষার লাল টুকটুকে গাড়িটাও চোখে পড়ল গার্গীর। বিবেক নাকি বলত, তার গাড়ির রং এমন হবে, সব গাড়ির ভিড়ে অতি অনায়াসে খুঁজে নেওয়া যাবে তারটা। সেই লাল গাড়িটার দিকে এক ঝলক চাউনি ঝরিয়ে গার্গী ভিতরে ঢুকছে, সে সময় 'হাই' বলে তিতিক্ষার জড়িয়ে ধরা গার্গীকে। তিতিক্ষার হাসি-হাসি মুখের দিকে তাকিয়ে গার্গী বলল, কতক্ষণ?

—আমি তো এক ঘন্টা হয়ে গেল এসেছি। এতক্ষণ ছবি টাঙানোর তদারকি করছিলাম। ব্রোসিওর কোথায় রাখা হবে, কীভাবে ডিস্ট্রিবিউট করা হবে, কে ডিস্ট্রিবিউট করবে সেইসব ঠিক করছিলাম। পামেলা তো এ শহরে নতুন, আমরা যদি তাকে সাহায্য না করি, কে করবে বলো?

—তা ঠিক, গার্গী সায় দেয় তার কথায়। কথা বলার মধ্যে সে দেখছিল তিতিক্ষার পরনের পোশাকটির দিকে। পায়ের চারপাশে লুটোনো ধবধবে সাদা গাউন, মাথায় সেরকমই ধবধবে হেয়ার-ব্যান্ড, গলায় হিরে-বসানো নেকলেস, তার সঙ্গে রং মিলিয়ে দু-হাতে দুধ-সাদা চুড়ি পরায় তার গায়ের ফর্সা রঙের জেল্লা ঝলসে দিচ্ছে চোখ।

তিতিক্ষা এত দামি পোশাক পরায় গার্গীর চোখে কেমন অদ্ভুত লাগছিল আজ। কী মনে হতে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, ড্রেসটা একেবারে নতুন, তাই না?

তিতিক্ষা মিষ্টি করে হাসল, হ্যাঁ, শ্রাবণকুমার প্রেজেন্ট করলেন সেদিন।

গার্গী অবাক হল তা নয়, কিন্তু তার মনের জিজ্ঞাসা নিরসন করতে আবার জানতে চাইল, তোমার পাওনাগণ্ডা সব পেয়ে গেছ শ্রাবণকুমারের কাছ থেকে?

তিতিক্ষা সামান্য ম্লান হয়, ঘাড় নাড়ে. না। তবে শিগগির দিয়ে দেবে বলেছে।

শ্রাবণকুমারের উপর তিতিক্ষার অগাধ আস্থা দেখে গার্গীর মনে সামান্য দ্বিধা-মেশানো বিস্ময়। যতদূর সে জেনেছে, এখনও তার প্রাপ্যের প্রায় কোনও টাকাই দেয়নি ধনকুবের বলে পরিচয় দেওয়া লোকটি। তিতিক্ষার পিঠে আদর-ছোঁয়া হাত রেখে গার্গী বলল, চলো, প্রদর্শনীর সময় হয়ে এল বোধহয়।

গ্যালারিতে ঢোকার ঠিক মুখে একটি বিশাল প্রদীপ সরষের তেলে চুবচুবে সলতেসহ অপেক্ষমান উদ্বোধকের জন্য। প্রদীপের সামনে বেশ কিছু ভি আই পি চেহারার নারীপুরুষ দাঁড়িয়ে, সম্ভবত তাঁদের চেয়েও বড়ো কোনও ভি আই পি-র প্রতীক্ষায়। তাঁদের মধ্যে যে-মহিলা সবচেয়ে সেজেগুজে নিজেকে প্রোজেক্ট করতে প্রস্তুত তিনিই নিশ্চয় আজকের প্রদর্শনীর শিল্পী।

পামেলা নাদকার্নী সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না গার্গীর, কিন্তু গ্যালারির সামনে অপেক্ষমান গাড়ি ও ভি আই পি-দের ভিড় দেখে অনুমান করে নেয় বেশ ঘ্যামা শিল্পী। গ্যালারিতে ঢোকার মুখে মাঝবয়সী মহিলার দামি পোশাক ও রূপসচেতনতা তার সেই ভাবনাকে গাঢ়তর করল আরও। ডাবছাঁদের আধাফর্সা মুখ, পরনে পিস্তিরঙের ঝকঝকে শাড়ির সঙ্গে ম্যাচিং ব্লাউজ। গলার নেকলেসে পর্যাপ্ত হিরের সম্ভার। শাড়ি পরার ঢং একটু অবাঙালি ধরনের হওয়ায় তাঁর ব্যাক্তিত্ব সম্পূর্ণ অন্যরকম লাগছিল গার্গীর চোখে। ঝকঝকে দাঁতের হাসিটিও যেন লক্ষ টাকা মূল্যের।

যার জন্য এত সাদর ও সাগ্রহ অপেক্ষা সেই ভি ভি আই পি-র আগমন ঘটতেই শুরু হয়ে গেল প্রদীপ জ্বালানো ও অতিথিদের সংক্ষিপ্ত বক্তৃতাপর্ব। প্রদর্শনীর উদ্বোধন হতেই গ্যালারির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল সুবেশ নারীপুরুষের ভিড়। খুবই চেনা ছক ছবির প্রদর্শনী উদ্বোধনের দৃশ্যে। এই উপলক্ষে গ্যালারিতে আগমন ঘটে তাবৎ শিল্প-সমালোচক ও অন্যান্য বিশিষ্টজনের। সম্ভাব্য ক্রেতারাও থাকেন ভিড়ের মধ্যে। এঁরা সবাই শিল্পীর পরম অতিথি।

গার্গী ক্রেতাও নয়, শিল্প-সমালোচকও নয়, আপাতত দর্শকমাত্র। নিজেকে তিতিক্ষার শুভানুধ্যায়ীও বলতে পারে গার্গী। প্রদীপ-জ্বালানোপর্ব শেষ হতেই সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল ছবি দেখতে। গার্গীও ঘুরেঘুরে দেখছে ছবিগুলো। হয়তো একেই বলে অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট কেন না কোনও ছবিই সোজাসাপ্টা চোখে দেখে বোধগম্য করা যায় না তার অর্থ। কোনও ছবিতে বিশাল মুশকো চেহারার একটি কালো রঙের ষাঁড়ের তেড়ে গুঁতোতে আসা অবয়ব, তার চোখদুটি রক্তলাল, দুটি শিং-এর উপর গজিয়ে উঠেছে দুটি নীল ফুল। কোনও ছবিতে একটি নগ্নিকা, তার বুকে স্তন

নেই পরিবর্তে রঙিন ফুলে-ফুলে ভরা দুটি গোল বাস্কেট। কোনও ছবিতে একটি পুরোনো রাজবাড়ি, তার চিলেকোঠার ঘরের ছাদে একটি অশত্থচারা ক্রমে বড়ো হয়ে উঠেছে অনেকখানি, তার সবুজ পাতায় ভরা ডালে অজস্র মেয়ের মুখ, যেন মেয়েগুলি ফুলের মতো ফুটে আছে ডালে ডালে। চড়া রঙের ব্যবহারে ছবিগুলি দেখতে কেমন শিহরন জাগে শরীরে।

এমন গভীর তন্ময়তায় ছবিগুলি দেখার ফাঁকে গার্গী নজর রাখছে প্রদর্শনীতে প্রবহমান ঘটনাবলির দিকে। তার সবচেয়ে নজরে পড়ছে অদ্ভুত চেহারার এক শিল্পরসিকের দিকে। মাঝারি উচ্চতার লোকটি পায়ে উঁচু হিলের শু পরে লম্বা সাজার ব্যর্থ প্রচেষ্টা। জাপানি মেয়েরা যে-ধরনের ঈষৎ-বাঁকানো টুপি পরে, সেরকমই একটি টুপি পরেছেন মাথায়। টুপির পিছনদিকে লম্বা লম্বা চুলেব কোঁকড়াভাবটা নজর-কাড়ার মতো। চওড়া গোঁফের রং অস্বাভাবিক কালো। যাত্রাব রাজারাজড়াদের চুল বা গোঁফ যেরকমটি হয়ে থাকে। তিনি কথা বলছিলেন উচ্চগ্রামে, কিন্তু ইংরেজিতে, সেই ইংরেজি উচ্চারণ শুনে বোঝা যায় লোকটির গায়ে আমেরিকার গন্ধ আছে।

লোকটির উপর যখন নজর রাখছে গার্গী, হঠাৎ তারই কাছে এসে লোকটি সেই একই ইংরেজি টানে জিজ্ঞাসা করল, পামেলা নাদকার্নী ফ্যান্টাস্টিক এঁকেছে, কী বলেন?

গার্গী লোকটিকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়ে বলল, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি বাঙালি। ইংরেজিতে কথা বলছেন কেন?

লোকটি হকচকিয়ে তার কাছ থেকে সরে গিয়ে অন্য একটি লোকের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে তক্ষুনি। গার্গী মুচকি হাসল একটু। শেষাদ্রি হাওলাদার হঠাৎ এরকম ছদ্মবেশে কেন এসেছেন তা নিয়ে ভাবল এক মুহূর্ত। তাকে পুলিশ খুঁজছে, চিনতে পারলেই পুলিশ তাকে গ্রেফতার করবে সেই কারণেই তার এই অন্য বেশ ধারণ করা। কিন্তু শেষাদ্রি হাওলাদারের ছদ্মবেশ তেমন জাঁকালো হয়নি যে তিনি নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারবেন সন্ধানী চোখের আওতা থেকে।

গার্গী বুঝতে চাইছিল চারদিকে বিপদ থাকা সত্ত্বেও কেন আজকের প্রদর্শনীতে আসতে হল শেষাদ্রিকে! গার্গীর সঙ্গে ডি সি ডি ডি-র যা কথা হয়েছে তাতে আজ বহু সাদা পোশাকের পুলিশ উপস্থিত থাকার কথা। প্রদর্শনীতে উপস্থিত কয়েকজন দর্শকের মুখ দেখে অনুমানও করতে পারছে এরা সবাই সাদা পোশাকের পুলিশ। শেষাদ্রি কি তা অনুমান করতে পেরেছেন, হয়তো পেরেছেন, তবু কেন যে—

তা হলে কি শেষাদ্রির অন্য কোনও মতলব আছে যা তিনি ঘটাতে চান ছদ্মবেশে প্রদর্শনীতে এসে! লোকটার বুকের পাটা আছে নিঃসন্দেহে। না কি মরিয়া হয়েই আজ তার প্রদর্শনীতে আসা।

তিতিক্ষাও ঘুরে ঘুরে দেখছিল ছবিগুলো, এক বিদেশি মহিলার সঙ্গে দেখা হতে হাই বলে তাকে জড়িয়ে ধরে তার গালে একটা চুমুও দিয়ে দিল বিদেশি কায়দায়। তাকে কয়েকটা ছবির গুণাগুণও বর্ণনা করছে তাও শুনতে পেল গার্গী, হঠাৎ তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গার্গীর কাছে এসে বলল, গার্গীদি, শেষাদ্রিদা এসেছেন এই গ্যালারিতে। দেখেছেন?

তিতিক্ষার গলায় শঙ্কার স্বর, গার্গী মাথা নাড়ে, দেখছি তো?

—কী মতলবে এসেছে কে জানে! শ্রাবণকুমারেরও আসার কথার আজ।

—শ্রাবণকুমার আসবেন নাকি?

—হ্যাঁ, তাই তো বললেন। আসলে এই ড্রেসটা সদ্য প্রেজেন্ট করেছেন আমাকে। আজই প্রথম পরলাম। তা বললেন, ঠিক আছে, আমি একজিবিশন দেখতে আসব, সেই সুযোগে ড্রেসটা পরে তোমাকে কেমন দেখাচ্ছে তাও দেখে আসব।

গার্গী আশ্চর্য হচ্ছিল তিতিক্ষার কথায়। শ্রাবণকুমারের সঙ্গে তার বোধহয় অ্যাফেয়ার চলছে, তাই তিতিক্ষার স্বরে এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ লক্ষ করছে শ্রাবণকুমার সম্পর্কে কিছু বলতে গিয়ে।

তিতিক্ষার সঙ্গে যখন কথোপকথনে ব্যস্ত গার্গী সে সময় শেষাদ্রিকে আর দেখতে পেল না প্রদর্শনীকক্ষে। তা হলে কি পুলিশের উপস্থিতি বুঝতে পেরে সবার অলক্ষ্যে উধাও হয়ে গেলেন শেষাদ্রি! তিতিক্ষাও বিষয়টা অনুমান করে স্বস্তির শ্বাস ফেলল যেন, বলল, বুঝলে গার্গীদি, লোকটা ভীষণ ডিস্টার্ব করছে আমাকে। মোবাইল বদলেও রেহাই নেই। এখন বেশি রাতে ল্যান্ড লাইনে ফোন করে বলছে, 'তিতি, আই ওয়ান্ট ইউ। অ্যাট এনি কস্ট।' যা মুশকিলে পড়েছি, কী বলব তোমাকে!

গার্গী কিন্তু স্বস্তির শ্বাস ফেলতে পারল না শেষাদ্রির গা ঢাকা দেওয়ায়। তার ধারণা ছিল সাদা পোশাকের পুলিশেরা ঠিকই চিনতে পারবে শেষাদ্রিকে, তারপর গ্রেফতার করবে ঠিক-ঠিক সময়ে। কিন্তু কী আশ্চর্য, সবার চোখের সামনে দিয়ে পালিয়ে গেলেন শেষাদ্রি হাওলাদার!

প্রদর্শনীকক্ষে তখন ভিড় বেড়েছে আরও, হঠাৎ বাইরে হইচই শুনে গার্গী উৎকর্ণ হয়, কম্পাউন্ড থেকেই আসছে শব্দটা। একটু পরেই কোলাহলের শব্দ বেশ উচ্চকিত হওয়ায় কেউ কেউ বাইরে গেলেন ব্যাপারটা কী ঘটছে তা দেখতে। একটু পরেই খুন খুন শব্দটা হাওয়ায় চারিয়ে যেতে গার্গীর বুকের ভিতর ছাঁত করে ওঠে। অন্যদের সঙ্গে সেও বাইরে গিয়ে দেখতে পায় ঘন নীল রঙের খুব দামি শেরওয়ানি আর কুর্তা পরে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে একজন লম্বা চওড়া চেহারার মানুষ। কাছে গিয়ে গার্গীর অনুমান সত্যি হয়। লোকটি শ্রাবণকুমার।

২৮

বিশাল ধনকুবের বলে ইতিমধ্যে কলকাতার শিল্পরসিকদের মধ্যে পরিচিত হয়ে ওঠা শ্রাবণকুমার নামের মানুষটি এভাবে কম্পাউন্ডের মেঝেয় লুটিয়ে রয়েছেন দেখে রীতিমতো স্তম্ভিত সবাই। কাছে গিয়ে গার্গীও দেখল রক্তে ভেসে যাচ্ছে বড়োসড়ো শরীরটা। হয়তো একটু আগেই প্রাণ ছিল শরীরে, কিন্তু প্রায় কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে নিস্তেজ তাঁর দেহ।

সাদা পোশাকের পুলিশদের মধ্যে অফিসারগোছের একজন মাঝারি উচ্চতার স্মার্টদর্শন যুবক হঠাৎ বললেন, ওই তো কালপ্রিট পালাচ্ছে।

গার্গীরও চোখে পড়ল একটি বরফসাদা দামি গাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে কম্পাউন্ড থেকে। কিন্তু কেউ কিছু করার আগেই গাড়িটা হুশ করে উধাও হয়ে গেল সকলের চোখের সামনে দিয়ে।

স্মার্টদর্শন যুবকটি আর এক সাদা পোশাকের পুলিশের উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠে বললেন, রক্ষিত, ফলো হিম। ইমিডিয়েটলি।

রক্ষিত নামের লম্বা, সুদর্শন একজন যুবক চকিতে লাফ দিয়ে বেরিয়ে গেল কম্পাউন্ডের বাইরে, সেখানে দাঁড় করানো ছিল একটি কালো অ্যাম্বাসাডার, তাতে উঠে বসতেই আরও একজন মাঝারি উচ্চতার যুবকও উঠে বসল সামনে, সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটি বিদ্যুতের মতো ধাওয়া করল আগের গাড়িটিকে। কিছুক্ষণ রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতি। পরক্ষণে স্মার্টদর্শন সাদা পোশাকের পুলিশ অফিসারটি অন্য একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, পাল, গাড়িটার নম্বর নোট করেছ?

পাল নামের প্রৌঢ় লোকটি বললেন, শেষ তিনটে নম্বর পড়তে পেরেছি, জিরো ওয়ান সিক্স।

—রাবিশ, শেষ তিনটে নম্বর দিয়ে কি কোনও গাড়িকে আইডেন্টিফাই করা যায়!

পাল নামের প্রৌঢ়টিকে অপ্রস্তুত দেখায়, আমি দেখছি সামনের ট্রাফিক সার্জেন্টকে অ্যালার্ট করে দেওয়া যায় কি না! বলে পকেট থেকে মোবাইল বার করে বোতাম টিপতে শুরু করেন।

—তোমার লাইন পাওয়ার আগেই কালপ্রিট হাওয়া যয়ে যাবে, রাবিশ! কিন্তু সবার চোখের সামনে একজন গুলি চালাল, কেউ দেখতে পায়নি কালপ্রিটকে?

পালবাবুর মুখ শুকিয়ে এতটুকুন, বললেন, ওই নীলরঙের শেরওয়ানি পরা লোকটি নামলেন মভ কালারের গাড়িটা থেকে। তিনি হনহন করে ঢুকছেন একজিবিশনের দিকে, হঠাৎ সাদা গাড়িটা তার পিছু পিছু ঢুকে পড়ায় আড়াল পড়ে গেল শেরওয়ানি। তার মধ্যেই কেউ গুলি চালিয়েছে।

মভ রঙের গাড়িটা তখনও দাঁড়িয়ে কম্পাউন্ডে। তার ড্রাইভার বেরিয়ে এই দৃশ্য দেখে মাথাকপাল চাপড়ে চেঁচাচ্ছে তখন।

—রাবিশ। তা হলে নিশ্চয় সাদা গাড়ি থেকে কেউ গুলি চালিয়েছে!

—আমি চকোলেট গাড়িটার ওপাশে থাকায় দেখতে পাইনি ঘটনাটা। ঠিক বুঝতে পারিনি কোথা থেকে গুলিটা ছুটে এল হঠৎ। এক সেকেন্ডের মধ্যে ঘটে গেছে সব।

—রাবিশ! গুলি চালাতে এক সেকেন্ডই লাগে। কিন্তু কেউ দেখতে পায়নি এখানে! এতজন লোক ছিল এখানে! এতজন ড্রাইভার! কেউ দেখেনি?

কিছুক্ষণ থমথম করে জায়গাটা। স্তব্ধতা ভেঙে হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে কেউ একজন বলে উঠল, ওই সাদা গাড়ি থেকেই কেউ গুলি চালিয়েছে মনে হল।

—তা হলে ঠিকই ধরেছি, স্মার্টদর্শন নিজের কৃতিত্বে উল্লসিত হলেন, পরক্ষণে, কে বললেন কথাটা? কে বললেন? উত্তর দিচ্ছেন না কেন? কেউ চোখে দেখে থাকলে বলুন ঠিক করে!

বারবার বলার পরেও কেউ উত্তর না-দেওয়ায় মুখ বিকৃত করে বললেন , 'রাবিশ!' তারপর বললেন, পাল, দেখো তো কে বলল কথাটা? স্পট হিম।

যিনি বারবার রাবিশ-রাবিশ বলছেন সেই স্মার্টদর্শন যুবকটির বয়স চল্লিশের নীচেই হবে, সম্ভবত অফিসার হবেন, কিন্তু পাল নামের লোকটির বয়স অন্তত পঞ্চাশের ওপর, তা সত্ত্বেও পালকে তুমি-তুমি বলায় আশ্চর্য হচ্ছিল গার্গী। সে শুনেছে পুলিশের মধ্যে হায়ারার্কি বিষয়টা এমনই অদ্ভুত। কোনও জুনিয়র বয়স্ক মানুষকেও নাকি অবলীলায় তুমি বলে থাকেন তাঁর সিনিয়র কোনও কমবয়স্ক অফিসার। তবে সবাই বলেন তা নয়।

স্মার্টদর্শন যুবকটি ততক্ষণে হাঁকডাক শুরু করে দিয়েছেন শ্রাবণকুমারের অবস্থা দেখে। 'এখনই হসপিটালাইজড করা দরকার' বললেও তিনিও বুঝে গেছেন শ্রাবণকুমার আর বেঁচে নেই।

সঙ্গে সঙ্গে বাইরে দাঁড়ানো পুলিশের একটি জিপে শ্রাবণকুমারের নিস্পন্দ শরীরটা তুলে নিয়ে দ্রুত হাসপাতালের দিকে রওনা হয়ে গেল যত দ্রুত সম্ভব।

তিতিক্ষা বেরিয়ে হঠাৎ শ্রাবণকুমারকে ওভাবে পড়ে থাকতে দেখে এমন বীভৎস স্বরে, ' এ কি!' বলে চেঁচিয়ে উঠে সেই যে চুপ হয়ে গেছে, তার গলায় আর স্বর বেরোল না।

গার্গী ছুটে গিয়ে প্রায় স্থাণু হয়ে যাওয়া তিতিক্ষার শরীরটাকে ধরে নিয়ে গেল প্রদর্শনীকক্ষের ভিতর। তার প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল হয়তো অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে তিতিক্ষা। তার শোকাহত মুখের দিকে তাকাতেই পারছে না গার্গী। চারপাশে

ঋণের বোঝা যখন ক্রমশ পর্বত হয়ে উঠছে তার কাঁধে, সেসময় শ্রাবণকুমারই তাকে দেখাচ্ছিলেন ঋণমুক্ত হওয়ার স্বপ্ন। কী জানি শ্রাবণকুমারের কাছে প্রাপ্য সব টাকা পেলে এ যাত্রা হয়তো বেঁচেও যেত তিতিক্ষা। কিন্তু এখন যা ঘটল তাতে তিতিক্ষার জীবনে ঘনিয়ে এল আরও ঘোরতর সংকট।

গার্গী তাকে নিয়ে গেল কাছেই পেতে রাখা চেয়ারের কাছে, চেয়ারে বসিয়ে দিতেই ছুটে এলেন পামেলা নাদকার্নী। মারাঠি ভদ্রমহিলাও ভীষণ শক পেয়েছেন হঠাৎ এই বীভৎস কাণ্ড ঘটে যাওয়াতে। তিনিও কথা বলতে পারছেন না ভয়ে, আতঙ্কে। তাঁকে দেখে গার্গী একটু বল পায়, পামেলা, প্লিজ টেক কেয়ার অফ হার। আই উইল বি কামিং ব্যাক সুন।

গার্গী দ্রুত বেরিয়ে এল কম্পাউন্ডে যেখানে তখন ভাগ-ভাগ হয়ে এখানে ওখানে জটলা চলছে, আলোচনা চলছে শ্রাবণকুমারকে কেন্দ্র করেই।

গার্গী স্তম্ভিত হয়ে ভাবছিল মাত্র দু-দিন আগে ঠিক একই রকমভাবে প্রদর্শনীর উদ্বোধনদিবসে খুন হয়েছিল নীলার্ণব। আর কী আশ্চর্য, আজ শ্রাবণকুমারও কি না-

কিন্তু ঘটনাটা কীভাবে ঘটল তা ভেবে দিশে পাচ্ছিল না গার্গী। চারপাশে এত-এত পুলিশ, তাদের সবার চোখের সামনে দিয়ে ঘটে গেল এত বড়ো একটা ঘটনা তা সত্যিই বিস্ময়ের! কিন্তু কী করে গুলিবিদ্ধ হলেন শ্রাবণকুমার!

সত্যিই আশ্চর্য! গতদিনের মতো একই ভাবে আরও একজনের গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনাটিকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না গার্গী। তিতিক্ষা প্রায় জোর করেই এসেছিল আজকের প্রদর্শনীতে। সে না এলে হয়তো ঘটত না এরকম একটা পরিণতি। কথাটা ভাবতেই কয়েক মুহূর্ত গার্গী বিরক্ত হচ্ছিল তিতিক্ষার উপর। তার জেদের ফলেই তো—

পরের মুহূর্তে গার্গী নিশ্চিত হল আজ না হলেও কাল ঘটত এসব। কাল না-হলেও পরশু। ঘটতই তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কেন কেউ কিছুতেই আটকাতে পারল না আজকের ঘটনাটা! পুলিশকে সতর্ক করে দেওয়ার পরেও নিবৃত্ত করতে পারল না শ্রাবণকুমারের গুলিবিদ্ধ হওয়া!

গার্গী ভাবতে বসল শ্রাবণকুমারের গুলিবিদ্ধ হওয়ার পরম্পরা। একটু আগেই তারা দেখেছিল ছদ্মবেশ ধারণ করে প্রদর্শনীকক্ষে ঘুরছেন শেষাদ্রি হাওলাদার। হঠাৎ তাঁর উধাও হওয়া, ঠিক তার কয়েক মুহূর্ত পরেই গুলির শব্দ, শ্রাবণকুমারের মেঝেয় লুটিয়ে পড়া, এর মধ্যে কি একটা যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে!

এত-এত লোকের চোখের সামনে কীভাবে শেষাদ্রি করতে পারলেন এই ভয়ংকর কাজটি। তিনি কি প্রদর্শনীকক্ষ থেকে বেরিয়ে অপেক্ষা করছিলেন শ্রাবণকুমারের জন্য। প্রদর্শনীকক্ষে ঘোরাঘুরি করে তিনি যখন নিশ্চিত হলেন

শ্রাবণকুমার তখনও আসেননি প্রদর্শনী দেখতে, তখনই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করবেন শ্রাবণকুমারের জন্য! শেষাদ্রি কী করে জানলেন আজ শ্রাবণকুমার আসবেন পামেলা নাদকার্নীর প্রদর্শনী দেখতে! শ্রাবণকুমারেব তো আজ এখানে আসার কথা নয়! না কি শেষাদ্রি অনুমান করেছিলেন যারা শিল্পরসিক তাঁরা কোনও প্রদর্শনী হলেই আসেন নতুন কী ছবি এসেছে তা দেখতে, তাই শ্রাবণকুমারও আসবেন।

গার্গীর হঠাৎ স্মরণে আসে আজকের কাগজে পামেলা নাদকার্নীর ছবির প্রদর্শনীর যে-বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে তাতে অন্য গুণিজনের সঙ্গে বিশিষ্ট শিল্পী তিতিক্ষা দ্বিবেদীর নামও ছাপা হযেছে বড়ো বড়ো অক্ষরে। শেষাদ্রি নিশ্চয় দেখেছেন বিজ্ঞাপন, দেখেই বুঝেছিলেন তিতিক্ষা প্রদর্শনীতে এলে অনিবার্যভাবেই শ্রাবণকুমারও আসবেন। সেই কারণেই তিনি তাঁর প্রাণনাশের আশঙ্কা উপেক্ষা করেও এসেছিলেন একটা গভীর উদ্দেশ্য নিয়েই। সেই উদ্দেশ্য কি শ্রাবণকুমারকে হত্যা করা!

আজকের ঘটনাক্রম তা-ই প্রমাণ করতে চাইবে। যদি সেটাই তাঁর উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে সেই লক্ষ্যে তিনি উপনীত। অতঃপর তাঁর পরিণতি কী হবে তা আইন বলবে।

গার্গী বিস্মিত হচ্ছিল শেষাদ্রি হাওলাদারের কথা ভেবে। তিতিক্ষার দিকে লোভীর হাত বাড়িয়ে তিনি শেষপর্যন্ত নিজেকে জড়িয়ে ফেললেন এক জটিল মামলার মধ্যে! না কি কোনও বিবেচনা ছাড়াই তিনি শ্রাবণকুমারের সঙ্গে লড়াইয়ে নেমেছিলেন তিতিক্ষাকে দখল করবেন বলে! দখল করতে পারুন বা না-ই পারুন অন্তত শ্রাবণকুমারকে সরিয়ে দিতে পেরেছেন আজ।

কিন্তু খটকা একটা রয়েই গেল গার্গীর মনে। স্মার্টদর্শন পুলিশ অফিসার যে-সাদা গাড়িটির পিছনে পুলিশ পাঠালেন ধরতে, সেটি শেষাদ্রি হাওলাদারের নয়। শেষাদ্রির গাড়ির রং যতদূর গার্গী মনে করতে পারছে বট্‌ল্ গ্রিন কালারের। সেই গাড়িটি কখন প্রস্থান করেছে, না কি গাড়ির ভিড়ের মধ্যে আছে কোথাও সে-খবরটা নেওয়াও জরুরি। কম্পাউন্ডে না-থেকে বাইরে রাস্তার উপরও থাকতে পারে শেষাদ্রির অপেক্ষায়। তবে এই ঘটনার পরে শেষাদ্রির পক্ষে এখানে না-থাকাটাই স্বাভাবিক।

মোবাইলে খবর পেয়ে ততক্ষণে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছেছেন ডি সি ডি ডি অরিজিৎ পুরকায়স্থ। তাঁকে স্পষ্টতই বিপর্যস্ত দেখাচ্ছিল খুব। স্মার্টদর্শন পুলিশ অফিসারটিকে দেখেই বললেন, কী ব্যাপার, শাসমল, সবার সামনে গুলি চালিয়ে মার্ডার করছে খুনি, আর তোমাদের ফোর্সের চোখে পড়ছে না কারও! হাউ ফানি!

শাসমল নামের যুবক স্পষ্টতই তোতলাতে শুরু করেন, না স্যার, মানে স্যার, রাতের বেলা অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে ঘটনাটা ঘটাচ্ছে মার্ডারার।

—কোথায় অন্ধকার! আগের দিন তবু কিছুটা কম ছিল আলো। আজ তো দিনের আলোকেও হার খাওয়াচ্ছে এই বিল্ডিঙের পাঁচশো-হাজার পাওয়ারের হ্যালোজেনগুলো।

হঠাৎ গার্গীকে দেখে এগিয়ে এলেন অরিজিৎ, গুড ইভনিং, ম্যাডাম, অ্যানাদার মার্ডার!

—আপনাকে তো বলেছিলাম, মি. পুরকায়স্থ, আজ একটা হেস্তনেস্ত করতে চাইবে অপরাধী।

—কিন্তু অপরাধী খুব ডেঞ্জারাস। শ্রুড অ্যান্ড কানিং।

একসঙ্গে অনেকগুলি বিশেষণ ব্যবহার করেও ডেপুটি কমিশনার সাহেবের রাগ মিটল না বোধহয়। দাঁত কিড়মিড় করে বললেন, ডিজগাস্টিং। কিন্তু একবার বাগে পেলে বুঝিয়ে দেব একটা ধানে ক-টা মুড়ি হয়!

গার্গী চোখের ইশারায় বলল, কিন্তু মি. শাসমল তো পুলিশের গাড়ি পাঠালেন একটা হোয়াইট গাড়িকে ফলো করতে।

—সে গাড়ি ফিরে এসেছে। হোয়াইট গাড়িটা অলীকশেখরের। কিন্তু গাড়িতে আরোহী ছিল না।

গার্গী বিস্মিত হয়, তা হলে গাড়িটা এসেছিল কেন এখানে?

—ড্রাইভারের কী নাকি বলার ছিল মিসেস দ্বিবেদীকে। কিন্তু কম্পাউন্ডে গোলমাল দেখে ভয়ে কেটে পড়ে। পুলিশ তাড়া করেছে দেখে থেমে যায় মাঝপথে। তখনই জানায় তার কোনও দোষ নেই। ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল ওভাবে।

—কী অদ্ভুত! গার্গী বিড়বিড় করে, নীলার্ণব যেদিন খুন হয় সেদিনও কিন্তু অলীকশেখরের গাড়ি এসেছিল প্রদর্শনীতে। সেদিন অলীকশেখর নিজেই ছিলেন গাড়িতে। গুলি চলার পর তাঁর গাড়ি ফিরে গিয়েছিল একইভাবে।

অরিজিৎ শুনতে পেলেন গার্গীর বিড়বিড়ানি, বললেন, আপনার কি মনে হয় অলীকশেখরই ঘটাচ্ছেন এত সব?

গার্গী মাথা ঝাঁকায়, কিছুই বুঝতে পারছি না। কিন্তু তাঁর গাড়ি আসছে কেন নির্দিষ্ট দিনগুলিতে?

তার কথা শেষ না-হতেই একজন ড্রাইভার হঠাৎ তার গাড়ি থেকে নেমে এসে কুড়িয়ে নিল কাছেই পড়ে থাকা একটি রুমাল, সেটি ডি সি ডি ডি-র হাতে দিতেই গার্গীও দেখল কফিন রঙের রুমালটির মধ্যে একটুকরো কাগজে লেখা আছে, মৃত্যুই তোমার উপযুক্ত শাস্তি।

২৯

—স্ট্রেঞ্জ! সেই একই রঙের রুমাল, ভিতরে একই রকম লেখা। হাতের লেখাও একই। বিড়বিড় করছিলেন ডেপুটি কমিশনার অরিজিৎ পুরকায়স্থ, এর পরেও যদি আমরা খুনিকে না ধরতে পারি তা হলে খুব লজ্জার বিষয়! শেষ পর্যন্ত সবার চোখের সামনে মার্ডারার গুলি চালিয়ে একটার পর একটা লোক মারছে, অ্যান্ড উই আর জাস্ট স্পেক্টেটরস! শাসমল, উই শুড বি অ্যাশেমড অফ!

শাসমল নামের অফিসারটি মুখ লাল করে দাঁড়িয়ে আছেন ডি সি ডি ডি-র সামনে। বললেন, স্যার, শেষাদ্রি হাওলাদারের গাড়ি কখন যে টুক করে কেটে পড়েছে কেউ দেখতেই পায়নি।

—কোথায় ছিল গাড়িটা?

—স্যার, কম্পাউন্ডের বাইরে। ভিতরে ঢুকলে চট করে বেরোতে পারবে না জেনে বাইরে রেখে ঢুকেছিল কম্পাউন্ডে।

অরিজিৎ পুরকায়স্থ রাগে গজরাচ্ছেন অধস্তন পুলিশ অফিসারদের দিকে রক্তবর্ণ চোখে তাকিয়ে। বললেন, আগাম খবর ছিল আজ কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলেও ঘটতে পারে। তারপরও যদি সিস্টেম ফেল করে, তা হলে তার কোনও এক্সপ্লানেশন হয়?

গ্যালারির সামনের কম্পাউন্ড তখন ভেসে যাচ্ছে রক্তে। 'কালার ইজ লাইফ' নামের গ্যালারিটির সামনে দাঁড়িয়ে তখন গলগল করে ঘামছে গার্গী। জীবন তো রঙিনই, কিন্তু তার রং যখন হয়ে ওঠে রক্তের রং, জীবনের মানে পর্যবসিত হয় অন্য রঙে। গার্গী অনুমান করছে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে এই আগাম সংবাদটি সে-ই দিয়েছিল অরিজিৎকে, তারপরও পুলিশের অপদার্থতা প্রমাণিত হওয়ায় তিনি আর মুখ দেখাতে পারছেন না গার্গীর কাছে। শাসমলের দিকে তাকিয়ে প্রায় হুঙ্কার দিয়ে বললেন, শেষাদ্রি হাওলাদারের বটল গ্রিন রঙের গাড়িটি কখন এখানে এসেছিল, কখন চলে গেছে, কোন দিক থেকে এসেছিল, কোন দিকে গেল তার সম্ভাব্য সময় ও গতিবিধি দিতে বলো তোমার গোয়েন্দা অফিসারদের।

—ও কে, স্যার।

ডি সি ডি ডি অরিজিৎ পুরকায়স্থ তখনও দু-চোখে বিস্ময় মেখে তাকিয়ে আছেন হাতের লেডিজ রুমালটির দিকে। গার্গীর দিকে চোখ ফেরালেন, কী যেন রং বললেন রুমালটির? কফিন রং? এরকম আবার হয় নাকি রং!

গার্গীর ভিতরেও থইথই করছিল বিস্ময়ের সম্ভার, ম্লান হেসে বলল, জানেন, শ্রাবণকুমারেরই পছন্দের রং এটা। তিনিই এই রঙের গুচ্ছ গুচ্ছ রুমাল উপহার দিয়ে থাকেন তাঁর প্রিয়জনদের।

অরিজিৎ তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছেন রুমালটি ও তার ভিতরের কাগজখণ্ডটির দিকে, বিড়বিড় করে বললেন, কাকে কাকে উপহার দিয়েছিলেন এই রুমাল?

গার্গী একঝলক নজর ফেলে অদূরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকা তিতিক্ষার দিকে, তারপর বলল, নিশ্চয় অনেকেই পেয়েছে এই রুমাল। তাঁর কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যারাই যুক্ত, প্রত্যেককেই উপহার দিতেন এই রুমাল।

—স্ট্রেঞ্জ!

—সত্যিই অবাক করা কাণ্ড ঘটে গেল আজ 'কালার ইন লাইফ' গ্যালারির সামনে। যাই হোক, এখানে যারা উপস্থিত আছেন তাদের সবাইকার সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়াটা আমাদের জরুরি। বিশেষ করে দু-দিনই কে কে এসেছিলেন তার একটি তালিকাও প্রয়োজন। তা ছাড়া অলীকশেখরের গাড়ির ড্রাইভারকেও ডেকে পাঠান, মি. পুরকায়স্থ।

—রাইট ইউ আর? হঠাৎ কেন একটি খালি গাড়ি এসেছিল, গণ্ডগোল দেখে পালিয়ে গেল হঠাৎ, খুব মিস্টেরিয়াস মনে হচ্ছে কিন্তু। ড্রাইভারসহ গাড়িটা তখনই ধরে আনা উচিত ছিল। রাস্কেলরা মাথায় বুদ্ধি খাটিয়ে ধরে আনতে পারেনি গাড়িটা। খালি গাড়ি দেখে ছেড়ে দিয়েছে ড্রাইভারকে। অ্যাই সুনীথ পাল, এখনই হোয়াইট কারের ড্রাইভারকে ধরে আনতে বল? ইমিডিয়েট।

পুলিশের যে-গাড়িটা হোয়াইট কারকে অনুসরণ করেছিল একটু আগে, আবার চাকায় ঝড় তুলে বেরিয়ে গেল সেই গাড়িটাকে ধরে আনতে।

গার্গী আবার গলা নামায়, মি. পুরকায়স্থ, একটা জিনিস আমরা লক্ষ করছি, দুটি খুনের ঘটনা ঘটল একই পরিস্থিতিতে। দুদিন দুই গ্যালারিতে ছবির প্রদর্শনী চলাকালীন ঘটছে খুনের ঘটনা। অর্থাৎ সম্ভবত একই লোক খুন করছে যার সঙ্গে ছবির প্রদর্শনীর যোগ আছে কোনওভাবে। এও হতে পারে খুনি কিন্তু আমাদের খুব চেনা।

—চেনা বলেই মনে হচ্ছে। ইন অল প্রোব্যাবলিটি দুজনকে সন্দেহের তালিকায় রাখা যায়।

গার্গী চোখে বিস্ময় জড়িয়ে শুনতে চাইল ডাকসাইটে পুলিশ অফিসারের অনুমান।

—নাম্বার ওয়ান শেষাদ্রি হাওলাদার। শেষাদ্রি হাওলাদারের খুনি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। রাইট ফ্রম দি মার্ডার অফ বিবেক দ্বিবেদী, শেষাদ্রিই জড়িত এই সিরিয়াল মার্ডারে!

'সিরিয়াল মার্ডার' শব্দবন্ধটি বহুল পরিচিত। গার্গীও খেয়াল করেনি এই ক-দিনের মধ্যে তিন-তিনটে খুনের ঘটনা ঘটে গেল চোখের সামনে।

—আসলে কি মনে হচ্ছে জানেন, ম্যাডাম, শেষাদ্রি অনেক আগেই চলে এসেছে আমেরিকা থেকে। বিবেক দ্বিবেদীকে বহু টাকা লোন দেওয়ার পরে যখন বুঝতে পেরেছে সেই লোনের টাকা আর ফেরত দিতে পারবে না বিবেক, তখন তিতিক্ষাই হয়ে উঠেছে তার টার্গেট। প্রথমে বিবেক দ্বিবেদী, তারপর যারাই তিতিক্ষাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে, সেই নীলার্ণব কাশ্যপ আর শ্রাবণকুমার, দুজনকেই সরিয়ে দিয়ে এখন নিষ্কন্টক। তিতিক্ষাকে প্রোটেকশন দেওয়ার এখন আর কেউ নেই।

গার্গী সায় দিয়ে বলল, নিশ্চয় নাম্বার টু হিসেবে আপনি অলীকশেখরের কথাই বলবেন?

—ঠিক তাই। অলীকশেখর প্রথম থেকে চাইছিলেন না তাঁর কন্যাকে বিয়ে করুক বিবেক। কিন্তু বিয়ে দিতে বাধ্য হওয়ার পর তিনি প্রথমদিকে চেষ্টা করেছিলেন বিবেককে নিজের পায়ে দাঁড় করাতে। কিন্তু একটা সময়েব পরে তিনি নিশ্চিত হলেন বিবেকের ব্যবসাবুদ্ধি বলে কিছু নেই। আসলে অলীকশেখর এতটাই ব্যবসাবুদ্ধিসম্পন্ন যে, তাঁর পাশে বিবেক নিতান্তই অকর্মা অ্যাপেন্ডিসাইটিস। বিবেক ততটা অপদার্থ তা নয়। কিন্তু তার ভুল হয়েছিল শ্বশুরের মতো বিশাল কিছু একটা করে শ্বশুরকে চমকে দিতে। এই অসম প্রতিযোগিতায় নামাটাই ভুল হয়েছিল তাব। ফলে অচিরেই তার ব্যবসা ফেল মারে, তারপর নানা ফন্দিফিকির করে চেষ্টা করেছিল বড়োলোক হওয়াব, তাতে যা ফল হওয়ার তাই হয়েছে। চারদিকে অজস্র দেনা। অলীকশেখর ব্যাঙ্কের গ্যারান্টারও হয়েছিলেন তিতিক্ষার চাপে, সেই প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হওয়ায় অলীকশেখর ঠিক করলেন বিবেক দ্বিবেদীকেই সরিয়ে দেবেন পৃথিবী থেকে। সেই কাজ সম্পন্ন হওয়ার অব্যবহিত পরেই পটভূমিতে এসে গেছেন শ্রাবণকুমার, নীলার্ণব, শেষাদ্রি।

গার্গী চুপচাপ শুনছিল অরিজিৎ পুরকায়স্থর বিশ্লেষণ। বলল, আপনার দ্বিতীয় অনুমান যদি ঠিক হয় তা হলে কিন্তু অলীকশেখরের পরের টার্গেট শেষাদ্রি হাওলাদার।

—ঠিক তাই, ম্যাডাম। দেখা যাক, তার আগেই আমরা এই মিস্ট্রির কোনও ব্রেকথ্রু করতে পারি কি না। বলতে বলতে তিনি দেখলেন মোবাইল কানে দিয়ে হন্তদন্ত পায়ে এগিয়ে আসছেন শাসমল নামের স্মার্টদর্শন অফিসারটি, ডি সি ডি ডি-র কাছে এসে বললেন, স্যার, সুনীথ পালের ফোন। অলীকশেখরের বাড়ি থেকেই ফোন করছে।

অরিজিৎকে উদগ্রীব দেখাল খুবই, কী বলছে সুনীথ পাল?

—অলীকশেখর বলছেন তাঁর হোয়াইট কারটি ঘণ্টাদুয়েক আগে কেউ এসে চুরি করে নিয়ে পালিয়ে গেছে। ড্রাইভার তাঁর বাড়িতেই আছে। তাঁর আজ সন্ধেয়

কোথাও বেরোনোর ছিল না বলে ড্রাইভার রেস্ট নিচ্ছিল তাঁর আউট হাউসে। গাড়ি বাইরে দাঁড় করিয়ে চা-জলখাবার খাচ্ছিল, তারপর গাড়ি গ্যারাজ করতে বেরিয়ে দেখে গাড়ি নেই।

—স্ট্রেঞ্জ! তারপর?

—অলীকশেখর ড্রাইভারকে বলেছিলেন এখনই থানায় গিয়ে ডায়েরি করতে। ড্রাইভার থানায় যাওয়ার উদ্যোগ করছে হঠাৎ এক অচেনা গলায় ফোন এসেছিল অলীকশেখরের কাছে, আমার কাজ শেষ। আপনার গাড়ি রেখে এসেছি উল্টোডাঙা মোড়ের কাছেই। আপনি ড্রাইভার পাঠিয়ে গাড়ি নিয়ে আসুন।

অরিজিৎ পুরকায়স্থ কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারলেন না ঘটনার বিবরণ শুনে। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, ড্রাইভার কি গাড়ি আনতে চলে গেছে?

—হ্যাঁ, ওদের তো অনেক গাড়ি। অন্য একটা গাড়ি চলে গেছে হোয়াইট কারের ড্রাইভারকে সঙ্গে নিয়ে।

অরিজিৎ হঠাৎ শাসমলকে বললেন, শাসমল, ইউ প্রোসিড টু উল্টোডাঙা। ইমিডিয়েট। দ্যাখো, অলীকশেখর সত্যি বলছেন, না মিথ্যে। গোটা ঘটনাটাই সাজানো হতে পারে। হয়তো আদৌ গাড়ি চুরি যায়নি। এখন ড্রাইভারকে বাঁচাতে নতুন একটা স্টোরি বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন বাজারে। রাশ টু দি স্পট ইমিডিয়েটলি।

শাসমল ইতস্তত করে বললেন, স্যার, একজ্যাক্ট লোকেশন না জানলে কি গাড়িটা খুঁজে বার করতে পারব?

—তুমি এগোও। আমি অলীকশেখরকে ধরছি ফোনে। তাঁর ড্রাইভার নিশ্চয় জেনে নিয়েছে লোকেশন। অলীকশেখরের কাছ থেকে লোকেশন জেনে তোমাকে জানাচ্ছি একটু পরেই। তুমি স্পটে যাওয়ার আগেই আমি তোমাকে লোকেশন জানাচ্ছি।

তাঁর কথা শেষ হতেই পুলিশের একটি জিপে লাফিয়ে উঠে শাসমল ছুটে গেলেন উল্টোডাঙা মোড়ের দিকে। অরিজিৎ মোবাইলে ধরার চেষ্টা করলেন অলীকশেখরকে, কিন্তু তাঁর মোবাইল তো অফ!

৩০

গোলপার্ক থেকে উল্টোডাঙা মোড় অনেকটাই রাস্তা, কিন্তু ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাসের কল্যাণে গন্তব্যে পৌঁছোতে বেশিক্ষণ লাগার কথা নয়। অরিজিৎ বার তিনেক মোবাইলে চেষ্টা করার পর হতাশ হয়ে বললেন, কী ব্যাপার, এত বড়ো একজন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের মোবাইল কেন অফ! লোকটি নিশ্চয় একটা স্টোরি

বানিয়ে খাওয়াতে চেষ্টা করছে পুলিশকে! আসলে গাড়ি চুরি যাওয়ার গল্পটা স্রেফ ভাঁওতা।

গার্গী খুবই নিবিষ্ট মনে ঘুরপাক খাওয়াচ্ছিল কিছু আজব ভাবনা। নীলার্ণবের খুনের ঘটনায় নিজেকে নির্দোষ বলে শেষাদ্রি হাওলাদার ফোন করেছিলেন পুলিশ ইনস্পেক্টর দেবজ্যোতি নাগ রায়কে। কিন্তু তার দুদিনের মধ্যে শ্রাবণকুমার খুন হয়ে গেলেন সবার চোখের সামনে। দুটি ঘটনাই এমন পরিস্থিতিতে ঘটল, দুটিতেই শেষাদ্রি হাওলাদারকে অনায়াসে খুনি বলে অনুমান করা যায়। এবারও কি শেষাদ্রি হাওলাদার নিজেকে নির্দোষ বলে ফোন করবেন কোনও পুলিশ অফিসার বা বা তিতিক্ষাকে!

ডি সি ডি ডি অরিজিৎ পুরকায়স্থ হঠাৎ বললেন, ম্যাডাম, রুদ্রপতি শাসমল খুব ভালো অফিসার বলেই পরিচিত পুলিশমহলে। সেই কারণেই তাকে আমরা 'কালার ইন লাইফ' গ্যালারিতে ডিউটি দিয়েছিলাম আজ। অথচ তার সামনেই এত বড়ো একটা খুনের ঘটনা ঘটে গেল ভাবতে বেশ আশ্চর্য লাগছে আমার। মার্ডারার অতি এফিসিয়েন্ট, অতি সুযোগসন্ধানী।

গার্গী কী যেন ভাবছিল আনমনা হয়ে, কী ভেবে বলল, মি. পুরকায়স্থ, আমার মনে হচ্ছে ঘটনাস্থলে আমরাও একবার যাই।

—রাইট ইউ আর, অরিজিৎ পুরকায়স্থ লাফিয়ে উঠলেন, চলুন, ম্যাডাম, আমারও মনে হচ্ছিল এর মধ্যে একটি গভীর এবং মস্ত 'কিন্তু' লটকে আছে। এই কিন্তুটাকে সমাধান করাটাই এখন জরুরি। অলীকশেখরের মতো একজন ব্যস্ত বিজনেসম্যান কেন মোবাইল অফ করে রেখেছেন তা আমার ক্ষুদ্র মগজে খোলসা হচ্ছে না!

—ঠিক আছে, আমি আপনার গাড়িকে ফলো করছি। এক মিনিট অপেক্ষা করুন, তিতিক্ষাকে বলে দেখি ও এখন বাড়ি ফিরবে কি না! ওর সামনে এখন হাজার সমস্যা!

তিতিক্ষা ওপাশের একটি বেঞ্চিতে বসেছিল গুম হয়ে। বহুক্ষণ কেঁদে কেঁদে তার চোখমুখ ফুলে গেছে দেখে গার্গীর কষ্ট হচ্ছিল। গাড়িতে ওঠার আগে তিতিক্ষাকে বলল, তুমি কী করবে এখন! বাড়ি ফিরে যাবে?

তিতিক্ষা শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, বুঝতে পারছি না কী করব? আমার এখন অবলম্বন বলতে আর কিছুই রইল না। বাড়িতে ঢুকতেই ভয় করছে আজ! শেষাদ্রিদা কী ডেঞ্জারাস তা তুমি ভাবতে পারবে না! যে কোনও মুহূর্তে হয়তো ঘরের মেঝে ফুঁড়ে উঠে ঢুকে পড়তে পারে আমার বেডরুমে।

গার্গীর দূরদৃষ্টি ভাবতে চেষ্টা করছিল দৃশ্যটা। অরিজিৎ পুরকায়স্থর দিকে এক ঝলক নজর ছুড়ে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, শেষাদ্রি হাওলাদার তোমার বাড়িতে দেখা করেছিল এর মধ্যে?

তিতিক্ষা ঘাড় নেড়ে জানায়, আমার কোনও উপায় ছিল না, গার্গীদি। ফোনে ক্রমাগত থ্রেটনিং করছিল ক-দিন ধরে। বলছিল, আমি তোমাকে দেখে নেব। তুমি আমাকে চেনো না! বাধ্য হয়ে বলতেই হয়েছিল, আপনি আসুন, শেষাদ্রিদা, আপনার পেমেন্ট যতটা পারি শোধ করে দিতে চেষ্টা কবব।

—তারপর? গিয়েছিলেন তোমার কাছে? শোধ করে দিয়েছ কিছু টা?

—অনেকক্ষণ ধরে বোঝানোর চেষ্টা করলাম আমার অবস্থা। শ্রাবণকুমার খুব শিগগির আমাকে মোটা টাকার চেক দিয়েছেন, সেই চেকটা ক্লিয়ার হয়ে গেলেই তাঁর লোন শোধ করে দেব।

—তিতিক্ষা, তোমার কি মনে পড়ে শেষাদ্রি হাওলাদার তোমার বাড়ি যখন গিয়েছিলেন তোমার বাড়ি থেকে কফিন রঙের কয়েকটা রুমাল হাতিয়ে নিয়েছিলেন কোনও ভাবে?

তিতিক্ষা ভাবল আনমনে, বলল, হতেও পারে। রুমালগুলো তো অনেক সময় বাইরের ঘরের র‍্যাকে থাকে। কেউ নিয়ে যাওয়াটা অসম্ভব নয়।

—শ্রাবণকুমার দিয়েছেন টাকা?

তিতিক্ষার গলা বুজে এল কান্নায়, গার্গীদি, আমি ভাবতেই পারিনি শ্রাবণকুমার আমাকে এভাবে ডুবিয়ে দিয়ে যাবেন! দেব-দেব করে কিচ্ছুটি দেননি আজ পর্যন্ত! আমি পাগলের মতো ছবি এঁকে গেছি, যদিও উনি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, কিছু প্রচারও পেয়েছি, কিন্তু টাকা না-পেলে আমি লোন শোধ করব কীভাবে? আমার এখন দরকার শুধু টাকার। শেষাদ্রিদার মতো কত লোক শুধু হুমকি দিচ্ছে টেলিফোনে। তারা সবাই এখন ভাবছে ছবি বিক্রি করে আমি এর মধ্যে বহু টাকা পেয়েছি, ইচ্ছে করেই কারও টাকা শোধ করছি না।

গার্গী হঠাৎ বলল, আমরা উল্টোডাঙা মোড়ে যাচ্ছি, তুমি ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে যেতে পারো। যাবে? তারপর ফেরার পথে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে যাব তোমার বাড়িতে।

তিতিক্ষা কী ভেবে বলল, চলো, তাই যাই। বাড়ি ফিরতে আজ ভয়ই করছে আমার।

—তা হলে তোমার গাড়িকে বলো বাড়ি চলে যেতে। আমার গাড়িতে উঠবে চলো।

তিতিক্ষার গাড়ি কাছেই দাঁড়িয়েছিল, তিতিক্ষা তার ড্রাইভারকে ডেকে বলল, জগদীশবাবু, আপনি বাড়ি যান। আমার ফিরতে একটু রাত হবে। গাড়ি গ্যারাজ করে চাবি রেখে যাবেন উপরে।

তিতিক্ষা গার্গীর গাড়িতে ওঠার পর গার্গীও উঠে বলল পাশে, রতন, উল্টোডাঙার মোড়ে যাব। ওই পুলিশের গাড়িটাকে ফলো করো।

গাড়িটা স্টার্ট দেওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে তিতিক্ষার ড্রাইভার ছুটে এল তিতিক্ষার কাছে, ম্যাডাম, মকবুল কি আজ ফিরবে?

তিতিক্ষা ঘাড় নাড়ে, ফিরতে পারে। যদি ফেরে চাবি ওর কাছেই দিয়ে যেয়ো।

পরক্ষণেই দুটো গাড়ি কলকাতার রাস্তা মাড়িয়ে ছুটে চলল তীব্রগতিতে। বিজন সেতুর মুখে বরাবরের মতো আজও কিছুটা জ্যাম। সঙ্গে একজন বড়ো পুলিশ অফিসার থাকায় কিছুটা আগে বেরোতে পারল গার্গীদের গাড়িটাও। ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাসে পৌঁছোতেই গাড়ির স্পিড উঠল তুঙ্গে। পুলিশের গাড়ির বিশেষ লাল আলোর সাহায্য পেয়ে গতি বাড়াতে সুবিধে হল রতনেরও। যেতে যেতে তিতিক্ষার কাছে জানতে চায়, তোমার এই ড্রাইভার নতুন মনে হচ্ছে?

—নতুন ঠিক নয়, বাবার অনেকগুলো গাড়ি আর ড্রাইভার আছে, মকবুল তিনদিনের ছুটি নিয়ে দেশের বাড়ি গেছে, তাই বাবাকে বলে জগদীশকে নিয়ে নিয়েছি তিনদিনের জন্য।

গার্গী হঠাৎ বলল, তোমার বাবার বোধহয় নানা রকম গাড়ির উপর দুর্বলতা আছে, তাই না?

—খুব। পাঁচটা গাড়ি ছিল, সেদিন একটা ঝকঝকে গাড়ি কিনে এনেছে, বলল, 'এই ব্র্যান্ডের গাড়ি একদম নতুন আমদানি হয়েছে মার্কেটে। দেখতে দারুণ। তাই না-কিনে পারলাম না!'

—হ্যাঁ, আর প্রতিটি গাড়ির রং আলাদা। প্রত্যেকটা রংই আনকমন, তাই না?

তিতিক্ষার গলায় এতক্ষণ পরে একটু ফুরফুরে। বলল, আসলে গাড়ির শখটা আমারই ছিল। নতুন কোনও মডেল বাজারে এলে বাবাকে আমিই সেই মডেলের গাড়ি কেনার বায়না ধরতাম, কিনে আনলে বলতাম এরকম রং করাও এ-গাড়িটার। সেই অভ্যাসটা বাবার এখনও রয়ে গেছে।

—তোমার আগের ড্রাইভার ছুটিতে গেছে বললে, কোথায় বাড়ি ওর?

—বিহারে কোথাও। তিনদিনের ছুটি নিয়ে গেছে, এখন ক-দিন পরে আসে তার ঠিক কি!

—আজ আসবে বলে গেছে?

-এরকমই বলে যায় প্রতিবার। আসলে নতুন বিয়ে করেছে, এখন ওকে এখানে ধরে রাখাই দায়। ক-দিন পর-পর বলবে, ম্যাডাম, ছুটি দেবেন?

গার্গীও হালকা চালে বলল, তাই তো। নতুন বিয়ে করেছে, ও বেচারিই বা কী করবে?

—সেদিন যাওয়ার সময় আজ ফিরবে বলে গেছে, ফিরলে বাঁচি। না ফিরলে কাল আবার বাবকে ফোন করতে হবে জগদীশকে আরও ক-দিন চাই বলে?

—কালও কি তোমার কোথাও প্রোগ্রাম আছে?

তিতিক্ষা হঠাৎই স্তব্ধ হয়ে গেল গার্গীর কথায়, গলা ভারী করে বলল, ছিল প্রোগ্রাম। আমার এখনকার সব প্রোগ্রামই তো ছিল শ্রাবণকুমারের আয়োজন করা। শ্রাবণকুমার কোনও একজন বিদেশি ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টকে নিয়ে এসেছেন কলকাতায়। তাঁর সঙ্গে কোলাবরেশনে একটি হোটেল করবেন ইটালিতে। সেও নাকি একটি সি-বিচের ধারে। বিশাল হোটেল। সেই হোটেলেও প্রতি ফ্লোরে নাকি আমার কয়েকটি প্রমাণ আকারের ছবি রাখবেন এরকমই বলেছিলেন আমাকে। তাঁর সঙ্গেই ছিল একটা ছোট্ট পার্টি। শ্রাবণকুমার আমাকে বলেছিলেন খুব সেজেগুজে যেতে।

বলতে বলতে গলা আবার ধরে এল তিতিক্ষার, সামলে নিয়ে বলল, কী যে হয়ে গেল না আমার জীবনে!

তাদের কথোপকথনের মধ্যে কখন যে উল্টোডাঙার মোড়ে পৌঁছে গেছে তারা তা খেয়ালই করতে পারেনি গার্গী। দেখল অরিজিৎ পুরকায়স্থের গাড়িটা মোড়ের কাছে এসে থেমে গেল সজোরে ব্রেক করে। প্রায় লাফিয়ে গাড়ি থেকে নামলেন ডি সি ডি ডি। গার্গীও নেমে দেখল মোড় থেকে অদূরে একটা দোকানের সামনে বেজায় ভিড়। রাত অনেকটাই হয়ে গেছে তবু মোড়ের কাছে লোকে লোকারণ্য। গার্গী উঁকিঝুঁকি মেরে দেখল সাদা গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে অভিভাবকহীন, কিন্তু তার সামনে আরও একটা গাড়ি, গাড়িটা বটল গ্রিন রঙের।

গার্গী চমকে উঠল কেন না এই গাড়িটাই তো শেষাদ্রি হাওলাদারের! তিতিক্ষা এত ভিড় দেখে হকচকিয়ে গিয়ে বলল, এত ভিড় কেন, গার্গীদি?

গার্গী তখন অনুসরণ করছে অরিজিৎ পুরকায়স্থকে, ভিড় ঠেলে ভিতরে ঢুকে যে-দৃশ্য দেখল তাতে তারও হৃৎপিণ্ড থমকে গেল কয়েক মুহূর্ত। দেখল, বটল গ্রিন গাড়িটার পাশেই মুখ থুবড়ে পড়ে আছে একটি লাশ। রক্তে ভেসে যাচ্ছে রাস্তা।

অরিজিৎ পুরকায়স্থ তখন কথা বলছেন সামনেই দাঁড়িয়ে থাকা রুদ্রপতি শাসমল আর সুনীথ পালের সঙ্গে। আর কী আশ্চর্য, সুনীথ পালের হাতে সেই একই রুমাল, তাতে একটি কাগজখণ্ড, তাতে লেখা, মৃত্যুই প্রয়োজন ছিল তোমার।

অরিজিৎ পুরকায়স্থ তাকালেন গার্গীর দিকে, সেই কফিন রঙের রুমাল! স্ট্রেঞ্জ!
গার্গী তিতিক্ষার দিকে তাকায়, তিতিক্ষা গার্গীর দিকে।

৩১

পর-পর এতগুলি খুনের ঘটনায় শহরের মানুষ নড়েচড়ে বসেছে এতদিনে। সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হচ্ছে ঘটনাগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ঠিক যেরকম সিরিয়াল কিলারের বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে এর আগে। পুলিশের বড়োকর্তারাও বসে মিটিং করছেন বিষয়টি নিয়ে। এরকম একের পর এক হত্যাকাণ্ড ঘটে চলেছে পুলিশের নাকের ডগায়, অথচ পুলিশের সাধ্য হচ্ছে না খুনিকে হাতেনাতে ধরার। কাগজের সমালোচকরা তো পেন উঁচিয়ে বসে আছেন সারাক্ষণ, ঘটনার বিবরণের সঙ্গে প্রকাশিত হচ্ছে কখনও প্রথম, কখনও দ্বিতীয় সম্পাদকীয়, তা ছাড়াও বাঘা-বাঘা প্রাবন্ধিকের পোস্ট-এডিটোরিয়াল। এমনকী বাংলা চ্যানেলগুলিও দেখাতে শুরু করেছে কীভাবে ছবির প্রদর্শনীর সঙ্গে খুনগুলো জড়িয়ে যাচ্ছে এই শহরে।

গার্গী কাল অনেক রাতে ঘটনাস্থল থেকে ফিরে ঘুমিয়েছে অনেক বেলা পর্যন্ত। আজ ছুটির দিন বলে তার একটু ফুরসত। ছুটির দিনে লুনাকে একটু বেশি সময় দিতে পারে। লুনা উঠেওছে একটু বেলা করে। তার খাওয়ার ব্যবস্থা করে গেস্টরুম থেকে ডাকল সোনালিচাঁপাকে, সোনালি, তুমি বিকেলে আজ আমার সঙ্গে যাবে।

সোনালিচাঁপার একটু অভিমান হয়েছিল তদন্তের কাজে তাকে এবার বেশি দায়িত্ব না-দেওয়ায়। তিতিক্ষার ড্রাইভারের খোঁজে সেই যে তাকে একবার পাঠানো হয়েছিল, তার পর থেকে গার্গী আর ডাকেইনি তাকে। হয়তো ড্রাইভারের খোঁজ ঠিকমতো আনতে না-পারার অপদার্থর কারণেই।

সোনালিচাঁপা খুশি হয়ে চলে যেতে সায়নকে বলছিল গত রাতের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা। সায়ন ফুট কাটছিল পুলিশের অপদার্থতার কথা ব্যক্ত করে। এও বলছিল, তা হলে এবার নিশ্চয় অলীকশেখরকেই টার্গেট করবে পুলিশ!

গার্গী কাল রাত থেকে ঢালা-উপুড় করছে গত কয়েক মাসের ঘটনাপ্রবাহ। বিবেক দ্বিবেদীর খুন থেকে যে এপিসোডের শুরু, তার একটি মহাপর্ব বোধহয় শেষ হল এতদিনে। সায়ন যা বলেছে খুব মন্দ বলেনি। তবু জিজ্ঞাসা করল, তোমার এই সিদ্ধান্তের পিছনে কোন মোটিভ কাজ করছে তা কি একটু খোলসা করে বলবে?

সায়ন সোজাসাপ্টা বিশ্লেষণ করে বলল, হারাধনের দশটি ছেলের ন-জন মারা গেলে পড়ে থাকে যে-জন তিনিই নিশ্চয় এই নিধনকাণ্ডের গুরু।

—ভালো বলেছ, গার্গীর ভুরু চিন্তায় গুটিয়ে যায় অনেকখানি। কাল রাতে সে বহুক্ষণ ভেবেছে গোটা বিষয়টি, বলল, যার উপর সন্দেহের তির সবচেয়ে বেশি ছোড়া হচ্ছিল এতদিন, সেই শেষাদ্রি হাওলাদারও যখন খুন হয়ে গেলেন আশ্চর্যভাবে, তখন কাকেই বা আর সন্দেহ করা যায়!

—তা ছাড়া বিবেক ভরদ্বাজ যখন খুন হয়েছিলেন, তখন থেকেই তো অলীকশেখরের কার্যকলাপ, ব্যবহার অনেকের কাছেই সন্দেহজনক মনে হয়েছিল, তাই না?

—কিন্তু এতগুলো খুন অলীকশেখর করতে যাবেনই বা কেন? তাঁর স্বার্থ কী!

সায়ন কিছুক্ষণ চিন্তা করে জানায়, হয়তো তিতিক্ষাকে অন্যদের হাত থেকে বাঁচাতেই।

একমাত্র মেয়েকে প্রায় অজ্ঞাতকুলশীল—সামান্য এক ব্যবসায়ী বিবেক দ্বিবেদীর সঙ্গে বিয়ে দিতে চাননি ধনী ব্যবসায়ী অলীকশেখর। তবু মেয়ের কথা ফেলতে না-পেরে বিয়েটা দিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু একেবারেই সন্তুষ্ট ছিলেন না স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন বিবেকের উপর। বহু চেষ্টা করেও নিজের পায়ে দাঁড়াতে তো পারেইনি, উপরন্তু ঋণের দায়ে তার আপাদমস্তক বিক্রি হয়ে গিয়েছিল মৃত্যুর আগে। সেই বিবেকের হাত থেকে মেয়েকে বাঁচাতে বিবেককে তিনিই খুন করিয়েছিলেন কি না তা এখনও এক রহস্য। তারপর আরও এতগুলি খুন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব কি না তা খতিয়ে দেখা যেতে পারে। তাদের কথোপকথনের মাঝখানে হঠাৎই তার মোবাইলে রিংটোনের মৃদু সংগীত। সুইচ অন করতেই ওদিকে তিতিক্ষার কণ্ঠস্বর, গার্গীদি, আমার খুব বিপদ।

তিতিক্ষার বিপদ তা খুব নতুন কথা নয়, কিন্তু তার কী বিপদ আবার ঘনিয়ে এল শুনতে উদগ্রীব হল গার্গী, কী হয়েছে তোমার?

—কাল রাতেই পুলিশ ফোন করেছিল বাবাকে। বলেছে তিনি যেন বাড়ি ছেড়ে কোথাও না বেরোন। তাঁর গতিবিধির উপর সারাক্ষণ নজর রাখছে পুলিশ।

মোবাইলে কথার বলার মধ্যেই গার্গী চোখ রাখে বেসিনের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শেভ করতে থাকা সায়নের দিকে। গালভর্তি সাবানের ফেনা থাকায় এই মুহূর্তে সায়নের প্রোফাইল একটু অন্যরকম। একটু আগেই ঠিক এরকমই আশঙ্কা করেছিল সায়ন। তিতিক্ষার দিকে মন দিয়ে গার্গী বলল, পুলিশ হয়তো আরও একবার তোমার বাবাকে ইন্টারোগেট করতে চায়।

—কতবার তো ইন্টারোগেট করেছে এর আগে।

—কিন্তু তখন তো পর পর এতগুলো খুন হয়নি।

তিতিক্ষা কিছুক্ষণের জন্য চুপ। তারপর হঠাৎ বলল, গার্গীদি, বুঝতেই পারছ বাবাকে এখন আমার খুব দরকার।

বিবেকের খুন হওয়ার পর যাকে অবলম্বন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখেছিল তিতিক্ষা সেই শ্রাবণকুমার খুন হতে ভারি বিপদে পড়ে গেছে তিতিক্ষা। গার্গী তাকে এই মুহূর্তে কী বলে সান্ত্বনা দেবে বুঝে উঠতে পারে না। পুলিশ এখন এতগুলো খুনের কিনারা করতে সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে সন্দেহভাজনদের উপর তাতে কোনও দ্বিমত থাকতে পারে না। বলল, তিতিক্ষা, পুলিশের কাজ পুলিশকে করতে দাও। বরং সেই প্রবচনটিই মনে রেখো, ট্রুথ উইল প্রিভেইল। সত্যের জয় হবেই। অলীকশেখর যদি এর সঙ্গে জড়িত না থাকেন, তা হলে আমি নিশ্চিত তাঁর ছায়াতেও আঁচড়টি কাটতে পারবে না পুলিশ। আয়াম শিওর।

ওপাশে তিতিক্ষার উৎকণ্ঠিত স্বর, তুমি ঠিক বলছ, গার্গীদি?

—একশোভাগ সত্যি। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। কিন্তু তুমি কি জানো, শ্রাবণকুমারের কাছে তোমার যত ছবি ছিল সব নিলাম হয়ে যাচ্ছে জলের দরে?

তিতিক্ষা চমকে উঠল খবরটা শুনে, জিজ্ঞাসা করে, কে বলল আপনাকে?

—কাল রাতে ডেপুটি কমিশনার অরিজিৎ পুরকায়স্থ ফোন করেছিলেন আমাকে। বললেন, শ্রাবণকুমারেরও অনেক দেনা হয়ে গেছে বাজারে। শ্রাবণকুমার তাঁর হোটেল তৈরির জন্য তোমাকে যেমন ছবি আঁকার কথা বলেছিলেন, তেমনই অনেককে বহু রকম অর্ডার দিয়েছিলেন, অনেকে সাপ্লাইও দিয়ে ফেলেছে, এখন তাঁর মৃত্যুর পর সেই সব সাপ্লায়াররা টাকার জন্য ঘুরছে, সবাই বুঝতে পারছে কেউ আর টাকা পাবে না। তাই তারা একদিনের মধ্যে কোর্ট থেকে অর্ডার বার করে শ্রাবণকুমারের যত স্থাবর সম্পত্তি তার বাড়ি থেকে উদ্ধার করেছে, সবই নিলামে তুলে বিক্রি করে ভাগযোগ করে নেবে তাদের পাওনা টাকা।

তিতিক্ষা কখনও ধারণাও করতে পারেনি এরকম একটা ঘটনা ঘটে যাবে ক-দিনের মধ্যে। প্রবল ছটফট করে উঠে বলল, কী হবে, গার্গীদি, শ্রাবণকুমারের কাছে আমার বহু ছবি আছে। ভালো ভালো ছবি। প্রচারের দৌলতে এখন সে সব ছবির প্রচুর দাম বাজারে।

—তিতিক্ষা, তোমার যদি খুব কাজ না থাকে আজ বিকেল সাড়ে চারটের মধ্যেই তুমি চলে এসো সদর স্ট্রিটে। কাছেই একটা মস্ত হলে নিলাম হচ্ছে আজ।

তারপর মুখে মুখে একটা ঠিকানা দিয়ে গার্গী বলল, তুমি স্পটে না থাকলে ঠিক শনাক্ত করা যাবে না তোমার ছবি কোনগুলো। তুমি তো এখনও কোনও পেমেন্ট পাওনি। তুমিই বা তোমার ছবি নিলাম হতে দেবে কেন?

তিতিক্ষা কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে বলল, একটা ছোটো পেমেন্ট পেয়েছিলাম, গার্গীদি।

—তিতিক্ষা, তোমার মোট ছবির যা দাম তার তুলনায় তুমি কিছুই পাওনি। তুমিই বা তোমার ছবি এমন জলের দরে বিক্রি করতে দেবে কেন?

—গার্গীদি, তুমি কি যাচ্ছ ওখানে?

—তুমি গেলে আমাকে যেতে হবে যাতে পুলিশকে বুঝিয়ে তোমার ছবি তোমার কাছেই ফেরত দেওয়া যায়।

—পুলিশ থাকবে নাকি ওখানে?

—সে তো থাকতেই হবে। নইলে নিলামের পর টাকা ভাগ করা নিয়ে গণ্ডগোলের সম্ভবানা একটা থাকেই।

তিতিক্ষা একটু ভেবে নিয়ে বলল, ঠিক আছে, গার্গীদি, আমি যাব।

তিতিক্ষার লাইন কেটে যেতেই গার্গী খেয়াল করল সায়ন ইতিমধ্যে সেভ সেরে স্নানও সেরে ফেলেছে। তাকে কোথায় যেন যেতে হবে একটা সেমিনারে বক্তৃতা করতে। বেলা দশটা থেকে সারাদিনের লাঞ্চসহযোগে আলোচনাচক্র। মোবাইল কানে নিয়েই গার্গী গোছাচ্ছিল তার ব্রেড-বাটার-ওমলেট। তাকে মোবাইলমুক্ত দেখে সায়ন বলল, যাক, তোমার ম্যারাথন মোবাইলকথন শেষ হয়েছে তা হলে?

গার্গী হাসল, আর বলো কেন? তোমার ভবিষ্যদ্বাণীই সত্য হতে যাচ্ছে বোধহয়। অলীকশেখরকে প্রায় নজরবন্দি করে ফেলেছে পুলিশ। কিন্তু খুনগুলো অলীকশেখর করেননি বলেই আমার ধারণা।

সায়ন বসেছিল ব্রেকফাস্ট খেতে, ওমলেটের একটা টুকরোর অর্ধেক তার মুখের ভিতর অর্ধেক বাইরে ঝুলন্ত, বলল, তা হলে আর বাকি রইল কে? তিতিক্ষা?

—না, তিতিক্ষাও করেনি খুনগুলো।

—তা হলে? তুমি কি জেনে গেছ খুনির নাম-ধাম-ঠিকানা?

—এখনও সবটাই আমার অনুমান। দেখা যাক আজ বিকেলে আমার অনুমান সত্যি হয় কি না!

—তার মানে নিলামের জায়গায় তোমার অনুমিত খুনি এসে হাজির হবেন সশরীরে?

—হয়তো। কিন্তু সবটাই নির্ভর করছে যোগাযোগের উপর। ইতিমধ্যে খুনিকেও আমি আমন্ত্রণ জানিয়েছি নিলামের জায়গায় আবির্ভূত হতে। যদি তিনি আসেন, তবেই পাঁচে পাঁচে দশ হবে। আমার অনুমান কার্যকরি হবে।

সায়ন ক্রমাগত বিস্মিত হচ্ছিল তার স্ত্রীরত্নটির সাহস ও আত্মবিশ্বাস লক্ষ করে। গার্গী এর আগেও অনেকগুলি জটিল কেসের সমাধান করেছে তার অনুমানক্ষমতা ও তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তির জোরে। কী জানি প্রবহমান ঘটনাবলির অন্তরালে এবার কী লক্ষ করেছে ও আবিষ্কার করেছে রহস্যের সূত্র।

সায়ন বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি আগেই জেনে গিয়েছিলে কীভাবে খুনগুলো হচ্ছে বা কে করছে খুন?

গার্গী তখন ভাবনার গভীরে বিচরণ করছে ভুরুতে ভাঁজ ফেলে, বলল, সন্দেহটা অনেকদিন ধরেই হচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু হাতেনাতে প্রমাণ না-পাওয়া পর্যন্ত বলা যাচ্ছিল না কেন এতগুলো খুন, কে-ই বা আছে এর অন্তরালে!

—এখন কি প্রমাণ পেয়েছ?

—মনে হচ্ছে। তবে বিকেলে নিলামঘরে না-পৌঁছোনো পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারছি না আমার অনুমানের যৌক্তিকতা আছে কি না!

সায়ন একটু পরেই অফিসে রওনা দিতে গার্গী ব্যস্ত হয়ে পড়ল তার স্ট্রাটেজির রূপায়ণে। প্রথমেই ফোন করল ডেপুটি কমিশনার অরিজিৎ পুরকায়স্থকে, তিনি তখন অফিসে বেরোচ্ছেন, তাঁকে মোবাইলে ধরে বলল, মি. পুরকায়স্থ, নিলামটাই আজকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট।

অরিজিৎ পুরকায়স্থর স্বরে দ্বিধা, বললেন, আপনি কি নিশ্চিত, ম্যাডাম, আজ খুনি এসে ধরা দেবে আপনার ফাঁদে?

—সবটাই বরাত, মি. পুরকায়স্থ। তবে আপনার বাহিনি যেন প্রস্তুত থাকে নিলামঘরের চারপাশে।

—যা খবর নিয়েছি তাতে শুনলাম বাড়িটা খুবই পুরোনো ধরনের।

—ওখানেই বড়ো বাড়ো নিলামগুলো হয়।

—বাড়িটার চারপাশে উঁচু পাঁচিল আছে, মস্ত লোহার গেট।

—ঠিকই বলেছেন। তিতিক্ষার ছবিগুলো ওই বাড়িতেই নিলাম হচ্ছে। তিতিক্ষাকেও যেতে বলেছি যাতে সে ছবিগুলো শনাক্ত করতে পারে।

—মিসেস দ্বিবেদী যাচ্ছেন ওখানে?

—আমি অনুরোধ করেছি যেতে। কিন্তু দেখবেন তাকে যেন যথাযথ প্রোটেকশন দেওয়া হয়। তার নিরাপত্তার কথাটাও তো আপনাকে ভাবতে হবে।

—ওহ্, শিওর। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ম্যাডাম।

—নিলাম আরম্ভ হওয়ার পর লোহার গেট যেন বন্ধ করে দেওয়া হয়।

—শিওর, ম্যাডাম।

—আর একটা অনুরোধ। এখনই অলীকশেখরের বাড়িতে উর্দি-পরা পুলিশ দিয়ে ওয়াচ রাখার প্রয়োজন নেই। লেট আস ওয়েট অ্যান্ড সি।

সেদিনটা গার্গীর পক্ষে বেশ উত্তেজনায় টইটম্বুর দিন। অরিজিতের ফোন রেখে পর-পর আরও কয়েকটা ফোন করল দিনের বাকি সময়টা। তিতিক্ষাকে আরও একবার ফোন করে জানিয়ে দেয় অরিজিতের সঙ্গে তার যে কথা হয়েছে তাতে অলীকশেখরকে এখনই গ্রেফতার করছে না পুলিশ। আরও জিজ্ঞাসাবাদ করবে একে-ওকে।

তিতিক্ষাকে নিশ্চিন্ত করে গার্গী তাকায় দেওয়ালঘড়ির দিকে। অন্তত মিনিট চল্লিশেক সে বিশ্রাম নিতে পারে এখন। কাল রাত থেকে তার যা টেনসন চলছে তাতে শরীরে কেমন অবসন্নভাব। বিছানায় শুয়ে তার উত্তেজনায় কিছু জল ঢালতে চেষ্টা করে গার্গী।

বোধহয় তার চোখ জড়িয়ে এসেছিল হঠাৎই দরজার বাইরে কলিং বেলের শব্দ শুনে চমকে তাকায় ঘড়ির দিকে। চারটের কাছাকাছি সময়। তার বেরোনোর কথা ছিল আরও মিনিট পাঁচেক আগে, তার দেরি দেখেই নিশ্চয় ড্রাইভার রতন কলিং বেল টিপে স্মরণ করিয়ে দিল তার বেরোনোর কথা। বিছানা থেকে উঠে খুবই দ্রুত তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ল সদর স্ট্রিটের উদ্দেশে। যত এগোচ্ছে সদর স্ট্রিটের দিকে ততই তার শরীর ঘিরে উত্তেজনার ঝড়। মস্ত লোহার গেটটা পেরোনোর সময় সে চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিল সাদা পোশাকের পুলিশেরা যে যার জায়গায় আছে কি না! দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে ঢুকে পড়ল নিলামঘরের ভিতর।

নিলামঘরে এর আগে কখনও কোনও কাজে আসতে হয়নি গার্গীকে, আসার কথাও নয়। কিন্তু বরাবরই তার কৌতূহল ছিল কীভাবে বিডিং হয়, কারাই বা বিডিং করে, কীভাবে এগোতে থাকে নীলামের হাঁক।

গার্গী গভীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছিল তিতিক্ষার জন্য কেন না নিলামের সামগ্রীর মধ্যে তার কয়েকটা ছবি আছে তা চোখে পড়েছে তার। সবগুলোই সেই বিখ্যাত ন্যুড ছবির সিরিজ যা শ্রাবণকুমার তাকে দিয়ে বিশেষভাবে আঁকিয়ে নিয়েছিলেন তিতিক্ষাকে দিয়ে। কিন্তু শ্রাবণকুমারের এত সব পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় তিতিক্ষার পরিশ্রমও থইথই জলে।

সোনালিচাঁপা সেই কথাই ফিসফিস করে বলছিল গার্গীর কাছে, গার্গীদি, কী হবে বলো তো তিতিক্ষার?

গার্গীও ভাবছিল তিতিক্ষার কথা। তার ভাবনাটা একটু অন্যরকম।

৩২

তিতিক্ষা এল ঠিক চারটে বেজে চল্লিশে। ততক্ষণে বেশ কিছু মানুষ ভিড় করে আছে নিলামঘরে। অন্তত জনা কুড়ি-পঁচিশ। তিতিক্ষারও কোনও ধারণা ছিল না নিলামঘর সম্পর্কে। তার অভিব্যক্তির এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে উৎকণ্ঠার খই। গার্গীকে সেখানে আবিষ্কার করে কিছুটা স্বস্তি। বলল, নিলাম আরম্ভ হয়ে গেছে নাকি?

—না, এই এখনই শুরু হবে। দেখেছ তোমার ছবিগুলো?

—না, কোথায়? তিতিক্ষাকে বিভ্রান্ত দেখাচ্ছিল খুবই।

—ওই তো, গার্গীর আঙুল অনুসরণ করে তিতিক্ষা দেখল তার আঁকা ছবিগুলির অবস্থান।

বলতে না বলতে একজন মাথায় পাগড়ি পরা লোক বিচিত্র শব্দে শুরু করল নিলামের ডাক। তিতিক্ষার আঁকা একটি ছবি আর একজন লোক ভিতর থেকে সামনে এনে রাখার সঙ্গে সঙ্গে আর একজন গুঁফো যুবক শুরু করল তার ডাক, এক লাখ তিরিশ হাজার।

গার্গী তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করছিল তিতিক্ষার প্রতিক্রিয়া। তার ছবির দাম এক লাখ তিরিশ হাজার থেকে শুরু হওয়ায় সে নিজে অতীব বিস্মিত।

পরক্ষণে সেই নিলামের আসরে হঠাৎ অলীকশেখরের আবির্ভাব ঘটায় তিতিক্ষা তার ছবির নিলাম হওয়ার দৃশ্যের চেয়েও বিস্ময় প্রকাশ করল অনেক বেশি, বাবা, তুমি এখানে?

অলীকশেখরকে খুবই বিভ্রান্ত দেখাচ্ছিল এরকম একটি আসরে অবতীর্ণ হয়ে, বললেন, জনৈক পুলিশ অফিসার আমাকে ফোন করে এখানে আসতে বললেন। জানালেন আজ নাকি খুনি ধরা পড়বে এই আসরে।

তিতিক্ষার মুখে তখন চরম বিভ্রান্তি, গার্গীর দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, সত্যি নাকি, গার্গীদি?

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেন ডিকেটটিভ ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি কমিশনার অরিজিৎ পুরকায়স্থ, কিন্তু পরনে অন্যদিনকার মতো পুলিশের উর্দি নয়, নীল রঙের সাধারণ একটি হাওয়াই শার্টের সঙ্গে ব্ল্যাক ট্রাউজারস। গার্গীর দিকে এগিয়ে এলেন বুটে মসমস শব্দ তুলে, একবার তিতিক্ষার দিকে চোখ ফেলে গার্গীকে বললেন, ম্যাডাম, উই হ্যাভ ডান আওয়ার জব। নাউ ইট ইজ ইয়োর টার্ন—

ততক্ষণে নিলামের ডাকে আশ্চর্যজনক বিরতি। তিতিক্ষার কেমন যেন সন্দেহ

হচ্ছিল চারপাশের আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতি লক্ষ করে, জিজ্ঞাসা করল, গার্গীদি, কী ব্যাপার বলো তো?

গার্গী তার দিকে নজর ন্যস্ত করে বলল, আসলে কী জানো, এই শহরের সবাই উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে এত সব খুনের পিছনে কে জড়িত, ট্রিগারে কার আঙুলের চাপে একের পর এক ছুটে যাচ্ছে প্রাণঘাতী গুলি। তার জেরে ব্যতিব্যস্ত এই শহরের মানুষ। বিপর্যস্ত এই শহরের শিল্পপ্রদর্শনীর সঙ্গে যুক্ত মানুষজনও। এতদিনে ধরা পড়েছে সেই ভয়ংকর খুনি।

তিতিক্ষা বিস্মিত হয়ে জানতে চায়, কোথায় সেই খুনি?

গার্গী জানায়, আজ এই নিলামের জায়গায় উপস্থিত হয়েছে সেই খুনি। আমার অনেকদিন থেকেই সন্দেহ হচ্ছিল তাকে, কিন্তু ঠিক প্রমাণের অভাবে ধরাছোঁয়ার মধ্যে পাচ্ছিলাম না। আজই তাকে ধরা সম্ভব হল।

তিতিক্ষা তীক্ষ্ণ চোখ তাকায় গার্গীর দিকে, কাকে সন্দেহ করছ তুমি, গার্গীদি?

অলীকশেখর প্রায় অট্টহাস্য করে বললেন, হয়তো আমাকেই। তাই এই নিলামের নাম করে আমাদের ডেকে এনেছেন এই মহীয়সী মহিলা। দি গ্রেট গার্গী চৌধুরি।

—আমি গ্রেট নই, গার্গী চাউনিতে তীব্রতা মাখিয়ে বলল, কিন্তু আপনিও নিশ্চয় চান খুনি ধরা পড়ুক। কে এত সব ঘটনার নেপথ্যে আছে, রিভলবারের গুলিতে ফুঁড়ে ফেলছে একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ সব মানুষকে সেটা নিশ্চয় আপনারও জানতে ইচ্ছে করছে, কী বলুন?

—অবশ্যই ইচ্ছে করছে। কিন্তু মার্ডারারকে ধরতে গিয়ে সেই বিখ্যাত প্রবচনের মতো উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে আরোহন করিয়ো না যেন! মাইন্ড ইট।

—নিশ্চয় আপনার কথা স্মরণে রাখব। তবে স্বীকার করতেই হবে খুনি খুব অদ্ভুত কৌশলে নিজেকে আড়ালে রেখে বিবেক দ্বিবেদীর খুনের দায় একজন নিরীহ ড্রাইভারের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল, তার রণকৌশল আমাকে এতই আশ্চর্য করেছে, এবং এই ঘরে উপস্থিত সবাইকেই যে আশ্চর্য করবে এ বিষয়ে আমি একশো ভাগ নিশ্চিত।

তবে প্রথমে আপনাদের সবাইকে জ্ঞাত করি যে, আজকের এই নিলাম ডাকার আসর—এর সবটাই পূর্বপরিকল্পিত। এই ঘরে যারা উপস্থিত আছেন তাঁদের বেশিরভাগই সাদা পোশাকের পুলিশ। আজ এই বাড়িতে সত্যিই কোনও নিলাম ডাকের আসর ছিল না, ডেপুটি কমিশনার অরিজিৎ পুরকায়স্থকে অনুরোধ করতে তিনিই এই নাটকের সেটটি বানিয়েছেন রাতারাতি।

অলীকশেখর ছটফট করে উঠে বললেন, কিন্তু কে সেই খুনি তা এখনও জানতে পারিনি কিন্তু।

অরিজিৎও বললেন, ইট ইজ স্টিল মিস্টেরিয়াস টু অল অফ আস।

গার্গী তখন বলতে শুরু করেছে, সেই রহস্যই উন্মোচন করার চেষ্টা করছি, মি. পুরকায়স্থ।

গার্গী পরক্ষণে আসরে উপস্থিত তার ড্রাইভার রতনকে উদ্দেশ করে বলল, রতন, তুমি তোমার গাড়ির ডিকিতে রাখা বান্ডিলটা নিয়ে এসো তো।

রতন পরক্ষণে ঘরের বাইরে বেরিয়ে যেতে অরিজিৎ আবার প্রশ্ন করলেন, কীসের বান্ডিল, ম্যাডাম?

—এই বান্ডিলটা হাতে পেতেই আমি প্রথম রহস্যের চাবিকাঠির সন্ধান পাই। নিশ্চয় আপনাদের স্মরণে আছে যে, বিবেক দ্বিবেদী যেদিন খুন হন ইস্টার্ন বাইপাসের ধারে, তাঁর আগুনে-পোড়া লাশ পুলিশ উদ্ধার করে, সেই লাশ শনাক্ত করে তার স্ত্রী তিতিক্ষা দ্বিবেদী। আপনাদের এও স্মরণে থাকতে পারে সেই লাশের উপরের দিকটা প্রায় ভস্মীভূত হওয়ায় তিতিক্ষা সেই লাশের পরনের জামাপ্যান্ট ও জুতো দেখেই নিশ্চিত হয়েছিল এই লাশ বিবেক দ্বিবেদীর। তখন প্রাথমিকভাবে অনেকেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল বিবেক দ্বিবেদীর ড্রাইভার তার মালিককে খুন করে উধাও হয়ে গেছে কোনও গোপন ডেরায়। তার খোঁজে পুলিশ কোথায় না কোথায় টুঁড়ে ফেলেছে, এমনকী আমাদের সোনালিচাঁপাও খোঁজ করেছে তার কলকাতার ডেরায়, কিন্তু আশ্চর্য এই যে, সেই সামান্য ড্রাইভারের খবর এতদিনে জানা গেছে।

—পেয়েছেন নাকি সেই ড্রাইভারের খবর? অলীকশেখরের জেরা।

—আপনারা শুনলে স্তম্ভিত হবেন, সেই লাশ আদৌ বিবেক দ্বিবেদীর ছিল না।

চারপাশে প্রবল গুঞ্জন, অস্ফুট ধ্বনি, তার মধ্যে অলীকশেখরের কর্কশ গলাই শোনা গেল, তা হলে কার লাশ?

—সেই লাশ বিবেক দ্বিবেদীর হতভাগ্য ড্রাইভার রোহনের।

অলীকশেখর চমকে উঠে বললেন, কী বলছেন আপনি? অ্যাবসার্ড!

—মোটেই আবসার্ড নয়, তার প্রমাণও রয়েছে আমার হাতে, এই দেখুন, বলে গার্গীর ড্রাইভার রতন যে-বান্ডিলটি দিয়ে গেছে সেটি অরিজিৎ পুরকায়স্থের হাতে দিয়ে গার্গী বলল, এই বান্ডিলেই আছে সেই ড্রাইভারের পোশাক।

অরিজিতের আদেশে একজন কনস্টেবল খুলে ফেলেছে সেই বান্ডিল, যার ভিতর থেকে আবিষ্কৃত হল একসেট অল্প দামের পোশাক।

গার্গী বলল, ড্রাইভারের বাড়ির কাউকে ডেকে এই পোশাক শনাক্ত করানো প্রয়োজন। এই পোশাক পরেই রোহন গিয়েছিল এয়ারপোর্ট থেকে তার মালিক বিবেক দ্বিবেদীকে নিয়ে আসতে।

কিছুক্ষণ নিলামঘরে অপার স্তব্ধতা, অনেকেরই চোখে অবিশ্বাসের ছাপ। অরিজিৎ পুরকায়স্থ বললেন, কিন্তু এই পোশাক আপনি পেলেন কোথায়?;

—তার হত্যাকারীর বাড়ি থেকেই, বলতে পারেন প্রায় দৈবক্রমে পেয়েছি এই বান্ডিলটা। সে-প্রসঙ্গে আমি পরে আসছি। প্রকৃত ঘটনা এই যে, সেদিন এয়ারপোর্টে নামার পর যখন বিবেক দ্বিবেদী তাঁর গাড়িতে করে নিউ আলিপুরের বাড়িতে ফিরছেন, ফেরার পথে যখন ইস্টার্ন বাইপাস দিয়ে গাড়ি চলেছে হু হু করে, হঠাৎ গাড়িটি থামাতে বাধ্য হয় ড্রাইভার। সম্ভবত কাছেই কোনও নির্জন রাস্তায় গাড়িটিকে যেতে বলা হয়, সেই নির্জন জায়গায় যেতেই তাকে পিছন থেকে হত্যা করা হয় নৃশংসভাবে।

—কী বলছেন আপনি?

—আশ্চর্য এই যে, ড্রাইভারের মৃত্যুর পর তার পরনের পোশাক খুলে নিয়ে তাকে পরিয়ে দেওয়া হয় বিবেক দ্বিবেদীর পরনের পোশাক, তারপর তার শরীরের উর্ধ্বাংশ এমনভাবে পুড়িয়ে দেওয়া হয় যাতে মনে হয় সেই লাশ বিবেক দ্বিবেদীব, ড্রাইভারের নয়।

—অ্যাবসার্ড! ভিড়ের মধ্য থেকে কেউ যেন বলল কথাটা, কিন্তু তার দিকে কেউ ফিরে তাকায় না, সবাই দু-চোখ বিস্ময় নিয়ে শুনছে গার্গীর উপস্থাপনা। অলীকশেখরই স্তব্ধতা ভেঙে বললেন, তা হলে বিবেক দ্বিবেদী কোথায় গেলেন?

—তিনিও সেই ঘটনার পরে একদম বেপাত্তা। এই পোশাক বদলানো, তারপর তাকে আগুনে পুড়িয়ে মুখের অংশটা বীভৎস করে দেওয়া হয়েছিল যাতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত প্রত্যেকেরই মনে হয়েছিল খুন হয়েছে বিবেক দ্বিবেদী, আর নিখোঁজ হয়েছে ড্রাইভার। বাস্তবে হয়েছিল ঠিক তার উল্টোটা।

অলীকশেখর উত্তেজিত হয়ে আবার বললেন, বিবেক তা হলে কোথায়?

—তাঁকেও খুঁজে পাওয়া গেছে ইতিমধ্যে।

—পাওয়া গেছে?

—হ্যাঁ। তাঁকে যথাসময়ে হাজির করা হবে এই নিলামঘরে। আসল ঘটনা আপনারা নিশ্চয় এতক্ষণে অনুমান করতে পারছেন বিবেক দ্বিবেদী যখন একের পর এক ঋণ নিয়ে ব্যবসা চালাতে গিয়ে শুধু লোকসানের মুখ দেখেছেন ও জড়িয়ে পড়ছেন কোটি কোটি টাকার ঋণের জালে, তাঁর কাছে তখন একটাই উপায়

তিতিক্ষাকে নিয়ে দেশ থেকে পালিয়ে অন্য কোনও দেশে চিরতরে নির্বাসিন নেওয়া।

—কী আশ্চর্য! দেবজ্যোতি নাগ রায়ের কণ্ঠে বিস্ময়।

—বিস্ময়ের এখনও ঢের বাকি, মি. নাগ রায়, গার্গীর স্বরে সামান্য ব্যঙ্গ, সব ঘটনা শুনলে আপনার হাঁ-মুখ আর বন্ধ হবে না আজ। বিদেশে যাওয়ার ব্যবস্থা করতেই বিবেক দিল্লি গিয়েছিলেন, সেখান থেকেই তিতিক্ষাকে জানান তাঁর পরিকল্পনার রূপরেখা। সুন্দরী তিতিক্ষা ভাবতেও পারেনি তার সোনার সিঁড়ি পাতা জীবনে অপেক্ষা করছিল এত উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগ। দিল্লিতে থাকার মধ্যেই বিবেক বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার সব ব্যবস্থা করে ফেলতে তৎপর হলেন, বিদেশে যাওয়ার জন্য ভিসার দরখাস্তও দিয়েছিলেন যথাস্থানে, ভেবেছিলেন দু-চারদিনের মধ্যে পেয়ে যাবেন ভিসা। এই পর্যন্ত সব ঠিকঠাক ছিল, দিল্লি থেকে ফেরার পথে ড্রাইভারের সঙ্গে নিজের জীবন বদল করে আত্মগোপন করে থাকবেন কিছুদিন। তিতিক্ষাকে নিয়ে যখন সবাই সমবেদনায় ব্যস্ত থাকবে, সে সময় ঋণের দায়ে জর্জরিত তিতিক্ষাকে দিয়ে আরও কোনও একটা নাটক তৈরি করে, ধরা যাক 'গঙ্গায় ঝাঁপ দিচ্ছি' এরকম একটি সুইসাইড নোট লিখে সে অদৃশ্য হয়ে যাবে কলকাতা থেকে। তখন তিতিক্ষাকে নিয়ে বিবেক দিল্লি হয়ে পালিয়ে যাবেন বিদেশে। সেই ছক অনুযায়ী বিবেক ফিরে এলেন দিল্লি থেকে, তারপর এয়ারপোর্ট থেকে ফেরার পথে এত সব নাটক তিনি উপহার দিয়েছেন আমাদের সবাইকে। কিন্তু সমস্যা হল অন্য জায়গায়। নিজের পাশপোর্ট থাকলেও বিবেক খেয়াল করেননি তিতিক্ষার পাশপোর্টের মেয়াদ উত্তীর্ণ। বিবেকের এই ভুলটাই অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল তাদের পালানোর পথে। তিতিক্ষার পাশপোর্ট না-থাকায় তাঁরা পালাতে পারছিলেন না দেশ ছেড়ে।

অরিজিৎ পুরকায়স্থ এতক্ষণে বললেন, তিতিক্ষা দ্বিবেদী কি সমস্ত ব্যাপারটাই জানতেন?

তিতিক্ষার মাথা নিচু, মুখ ফ্যাকাসে, তার দিকে সবাই চোখ ফেলতেই গার্গী বলল, দেখুন, তিতিক্ষার অভিব্যক্তিই বলে দিচ্ছে সে খাঁচার মধ্যে বন্দি এক পাখির মতো। আসল ঘটনা কিন্তু একেবারেই অন্য রকম। সবাই জানে বিবেক দ্বিবেদী প্রবলভাবে ঋণগ্রস্ত, আসলে তার ব্যবসার ঘটনাটাই ছিল ভুয়ো। বিবেক যখন বুঝেছিল তাকে দিয়ে ব্যবসা হবে না, সে তখনই ঠিক করেছিল যেখান থেকে হোক বহু অর্থ সংগ্রহ করে তিতিক্ষাকে নিয়ে পালিয়ে যাবে বিদেশের কোনও গোপন ডেরায়। সেখানে নতুনভাবে শুরু করবে তাদের জীবন। ফলে প্রথমদিকে ব্যবসায়ে

লোকসান গেলেও সে আর ব্যবসার দিকে গেলই না। তার শ্বশুর এ শহরের অন্যতম ধনী ব্যক্তি, তার মাথায় টুপি পরিয়ে দুটি ব্যাঙ্ক থেকে সংগ্রহ করল কোটি টাকার উপর। কিন্তু সবাইকে জানাতে থাকে তার ব্যবসায়ে লোকসান যাচ্ছে ক্রমাগত। এ সময় একদিন অলীকশেখরকে ভুল বুঝিয়ে এক প্রতিষ্ঠানের নামে একষট্টি লাখ টাকার একটি চেক নেয়, সেই চেকের টাকাও গায়েব করে বিবেক। তখনও তিতিক্ষা ব্যাপারটা বোঝেনি। তিতিক্ষাকে ক্রমাগত তার লোকসানের বিষয়টি বোঝায়, বলে আরও আরও টাকা না জোগাড় করলে তাদের সমূহ বিপদ। সুন্দরী তিতিক্ষা বাধ্য হয়ে যাকেই অনুরোধ করে, তার করুণ মুখের দিকে চেয়ে সবাই সাধ্যমতো টাকা দিয়ে সাহায্য করতে থাকে তাদের। এভাবেই নানাজনের কাছ থেকে নিতে থাকে পার্সোনাল লোন। যখন সে কয়েক কোটি টাকার মালিক, কয়েক দফা লন্ডন আর প্যারিসে গিয়ে কোনও ব্যাঙ্কে রেখে আসে প্রায় সব টাকাটাই। তারপর একদিন রাতের নিভৃতে তিতিক্ষাকে জানায় তার পরিকল্পনার কথা। তিতিক্ষা শিউরে ওঠে, কিন্তু বিবেক জানায় সে ব্যবসা করে কোনও দিন শ্বশুরের সঙ্গে টেক্কা দিতে পারবে না, তার ফলে অলীকশেখর কোনও দিনই বিবেককে সম্মান দেবেন না, বরং কটূক্তি করতে থাকবেন তার অপদার্থতার কথা বলে।

তিতিক্ষা রাজি হয়ে যায় এরকম একটি সাংঘাতিক খেলায় অংশ নিতে। তখন বিবেক সিদ্ধান্ত নেয় দিল্লি হয়ে বিদেশে পাড়ি দেবে দুজনে। সে কারণেই তার দিল্লি যাওয়া। দিল্লিতে গিয়েও সে পরিকল্পনা মতো তিতিক্ষাকে এমন ফোন করতে শুরু করে যাতে অলীকশেখরও নিশ্চিত হন সে কোনও ফ্রডের পাল্লায় পড়ে বিপন্ন। তার ফোনের সময় তিতিক্ষা গিয়ে হাজির হত অলীকশেখরের সামনে। তারপর এয়ারপোর্টে নেমে ফোন করে জানায় এখনই চল্লিশ লাখ টাকা না-দিলে তার প্রাণসংশয়। ভেবেছিল তার শ্বশুর দয়াপরবশ হয়ে তখনই তিতিক্ষার হাতে তুলে দেবেন চল্লিশ লাখ টাকা। কিন্তু অলীকশেখর অন্য ধাতুতে গড়া। এরকম অনেক বিবেককে তিনি নস্যির মতো টেনে নিতে পারেন চোখের নিমেষে। এক বিবেক গেলে তিনি তিতিক্ষার জন্য খুঁজে আনবেন সহস্র বিবেক। সেই অভিনয় ব্যর্থ হতে বিবেক শুরু করে তার আদত পরিকল্পনা। রোহনকে হত্যা করে বদলে নেয় তার জীবন। তিতিক্ষা তখন বিবেকের নির্দেশে সবাইকার সামনে অভিনয় করে গেছে দিনের পর দিন। বিবেককে বাঁচাতে হলে তার পক্ষে অন্য কিছু বোধহয় সম্ভবও ছিল না আর। অন্তত সে আর কিছু ভাবতে পারেনি সে সময়।

—তা হলে গত কয়েকদিন ধরে একের পর এক খুন হয়েছে সে সবের নেপথ্যে কি বিবেক দ্বিবেদীই!

—আমি ঘটনাগুলো প্রথমে আপনাদের সামনে বিশ্লেষণ করে শোনাই। তার আগে আমি পুলিশের ডি সি সাহেবকে অনুরোধ করব তিতিক্ষার নতুন ড্রাইভার মকবুলকে আপনাদের সামনে হাজির করতে, কারণ তিনিও জানেন সমস্ত ঘটনাটা।

কিছুক্ষণ পরেই ঘরের বাইরে থেকে দুজন কনস্টেবল মকবুলকে এনে হাজির করল নিলামঘরে। মকবুলের দুই হাত দুই কনস্টেবল ধরে রেখেছে দুদিক থেকে।

অলীকশেখরই প্রায় আতর্নাদের ভঙ্গিতে বলে উঠলেন, স্ট্রেঞ্জ!

—সত্যিই খুবই বিস্ময়ের আর দুঃখের এত সব খুনের ঘটনা, অলীকবাবু। তিতিক্ষা যখন বিবেকের নির্দেশে নিখুঁতভাবে অভিনয় করে চলেছে তার বৈধব্যের চরিত্রে, তার প্রতি সমব্যথীর সংখ্যা যেমন বেড়ে গেল, তার উত্তমর্ণরাও সৃষ্টি করতে শুরু করল নানা ধরনের চাপ। এত চাপের মধ্যে দিনের পর দিন নিখুঁত অভিনয় করে যাওয়াও কিন্তু খুব কঠিন কাজ। তিতিক্ষার উচিত ছিল এই ভূমিকায় অভিনয় করতে রাজি না হওয়া, কিন্তু কলকাতায় থেকে এত মানুষের সামনে হাস্যাস্পদ হওয়ার চেয়ে কয়েক কোটি টাকা নিয়ে বিদেশে পালিয়ে যাওয়াই ছিল তার কাছে শ্রেয়। বিবেক যখন তার পাশপোর্ট আর ভিসার চেষ্টা করে চলেছে ছদ্মবেশ ধারণ করে, তিতিক্ষার জীবনে হাজির হল শ্রাবণকুমারের মতো একজন লোক যিনি একই সঙ্গে সফল ব্যবসায়ী হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও তিতিক্ষার মতো এক ডাকসাইটে সুন্দরীকে পাওয়ার লক্ষ্যে ঝাঁপালেন সর্বশক্তি দিয়ে। তিনি তিতিক্ষাকে স্বপ্ন দেখালেন বড়ো শিল্পী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার। তিতিক্ষার সামনে বিদেশ যাওয়ার লক্ষ্য, তবু যাওয়ার আগে একদিকে যেমন শিল্পী হয়ে ওঠার স্বপ্ন, আবার ছবি বিক্রি করে কিছু অর্থ সংগ্রহ করা। যতক্ষণ না তাদের বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা পাকা না হয়, তিতিক্ষা তার ছবি আঁকার স্বপ্ন পূরণ নিতে চাইল শ্রাবণকুমারের সৌজন্যে।

নিজেকে আত্মগোপন করে ভিসা পাওয়ার চেষ্টায় তেমন সফল হতে পারেনি বিবেক। সেই কাজে ব্যস্ত থাকার ফুরসতে বিবেক ছদ্মবেশ ধারণ করে ফিরে এল তিতিক্ষার কাছে।

—ছদ্মবেশ! কে যেন ভিড়ের ভিতর থেকে উচ্চারণ করলেন সবিস্ময়ে।

—হ্যাঁ, মকবুলের ছদ্মবেশে বিবেক রয়ে গেলেন তাঁর নিজের বাড়িতেই। মি. পুরকায়স্থ, এবার আপনি মকবুলের ছদ্মবেশ খুলে ফেলতে বলতে পারেন আপনার বাহিনীর কাউকে।

সঙ্গে সঙ্গে মকবুলের গায়ের রং থেকে শুরু করে তার মুখের জড়ুল, মাথার টুপি সরিয়ে দিতেই বেরিয়ে পড়ল এক সুর্দশন যুবকের আদল। গার্গী এর আগে বিবেককে দেখেনি, কিন্তু তার ফটো দেখেছে তিতিক্ষার বেডরুমে। আশ্চর্য এই যে,

যুবকটি প্রতিবাদ করার কোনও চেষ্টাই করল না, পালানোর তো নয়ই। একেবারে নতমস্তকে মেনে নিল সমস্ত দায়।

গার্গী বলতে শুরু করে, দেখুন, মি. পুরকায়স্থ, শ্রাবণকুমার লোকটি হঠাৎ শহরের শিল্পচিত্রে উদয় হয়ে তিতিক্ষাকে নিয়ে মাতোয়ারা হয়ে পড়ল এ ঘটনা নিশ্চয় শহরের মানুষের গুঞ্জন-গুজবের বিষয়বস্তু হয়ে পড়েছিল গত কিছুদিন যাবৎ। তিতিক্ষার পক্ষে সেই পটভূমিতে গা ভাসিয়ে দেওয়া ছাড়া কোনও গত্যন্তর ছিল না কেন না তার মাথায় যে ঋণের বোঝা চাপানো আছে তাতে তার সেই মুহূর্তে প্রয়োজন ছিল উত্তমর্ণদের মুখ বন্ধ করতে। ঋণদাতারা খবর পাচ্ছিল তিতিক্ষা খুব শিগগির বহু টাকা হাতে পাচ্ছে তার ছবি বিক্রির মূল্য হিসেবে।

কিন্তু এই ক্যানভাসে হঠাৎ নীলার্ণব কাশ্যপের আবির্ভাব সামান্য জটিল করে তুলল বিষয়টি। নীলার্ণবের বয়স কম, যথেষ্ট সুপুরুষ, তিতিক্ষার রূপের আকর্ষণ তার পক্ষে এড়নো কঠিন যেহেতু তিতিক্ষা তাকেও কিছু প্রশ্রয় দিয়ে ফেলেছিল সম্ভবত প্রকৃত ঘটনা থেকে মানুষের দৃষ্টি সরিয়ে দিতে। তাতে সফলও হয়েছিল কিছুটা, কিন্তু এর ফলে নীলার্ণবের সাহস বেড়ে যায় ও সেও মনে মনে কামনা করতে শুরু করে তিতিক্ষাকে। শ্রাবণকুমার ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলেন হয়তো, কিন্তু তাঁর ধারণা ছিল নীলার্ণব তাঁরই বেতনভোগী কর্মচারী, তার দৌড় বেশিদূর হবে না, তিনিই তিতিক্ষার পরিত্রাতা, তিতিক্ষা তাঁরই নির্দেশমতো চলবে, তাঁর কাছেই ধরা দিতে বাধ্য হবে শেষপর্যন্ত। কিন্তু তাতে সমস্যা হল এই যে, তিতিক্ষার রূপের আকর্ষণ যেমন নীলার্ণবকেও সাহসী করে তুলল, শ্রাবণকুমারকেও করে তুলল তৃষ্ণার্ত। এত সব জটিলতার মধ্যে সমস্যায় পড়ে যাচ্ছিল তিতিক্ষা। সে অভিমন্যুর মতো রণক্ষেত্রের ভিতরে ঢুকে পড়েছে, কিন্তু বেরোবার মন্ত্র খুঁজে পাচ্ছে না। বিবেকও বহু চেষ্টা করে জোটাতে পারছে না বিদেশে যাওয়ার ছাড়পত্র। বিবেক যদি তিতিক্ষাকে নিয়ে বিদেশে পালিয়ে যেতে পারত, তা হলে হয়তো এতগুলি খুন করতে হত না তাকে। কিন্তু ভিসা না-পাওয়ায় তাকেই এখন তিতিক্ষার উদ্ধারকর্তা হিসেবে নামতে হল পটভূমিতে। বিবেক ক্রুদ্ধ হচ্ছিল তিতিক্ষাকে ঘিরে এত সব প্রেমিকের আবির্ভাবে। তখন এমন অবস্থা তিতিক্ষাকে নিয়ে যে কেউ ছিনিয়ে নিয়ে চলে যাবে সবার চোখের আড়ালে। ছদ্মবেশে থাকায় বিবেকের কিছু করার নেই তখন, তিতিক্ষাও অসহায়, শ্রাবণকুমারকে এড়াতে তিতিক্ষা ভর করেছিল নীলার্ণবকে, কিন্তু নীলার্ণবও তখন প্রেমিকের ভূমিকায়। সবটাই তখন ঘটছে মকবুল ওরফে বিবেকের চোখের সামনে। এদিকে শ্রাবণকুমার তিতিক্ষার পারিশ্রমিক হিসেবে যে এক কোটি টাকার চেক দিয়েছিলেন তা বাউন্স করেছে, শ্রাবণকুমার ব্যাঙ্কে চেক জমা দেওয়ার তারিখ ক্রমশ পিছোচ্ছেন, তাতে বিবেক

বুঝতে পেরেছে শ্রাবণকুমারও এক ঠগ, মোটা টাকার প্রলোভন দেখিয়ে ভোগ করতে চাইছে তিতিক্ষাকে। বিবেকের ক্রোধের অনিবার্য প্রকাশে প্রথমে নীলার্ণব, পরে শ্রাবণকুমারকে প্রাণ দিতে হল তিতিক্ষাকে মুক্ত করে আনতে। এখন খেয়াল করে দেখুন প্রথমদিন প্রদর্শনীকক্ষের বাইরে কম্পাউন্ডে গাড়ির মধ্যে বসে একই সঙ্গে শেষাদ্রিকে ও নীলার্ণবকে গুলি চালিয়ে যথাক্রমে আহত ও নিহত করার সুবিধে ছিল ড্রাইভারের ছদ্মবেশে বসে থাকা বিবেকেরই। ঘটনাক্রম তখন এমনই যে, প্রত্যেকেই তখন ভাবতে শুরু করেছে হয়তো শেষাদ্রি সান্যালই সমস্ত খুনের নায়ক। বিবেকও ভাবছিলেন তা হলে সব খুনের দায় শেষাদ্রির কাঁধেই পড়ুক। শেষাদ্রি পুলিশকে বারবার জানাতে চেষ্টা করছেন তিনি আদৌ এই খুনগুলো করেননি, সেই সঙ্গে তিতিক্ষাকে পাওয়ার চেষ্টায়ও তিনি তখন মরিয়া। তাঁর এই বেপরোয়া প্রয়াস স্বভাবতই আরও হিংস্র করে তুলছিল বিবেককে। তার ফলে তাঁকেও প্রাণ দিতে হল বেঘোরে।

—শ্রাবণকুমার ও শেষাদ্রি যেদিন খুন হন, সেদিন বিবেক এক অন্য স্ট্রাটেজি নিয়েছিল, তাতেই সে ধরা পড়ে গেল আমার চোখে। নীলার্ণব খুনের দিন সে মকবুলের ছদ্মবেশে এসেছিল তিতিক্ষার গাড়ি চালিয়ে। পরের দিন তিতিক্ষাকে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এলে পাছে সে ধরা পড়ে যায়, তাই অন্য ড্রাইভারকে দিয়ে তিতিক্ষাকে পাঠিয়ে সে নিজে চুরি করে আনল অলীকশেখরের গাড়ি। সেই সাদা গাড়ি চালিয়ে প্রদর্শনীতে এসে দূরে অপেক্ষা করছিল কখন শ্রাবণকুমার সেখানে আসেন। শ্রাবণকুমার কম্পাউন্ডে ঢোকার আগেই সে গুলি চালিয়ে শ্রাবণকুমারকে হত্যা করে, ঠিক একই সময়ে সেখানে পৌঁছেছিলেন শেষাদ্রি সান্যাল। বিবেক তখন খুনের তাড়নায় এমনই মশগুল, ঠিক করল পালাতে থাকা তিতিক্ষালোভী শেষাদ্রিকেও নিকেশ করবে। খেয়াল করে দেখুন, যেদিন শ্রাবণকুমার খুন হন, সেদিন তিতিক্ষার ড্রাইভার ছুটিতে থাকায় অন্য ড্রাইভার এসেছিল তার গাড়ি নিয়ে। সেদিন অলীকশেখরের ড্রাইভার বলছে তার গাড়ি কেউ চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল, সেখান শেষাদ্রিকে হত্যা করে গাড়ি সেখানেই ফেলে ফোন করে দেয় অলীকশেখরকে তাঁর খোয়া যাওয়া গাড়ি পড়ে আছে উত্তর কলকাতায়, তিনি যেন সেখান থেকে উদ্ধার করে নেন তাঁর গাড়ি। লক্ষণীয় এই যে, এদিন ইচ্ছে করেই বিবেক নিজের গাড়িতে না থেকে ছুটি নেয় ও অলীকশেখরের গাড়ি চুরি করে দু-দুটি খুন করে নিষ্কণ্টক করতে চেয়েছিল তার নিশ্চিন্ত বেঁচে থাকা। কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারেনি এ তার ভবিতব্য। তার পরের ঘটনা সবাই জানা আপনাদের।

এতক্ষণ একটানা বলে গার্গী তাকায় প্রথমে বিবেকের দিকে, পরক্ষণে তিতিক্ষার দিকে, বলল, বলো তিতিক্ষা, আত্মপক্ষ সমর্থনে তোমাদের কিছু বলার আছে?

তিতিক্ষার ফ্যাকাসে থেকে আরও ফ্যাকাসে হয়ে ওঠা অভিব্যক্তিতে তখন আকাশের শূন্যতা। ঠোঁটে দাঁত চেপে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করছিল এতক্ষণ, হঠাৎ কান্নাভেজা গলায় বলল, গার্গীদি, আমরা একটু ভালোভাবে বাঁচতে চেয়েছিলাম। কিন্তু বিবেকের বরাত এমনই যে, কোনও মতেই দাঁড় করাতে পারল না ব্যবসাটা। তারপর যা ঘটে গেল সবটাই আচমকা। দিল্লি থেকে ফেরার পথে যা করে ফেলল তা আমার ভাবনার বাইরে। কিন্তু হাতে একবার রক্ত মেখে ফেললে তা থেকে ফেরার বোধহয় আর উপায় থাকে না। এখন আমাদের যা শাস্তি পাওনা তা তো নিতেই হবে মাথা পেতে।

গার্গী তাকায় পুলিশ অফিসার অরিজিৎ পুরকায়স্থর দিকে, অর্থবহ চোখে বলল, মি. পুরকায়স্থ, ব্যাকি দায়িত্ব আপনার। আপনার মতো আমিও বুঝে উঠতে পারছিলাম না কী কারণে ঘটছে বোধের অতীত এতগুলি খুন। কিন্তু তিতিক্ষাদের গ্যারেজ থেকে প্রায় চুরি করে আনা পোশাকের বান্ডিলটাই সাহায্য করল জট ছাড়াতে। কিন্তু তখনও আমি নিশ্চিত ছিলাম না কে খুনগুলো করছে, কীভাবেই বা! নীলার্ণবের খুনের দিন আমি ভেবেছিলাম হয়তো শ্রাবণকুমার নিজেই বা শেষাদ্রি--কেউ একজন খুনটা করলেও করতে পারেন।

তবে আমার সবচেয়ে সুবিধে হয়েছে পরের প্রতিটি খুনের পর শ্রাবণকুমারের বিখ্যাত কফিন রঙের রুমালের উপস্থিতিতে। এই রুমাল রাখতে পারতেন তাঁরই সুপারি দেওয়া কোনও প্রতিনিধি। তিতিক্ষার কাছেও ছিল একই রঙের দেড় ডজন রুমাল যা শ্রাবণকুমারেরই দেওয়া। রক্তমাখা পোশাকের বান্ডিলটি তিতিক্ষাদের গ্যারাজে পাওয়ার পর থেকেই আমি বিবেক দ্বিবেদীর অস্তিত্ব টের পেতে শুরু করেছিলাম আমার অজান্তেই। তখনই মনে হচ্ছিল এই রুমালগুলো তিতিক্ষার উপহার পাওয়া রুমাল নয়তো!

পরে দেখলাম আমার অনুমান অকাট্য।

ততক্ষণে হাউ হাউ করে কাঁদছে তিতিক্ষা, আর বিবেকের মুখ নিস্পন্দ পাথর।